সন্দেশ
বইমেলা
সংখ্যা
২০১১
সম্পাদক
সন্দীপ রায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - জয়ন্ত কর্মকার
স্ক্যান করেছেন - সুভায়ুন দত্ত
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

শিশু কিশোর আকাদেমির স্মারক সম্মান
মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সন্দেশের পক্ষে নিচ্ছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়

ফটো· দেবাশিস সেন

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা

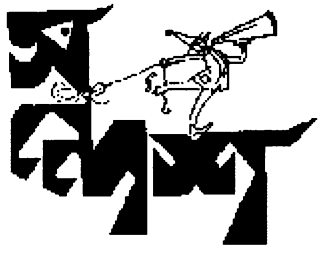

বিশেষ বইমেলা সংখ্যা

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৫০

ডিসেম্বর-২০১০—ফেব্রুয়ারি ২০১১ ● অগ্রহায়ণ—মাঘ ১৪১৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোমস সাহেবের হত্যা রহস্য/রাজেশ বসু ১৯

অবতার/ সত্যজিৎ রায় রূপান্তর—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৪২

রবীন্দ্রনাথ ১৫০

প্রবন্ধ

দেখা না দেখা রবীন্দ্রনাথ/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪

রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ বনমালী/দিলীপ চন্দ্র ৬

আমার রবীন্দ্রস্মৃতি/রামানন্দ সেনগুপ্ত ১০

কবিকথা ও জোড়াসাঁকোর ইতিকথা /অমলেন্দু মিত্র ১৪

ছড়া-কবিতা

রবি ঠাকুরের ছড়া/অমিতাভ চৌধুরী ৩

প্রতিবন্ধীর বন্ধু/পিনাকী ঠাকুর ৫

দেড়শো বছর ছুঁয়ে নতুন/সরল দে ৫

তোমাকে কতটা চাই/পবিত্র সরকার ৯

সেই সে ঠাকুর/দীপ মুখোপাধ্যায় ১৩

ছোট্ট ছেলের গল্প/সায়ন্তনী নাগ ১৩

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৫০

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য/

ডঃ সিদ্ধার্থ দত্ত ৩৫

বিশেষ রচনা

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র/

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ৫৭

গল্প

মিশুছোগলের পুঁথি/হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ২৭

বাদুড় কেন নিশাচর/দেবাশিস সেন ৫১

খোকা চাঁদের পৃথিবী সফর/শিবাণী রায়চৌধুরী ৫৩

ছোট্ট রাজার পোষ্য/সৈকত মুখোপাধ্যায় ৫৯

ইচ্ছে-গাড়ি/চন্দ্রাবলী ধর ৬৯

ফুল চুরির রহস্য/চন্দন চক্রবর্তী ৭২

পিকু/মধুশ্রী গুপ্ত ৮৪

নির্বাচিত যোদ্ধা/ প্রতিম দাশ ৮৮

নাটক

ছানাভূত গা না ভূত/রাকা দাশগুপ্ত ৩৮

ছড়া-কবিতা

লিয়রের লিমেরিক/শৈলশেখর মিত্র ও

অশোক কুমার মিত্র ৪৯

একালের রূপকথা/অরুণিমা রায়চৌধুরী ৫৬

জলছবি/দেবাশিস বসু ৫৬

পাতার বাঁশি/সুনির্মল চক্রবর্তী ৫৬

একা/অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৭১

হাঁসুলী বাঁকে/আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় ৭১

তিতি/রাখাল বিশ্বাস ৭১

কে বলে দেয়/সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৮৭

বাজী/দিগম্বর দাশগুপ্ত ৮৭

কার্টুন

বইমেলায় রবীন্দ্রনাথ/অমল চক্রবর্তী ৩৩

প্রবন্ধ/রম্যরচনা

স্মৃতির অন্তরালে/অশোক বেরা ৬৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোদের লেখা/অনির্বাণ রায় ৭৬

বাবার কথা/সুনৃতাবরী সেন ৮১

আজব খবর/বরুণ মজুমদার

সুসিপ্রিয় মহাকাশচারী ৮০

কাকেদের সঙ্গে কথা ৮৩

চাঁদের দেশে জমি কেনা ৯৩

বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের কাণ্ড ৯৮

বই চেনো/ প্রণব মুখোপাধ্যায় ৯৪

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

উনো কথা/জীবন সর্দার ৯৫

হাত পাকাবার আসর

অনুভব সাহা, ঈশানী বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭

আনন্দ সন্দেশ ৯৯

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন/ প্রবাল সেন ১০০

ছবি এঁকেছেন

এডওয়ার্ড লিয়র, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য,
সুদীপ্ত দত্ত, সৌকর্য্য ঘোষাল, রাহুল মজুমদার

প্রচ্ছদ

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সন্দীপ রায়

সহ-সম্পাদক

প্রণব মুখোপাধ্যায়

২০ টাকা

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
কালী প্রিন্টার্স এন্ড বাইন্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত
স্বত্বাধিকারী - সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

রবি ঠাকুরের ছড়া

অমিতাভ চৌধুরি

ধা-কুড়কুড়, ধাকুড় ধাকুড়—
গান জুড়েছেন রবিঠাকুর।
সে গান শুনি সকাল-দুপুর—
দিল্লি থেকে বিহার-পাকুড়

রবিঠাকুর শান্তিনিকেতন—
রোজ পড়াতেন বিনা বেতন,
এখন তাহার সেই সে চেতন,
নেই সে মন, নেই সে তণ।

এখন কেবল কাজিয়া চলে,
রবিঠাকুর ভালো না বলে।
লুকিয়ে পড়ে তলে তলে,
অঢেল টাকা যাচ্ছে জলে।

তা থাক, তবু আছেন তিনি,
তাঁকে দেখেই জগৎ চিনি।
তাঁর পরেতেই বাংলা কিনি,
খেলবেনা আর দিদিমণি।

দেখা না দেখা রবীন্দ্রনাথ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমি কখনো রবীন্দ্রনাথকে জীবিত অবস্থায় দেখিনি। তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স ষোলো সতেরো। সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছি। তাঁর অসুস্থতার ক্রমাবনতির খবর নিয়মিত পাচ্ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্র আমি ও আমার দুই বন্ধু জোড়াসাঁকোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। সেই দুই বন্ধু নারায়ণ সাহা ও বিমল ভট্টাচার্য আজ দুজনেই প্রয়াত। সেই বিখ্যাত বিচিত্রা ভবনের দো-তলায় রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ শায়িত ছিল। একটা ঘোরানো আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছিলাম। সেখানে তখন প্রচন্ড ভিড়ে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাশের মত দুজন বিশালদেহী মানুষও সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। বেশিক্ষণ জোড়াসাঁকোয় থাকিনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। পথেই কিনেছিলাম সেদিনের আনন্দবাজারের বিশেষ সংস্করণ। তার শিরোনামটি দীর্ঘকাল পরেও মনে গেঁথে আছে। ব্যঞ্জনাময় সেই শিরোনামটি ছিল, রবি অস্তমিত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে। তাঁর কবিতা ছোটবেলা থেকেই পড়েছি কিন্তু প্রথম কৈশোরে ভাল লেগেছিল তাঁর শরৎবিষয়ক কবিতাগুলি।

'এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে।'

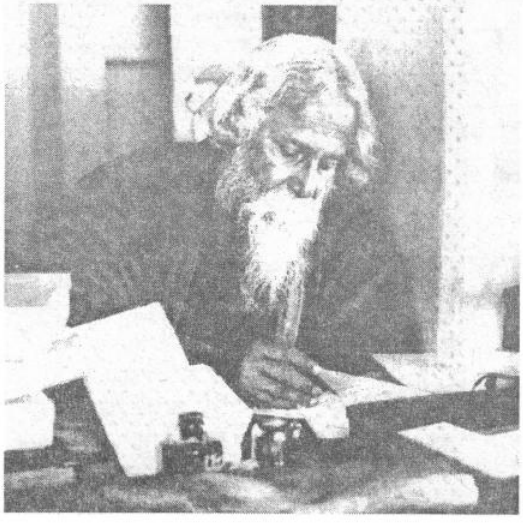

এই পংক্তিগুলি যেন আমার চারিদিকে প্রতিফলিত হত। সেই সময় শোনা একটি গানের স্মৃতি আমার মনে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। একবার আমার দিদি সন্ধেবেলা গেয়েছিল।

''বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গহন অন্ধকার'

দিদি অবশ্য 'বিশ্ব'-এর বদলে 'ভীষ্ম' কথাটি ব্যবহার করেছিল। আমার পড়ুয়া ঠাকুরদার কল্যাণে রামায়ণ মহাভারত আমার ভালভাবেই পড়া ছিল। তাই এই চিত্রকল্পটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়েছিল। পিতামহ ভীষ্ম তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, চারদিকে অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে, সকল চরাচর নিস্তব্ধ। এইভাবে আমি সে সময় বুঝেছিলাম গানটাকে। পরিণত বয়সে যখন ঠিক শব্দটি শুনি তখনও একটি আসন্ন মৃত্যু এবং ঘনায়মান সর্বব্যাপী অন্ধকারের কথাই অনুভব করেছিলাম। কর্মসূত্রে আলাপ হয় দুজন আদ্যোপান্ত রাবীন্দ্রিক মানুষ, সাগরময় ঘোষ ও কানাই লাল সরকারের সঙ্গে। সাগরদা মিতভাষী, রসিক ও রীতিমত সুগায়ক। কানাই দিলদরিয়া, ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট মানুষ। এই দুরন্ত বালকটি ছোটবেলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন। তাঁর একটি সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের একটি ধাঁধার খাতা উল্টানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতে একটা উল্টো করা ডিঙির ছবি আঁকা ছিল। 'কা' লিখে সেটা কেটে দেওয়া ছিল আর 'ডা' টা ছিল অনেকটা কাত করে লেখা। মজার ধাঁধাটার উত্তর পেয়েছ তো? 'উল্টোডাঙ্গার কানাই ডাকাত' অর্থাৎ আমাদের সেই চিরপরিচিত কানাইদা। উপলব্ধি করেছিলাম কী অসাধারণ রসবোধ ছিল এই মনীষীটির। কতটা স্নেহপ্রবণও ছিলেন তিনি এই দুরন্ত বালকটির প্রতি। সাধে কি আর তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন,

এত বুড়ো কোনকালে হবনাকো আমি
হাসি-ঠাট্টাকে যবে কব পাগলামি।

অনুলিখন : সুগত রায়

দেড়শো বছর ছুঁয়ে নতুন

সরল দে

হারায় না সে ফুরোয় না সে
মুড়োয় না তার নটে
যেদিকে চাই তার দেখা পাই
ভুবন ভরে ওঠে।

নিত্য সে এক পরশমণি
মন ছুঁলে মন সোনা
তখন শুনি আনন্দগান
সে গান হারাবো না।

আকাশভরা সূর্য তারায়
বিশ্বভরা প্রাণে
অফুরন্ত সৃষ্টি যে তার
আছে তা সবখানে।

ওই তো শিশুভোলানাথের
সঙ্গে আছে মেতে
সহজে পাঠ শেখায় সে তার
আসন পিঁড়ি পেতে।

দেড়শো বছর ছুঁয়ে নতুন
চিরকালের ওই
ছিলেন ঠাকুর রবিঠাকুর
আছেন সততই।

প্রতিবন্ধীর বন্ধু

পিনাকী ঠাকুর

তোদের ছিল পুজোর চমক, তুবড়ি-জ্বলা দেওয়ালিরাত
আমার শুধু খাপছাড়া-বই, আমার শুধু রবীন্দ্রনাথ

তোরা সবাই টিফিনে খাস পাউরুটি আর কলা?
আমি তো সেই অমল, আমার ছিল যে দইঅলা!

তোদের যত চড়ুইভাতি, বাজনাবাদ্যি, নাচ
আমি যেন একলা একটা কুর্চি ফুলের গাছ

তোরা যখন হুড়ু-জোনা, সিমলা কিংবা পুরী
আমি তখন কবির সঙ্গে য়ুরোপটায় ঘুরি।

সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম বারান্দায়, ঘরে
খোয়াই-কোপাই দেখব, আমার মন যে কেমন করে

ছাপা বইয়ের ওপার থেকে বাড়িয়ে দুটি হাত—
দাঁড়িয়ে আছো বন্ধু আমার, হে রবীন্দ্রনাথ!

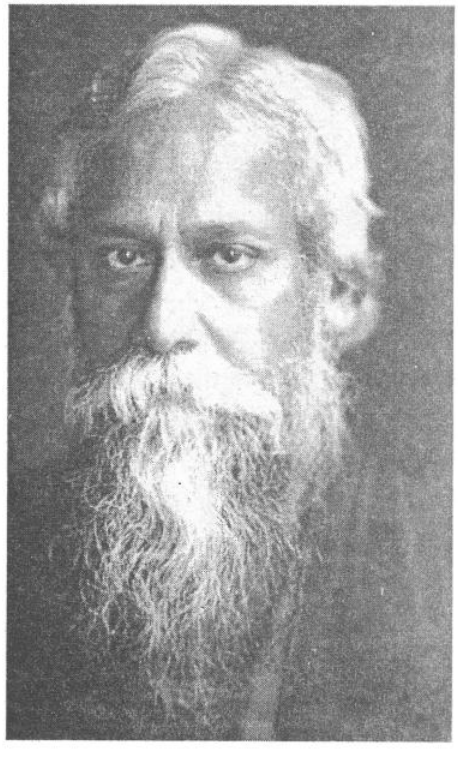

রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ বনমালী

দিলীপ চন্দ্র

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন জীবন দীর্ঘ বছরের। প্রায় চল্লিশ বছরে তাঁর সহায়ক-ভৃত্যদের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে সাধুচরণের পরে আসে বনমালী। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে উমাচরণের নাম পাওয়া যায়। সে ছিল কবিগুরুর বেশ খানিকটা মনের মতো। কারণ একটাই—তার স্বভাবটি ছিল হাসি-খুশি। কৌতুক-পরিহাস সে বেশ বুঝত। কাজেও ছিল পাকা। সাধু কাজে পাকা হলে কি হবে, স্বভাবে ছিল বেশ গম্ভীর। কবিগুরুর সঙ্গে বাক্যালাপে 'স্পিকটি নট' গোছের। গার্জেন গার্জেন ভাব। কবিগুরুর আবার এ-রকম ভাব পছন্দ হত না। তিনি কর্তা বা মনিব, যাই হোন না কেন, তাই বলে কি খোলামনে কথা কইতেও মানা। তাই, কবিগুরুর সঙ্গে সাধুচরণের ঠিক-ঠিক জমতো না। তিনি ঠিক স্বস্তি পেতেন না।

সাধুচরণ প্রসঙ্গে একবার ক্ষিতি মোহন সেন কবিগুরুর কাছে একটা কথা তোলেন। এই সেন মহাশয় ছিলেন নোবেল জয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মায়ের বাবা। এবং শান্তিনিকেতনের বিশাল কর্মকান্ডের শিরোমণিদের অন্যতম। সে যাই হোক, সাধুচরণের আগমনের পরে পরেই সেন মহাশয় একদিন নতুন ভৃত্যটি সম্বন্ধে জানতে চান। কবিগুরু উত্তরে জানিয়েছিলেন—সাধু, আমার ভৃত্য! মনে তো হয়, সে আমার গার্জেন। যা গম্ভীর! ওর মুখে কোন কথাই ফোটে না। তবে, মাঝে মধ্যে যা শুনি, তা ওর গর্জন।

কথা হবে বনমালীকে নিয়ে। তবু আগের দুজনের কথা উঠল। কেবল এইটুকু জানতে যে, সহায়ক-ভৃত্যের কোন গুণটি কবিগুরুর বিশেষ পছন্দের ছিল। আঁটো-সাঁটো সম্পর্ক তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না। বনমালীকে পেয়ে এই দিক থেকে কবিগুরুর অস্বস্তি, প্রায় ছিল না, বলা যায়। তবে কাজে-কর্মে সে উমাচরণ বা সাধুচরণের মতন ছিল না। তাই বলে তাকে চলে যেতে হয়নি। কবিগুরুর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সে ছিল তাঁর সেবক হয়েই। এ কথাটিও সম্ভবত বেশ খানিকটা ঠিক যে কবিগুরুর অন্তিম পর্বের কয়েকটি বছর বনমালীই ছিল তাঁর অনেকখানি কাছের মানুষ আর কাজের মানুষও।

কবিগুরুর সঙ্গে বনমালীর হাস্য-পরিহাস কিংবা কৌতুক কেমন জমতো তা তো জানতেই হবে। তবে তার আগে জানতে ইচ্ছে হয়, ভৃত্যদের সঙ্গে ব্যবহারে ঠাকুরবাড়ির হাব-ভাব বা পরিবেশ কেমন ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির জীবন-চর্যা ছিল, বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে, পুরোপুরি সম্ভ্রান্ত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও পরিশীলিত। সেই আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সমেত বাড়ির সব ছেলে-মেয়েরা। তার প্রভাব জানতে একটুকরো উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। 'যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন একান্নবর্তী পরিবার থাকায় বনেদী নিয়মকানুন সমানভাবে বজায় ছিল। কোন বিষয়ে যেমন তাঁদের অভাব ছিল না—তেমনি কোন বিষয়ে ত্রুটিও ঘটতো না। কোন রুচিবিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ বা গালি দেওয়া তাঁরা জানতেন না।' অসিত কুমার হালদার আরও জানিয়েছেন, 'এর একটি মজার উদাহরণ মনে পড়ে গেল। দিদিমাকে (রবীন্দ্রনাথের মেজদিদি, শরৎকুমারী দেবী) একবার দেখেছি একটি উড়ে চাকরকে ছেলেদের খাবার জন্য গজা কিনতে পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিলেন; বুদ্ধিমান উৎকল বাসী গাঁজা এনে হাজির করলে। দিদি রেগে গিয়ে মুখ লাল করে ভর্ৎসনা দিয়ে কেবল বললেন, বেটা উড়ে, একে বাঁদর তার উপর পায়ে গোদ, তাতে বিষ ফোড়া— দেখ্ না হতভাগার বুদ্ধি। বলেই চুপ করে গেলেন। এই হল খুব জোর তাঁদের ক্রোধের অভিব্যক্তি।'

কবিগুরুর বনমালী ছিল ওড়িষ্যা প্রদেশের মানুষ। স্বভাবে সাদা-সিধে। সে তেমন দক্ষ না হলেও, তার দক্ষতা-অদক্ষতা মিলিয়ে সে ছিল গুরুরই বনমালী। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন গড়ে উঠেছিল তা কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে দেখলে ঠিক বোঝা যাবে। বনমালীর মুখের ভাষা ছিল, না বাংলা—না ওড়িয়া। যেমন—'লীমাংসা', 'বুবচনা' আর 'নাম্বা'। ইংরেজি শব্দ সে নিজের করেই নিয়েছিল। যেমন—কেক্ কে 'ক্যাক্', ন্যাপকিন কে 'ল্যাপকিন'। একদিন কবিগুরু বনমালীকে বললেন, 'যাবার আগে 'লাপকিন'টা দিয়ে যাও। 'লাপকিন'টা দিয়ে 'নাম্বা' টেবিলটা এদিকে সরিয়ে দাও। তারপর 'স্যানাডডন'-এর (স্যানাটোজেন) শিশিটা রাখ তার উপরে।' (দ্রষ্টব্য ঃ গুরুদেব—লেখিকা রানী চন্দ)

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কিছু সময় কবিগুরুর সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনের সেবায় কাটিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন,

'...কৌতুক তিনি করতেন প্রায় সকলের সঙ্গেই। পুত্র, পুত্রবধূ, সেবক—পাত্রভেদ ছিল না। তাঁর এ বিষয়ে। নিত্য সেবক বনমালীকে একদিন ফরমায়েস করেছেন চট করে চা আনতে; কিন্তু চা আনতে দেরি হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললেন, কবি, চা-কর বটে, কিন্তু সু-কর নয়। ইতিমধ্যে বনমালী এসে হাজির, মুখে সুপরিচিত সেই আহাম্মকের হাসি। কবি কৃত্রিম ক্রোধে বললেন তাকে, তুই বোধ হয় জানিস না যে তোর অতুলনীয় অকর্মণ্যতায় আমি খুব বেশী পুলকিত হইনি? বনমালী আর কিছু না বুঝুক বুঝলে এটা রসিকতা, কারণ এ জিনিসটা ছিল ওখানকার সকলেরই সুবিদিত।'

বনমালী কবিগুরুর খাস-সেবক হওয়ায় সে বাবুমশায়ের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাবার সুযোগ পেয়েছে। তবে বিদেশে তাকে যেতে হয়নি। ফলে, উভয়েরই ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হয়নি বলেই আন্দাজ করা যায়।

কবিগুরু মংপুতে গেছেন। সঙ্গে আছে সেবক বনমালী। একদিন কবিগুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?

আজ্ঞে, তা ভালই চলছে, দিদিমণি আবার আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'দিদিমণি' হচ্ছেন মৈত্রেয়ী দেবী, আর কবি মংপুতে তাঁরই অতিথি হয়ে আছেন।

কবিগুরু বনমালীকে আবার বললেন—দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন, তার চেয়ে দুধ মাখাতে পারতেন, খেয়ে তো রং-এর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। (দ্রষ্টব্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ) বনমালী ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

যেবার শান্তিনিকেতন থেকে অনেকটাই দূরে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই গুজরাটে, সেখানেও সঙ্গী বনমালী। ১৯২৩ সালের কথা। সেখানে বনমালীর মন-মেজাজ, কাজকর্ম কেমন চলছে তার খবর আছে কবিগুরুর একখানি চিঠিতে। 'সে (বনমালী) সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গা তীর হতে দূরবর্তী দেশে অকাল মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে—তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয়পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস এজন্য বিদেশীরাই দায়ি।...'

কবি তাঁর কর্মকুশলতার কথা জানাচ্ছেন, —'ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোন কাপড় বের করে দিতে বলি তা হলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়।' এমন খাস-সহায়ক নিয়ে রাজবাড়ির অতিথি হওয়া, ভাবা যায়! রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেই লিখেছিলেন, 'মানষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্তলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়।' এত কথার পরেও কিন্তু কবিগুরু যে কথাটি লিখতে ভোলেননি, সেটি হচ্ছে—'ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলের বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে,.....।' (ভানুসিংহের পত্রবলী থেকে গৃহীত)।

'রবীন্দ্রনাথ সেইসব লোককেই ভালবাসতেন যারা সময় মতো হাসতে পারে ও সময় হলে হাসাতে পারে।'—রবীন্দ্রনাথ স্নেহপুষ্ট, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপক-সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী মশায় এমন কথাই লিখেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও কিছু জানালেন,—'শান্তিনিকেতনের দীর্ঘকালের ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, যাঁরা তাঁর প্রীতিরসের স্থান পেয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই এ দুটো গুণ ছিল, এমন কি লীলামণিরও (নীলমণি) এ গুণ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন।' এখানে 'তিনি' বলতে বিশী মশায় রবীন্দ্রনাথকে বোঝাচ্ছেন।

কবিগুরুর কৌতুকপ্রিয়তা ছিল সুবিদিত। বাক্‌বৈদগ্ধ্য অপরিসীম। তিনি নিজেকে নিয়েও পরিহাসে মেতে উঠতেন। হাসির ফোয়ারা ছুটে যেত। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল ঃ ১৯৩৫ সাল। কবিগুরু তাঁর কন্যা মীরাদেবীর সন্তান নন্দিতাকে লিখেছিলেন, '.....নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিবিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।.....' রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যালয় বিবাগী ছাত্র ছিলেন। সেই কথাটি প্রচ্ছন্নভাবে জানিয়ে নিজেকে নিয়ে নাতনির সঙ্গে নির্মল পরিহাস কেমন করে গেলেন। সেই সঙ্গে নন্দিতার প্রাপ্য প্রশংসাটুকুও জানিয়ে দিলেন।

একটা জরুরি কথা তো আগে বলা হয়নি। ভুল শুধরে এখন বলতে হয়। বনমালী নামে যে ব্যক্তি, সে কিন্তু কবিগুরুর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় পুষ্ট। অতএব, একনামে তার সবটুকু পরিচয় হতে পারেই না। তাই কবিগুরু তাকে মাঝে মধ্যে ডাকতেন 'লীলমণি' বলে। তার নীলমণি নামটি কবিগুরুর দেওয়া মনে হতেই পারে। সে যাইহোক, বনমালী, নীলমণি আর লীলমণি একই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সেবক। ভাল-মন্দে যে বনমালী, সেই আবার শ্রেয় হয়ে নীলমণি। আবার যখন সে বাবুমশায়ের 'লীলমণি' তখন তো আর কথাই নেই—একান্ত প্রিয়, মনের মতো আপনজন! এই নিবন্ধে বনমালী নামটিই গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করা হচ্ছে।

শান্তিনিকেতনের মানীগুণীজনের সমারোহে বিপুল কর্মকান্ডের মাঝে বনমালী ওরফে নীলমণির কথা কী-বা আর থাকতে পারে। তবু, তার নেপথ্য ভূমিকার কথা ভোলা কী যায়! কবিগুরুর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর বনমালী যেন হয়ে উঠেছিল তার বাবুমশায়ের বেশ কিছুটা ভরসার স্থল। তার প্রাত্যহিক দায়িত্ব ছাড়াও কবিগুরুর ব্যক্তিগত অতিথিদের সেবা-যত্নের দিকটাও তাকে সামলে নিতে হয়েছে। এ বিষয়ে নজিরও আছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কবিগুরু সন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর অতিথি হয়ে উঠলেন। ওখানে থাকাকালীন এক দিন সকালবেলায় কবিগুরুর সঙ্গে বনফুলের কথোপকথনের একটা অংশ তুলে ধরা গেল ''তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে?'' 'হ্যাঁ'

'এখানে তোমার দেখাশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না বোধ হয়। এখানে বনমালীই ভরসা'। 'বনমালী যথেষ্ট করছে। কোন ত্রুটি তো দেখলাম না। এই সকালে গরম সিঙাড়া কচুরিও দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে।' বনফুল একথাও লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখে মনে হল খবরটা শুনে তিনি খুব হৃষ্ট হয়েছেন।'

বনমালীর কথা আরও কিছুটা বনফুলের লেখায় আছে। সেটুকুও তুলে দেওয়া গেল প্রাসঙ্গিক ভেবে। 'দূর থেকে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ জরির কাজ করা গোলাপী রঙের মস্ত একটা পাগড়ির মতো টুপি পরে নিবিষ্ট মনে লিখে যাচ্ছেন।....আর একটু কাছে যেতেই রবীন্দ্রনাথ মুখ তুলে চাইলেন.....হেসে বললেন টুপিটা দেখছ? বনমালী ওটা পরিয়ে দিয়ে গেল। ওর ইচ্ছে আমি ওইটে পরেই লিখি। .....বললাম দাও। সেই থেকে পরেই আছি। তারপর চোখদুটো ঈষৎ বিস্ফারিত করে বললেন—বনমালীর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস নেই।'

বিশ্বনন্দিত কবি-মনীষী, শান্তিনিকেতনের প্রাণ-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল পরিসরের ছায়ায় আসার সৌভাগ্যলাভে বনমালী অবশ্যই ধন্য। তাই কবিগুরুর সেবক রূপে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছিল। ক্রমশ সে নিজেকে পরিপাটি করে গড়ে নিতেও সচেষ্ট হয়েছিল। কতখানি পেরেছিল, সে কথা অমূলক। তেমনি কবিগুরুও বনমালীর সেবার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার রুচি-পছন্দকে মেনে নিয়েছেন। কবিগুরুর জীবন সায়াহ্নে বনমালী তাঁর বেশ কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল।

[নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন তথ্যের জন্য উল্লিখিত বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের কাছে এই নিবন্ধকার কৃতজ্ঞ ও ঋণী। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের গ্রন্থের নাম 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ।' বনফুলের গ্রন্থটির নাম 'রবীন্দ্রস্মৃতি'।]

তোমাকে কতটা চাই

পবিত্র সরকার

সন্দেশ, দই চাই;
অঙ্কেতে একশো, কি
নিরেনব্বই চাই।
সাফল্য-পর্বতে
ওঠবার মই চাই।

মিল্ক চকোলেট চাই;
কর্ণফ্লেক্স, পিৎজা, কি
চিজ্ ওম্‌লেট চাই—
ফ্রায়েড চিকেনে ঠাসা
খুশি-খুশি পেট চাই।

হেন চাই তেন চাই
কখনও কি ভেবেছি রে
এত সব কেন চাই?
সব চাওয়া ঠিক কিনা—
একটু তো জ্ঞানও চাই!

এত চাই, অত চাই;
চাওয়া শেষ হয় না তো
যত শত শত চাই।
যদি ভালো চাওয়া থাকে—
কিছু অন্তত চাই!

কার কাছে ওটা চাই?
কাড়াকাড়ি করি খুব—
আধা চাই, গোটা চাই
তার আগে প্রশ্নটা
মনে জেগে ওঠা চাই—

তুমি রবীন্দ্রনাথ—
তোমাকে কতটা চাই।।

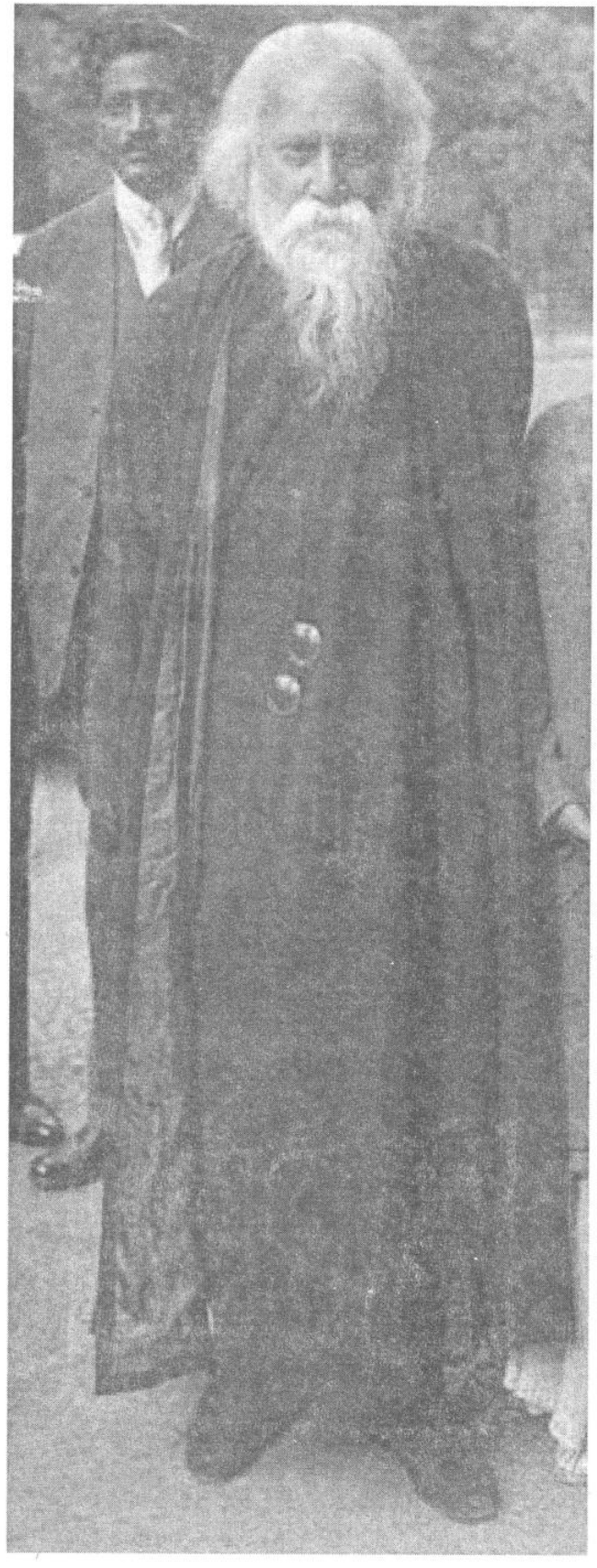

আমার রবীন্দ্রস্মৃতি

রামানন্দ সেনগুপ্ত

আমার ছেলেবেলা কেটেছে টুনি বলে একটা জায়গায়। এই জায়গাটা অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়ালটেয়ারের কাছাকাছি। আমার বাবা সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার। শিবপুরের বি.ই. কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে লাইসেন্সিয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। বাবার কাজ ছিল দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেলের লাইন ছড়িয়ে দেওয়া।

টুনির চারধারে ছিল পাহাড় আর জঙ্গল। কয়েকজন জমিদার ছিল টুনিতে, তারা হরিণ চালিত গাড়িতে ঘুরে বেড়াত। এই জমিদাররা বাবাকে খুব খাতির করত।

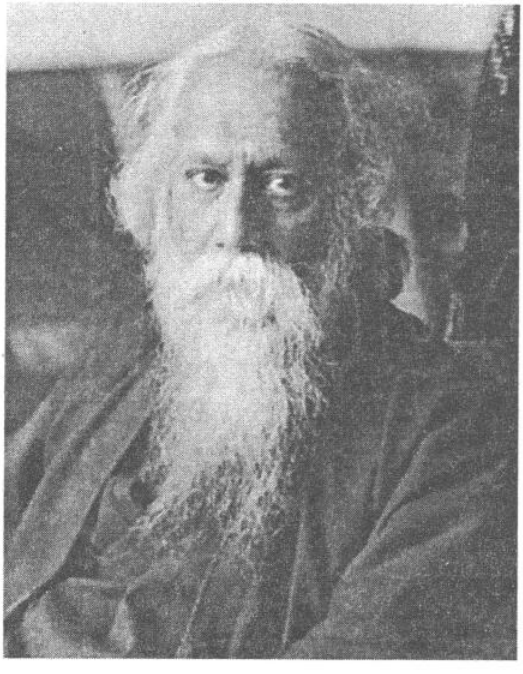

আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকায় ১৯১৬ সালে। আমার ঠাকুর্দা আনন্দমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন সংস্কৃততে পন্ডিত। আমার দুই দাদা, বিধবা পিসি, পিসির দুই ছেলে, আমার বিপত্নিক জ্যাঠামশাই ও তাঁর ছেলে মেয়েরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঢাকায় থাকত। আমাদের ছিল এক বড় একান্নবর্তী পরিবার। আমার পিসিমা সবাইকে আগলে রাখতেন। বাবা, মা আর আমি থাকতাম টুনিতে।

এই সময়কার একটা ঘটনা আমার মায়ের মুখে শোনা, কারণ তখন আমি এতই ছোট যে আমার কিছুই মনে নেই। মা-বাবা আমাকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতেরই কোন অঞ্চলে যাচ্ছিলেন সেকেন্ড ক্লাসে চেপে। ঐ ট্রেনেই মহাত্মা গান্ধী যাচ্ছিলেন থার্ডক্লাসে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন সত্যাগ্রহী। সত্যাগ্রহীরা ট্রেনের কামরায় কামরায় গিয়ে বিদেশি জিনিষ বর্জনের জন্য এবং সত্যাগ্রহীদের অর্থ সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন। আমার মা ও বাবার কাছে বিদেশি জিনিষ কিছুই ছিল না অতএব বর্জনের প্রশ্ন নেই। কাছে টাকা পয়সা খুব বেশি না থাকায় মা তাঁর গায়ের সমস্ত গয়না সত্যাগ্রহীদের পাতে তুলে দেন। মায়ের ঐ গয়নাটুকুই ছিল, বাড়িতে আর বিশেষ কিছু গয়না ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মায়ের মুখে যখন এই কাহিনিটি শুনি মাকে কোন দুঃখ করতে দেখিনি বরং মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছি।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাবাকে বিভিন্ন সময়ে বদলি হতে হয়েছে। ন' বছর বয়স পর্যন্ত আমি বাবা মায়ের সঙ্গে ছিলাম। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তেলুগু, তামিল, মালয়লাম এসব ভাষা কিছু কিছু বলতে পারতাম। বাংলা ভাষা বুঝতে পারতাম, কিন্তু বলতে পারতাম না। আমার মায়ের পিসতুতো দাদা ক্ষিতিমোহন সেন। তিনি অনেকবারই দক্ষিণ ভারতে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আমার পড়াশোনা নিয়ে মায়ের সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়েছিল। একবার উনি আমাকে নিয়ে কলকাতায় আসার জন্য মাকে বললেন। মা, বাবা কিছুদিন পর আমাকে নিয়ে উঠলেন কলকাতায় এক মাসির বাড়িতে। আমার মায়ের নাম সুরমা সেনগুপ্ত। মা কিছুদিন স্কুলে পড়েছিলেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবাসী' পত্রিকা মাকে পড়তে দেখেছি। আমার মামার বাড়ির সকলেই অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। ক্ষিতিমামা আমাকে ও আমার মাকে নিয়ে গেলেন কলকাতারই এক বিশাল বাড়িতে। পরে জেনেছি ওটা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। এখনো বেশ মনে পড়ে ঠাকুরবাড়িতে ঢোকার সময় ঐ বাড়িরই কোন ঘর থেকে বাদ্যযন্ত্রের সুর ভেসে আসছিল। ক্ষিতিমামা ও মায়ের সঙ্গে একটি ঘরে পৌঁছে দেখলাম এক বৃদ্ধ দাড়িওলা মানুষ, আলখাল্লা পরা, ইজি চেয়ারে বসে আছেন। ক্ষিতিমামা, মা ও আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমি তখন ভেবেছিলাম ঐ বৃদ্ধ মানুষটি হয়ত কোন সাধু-সন্ন্যাসী হবেন। পরে জেনেছি উনি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষিতিমামা আমাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করতে

চান সে কথা গুরুদেবকে বললেন। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমায় শিশু বিভাগে ভর্তি করে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

কয়েকদিন পরে আমার মা ও বড়দা (জ্যোতিষচন্দ্র) আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন। সেটা ছিল ১৯২৫ সালের জানুয়ারি। বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত মাটির রাস্তা ছিল। গোরুর গাড়ি ছাড়া কোন যানবাহন ছিল না।

সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও অনেক ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত শান্তিনিকেতনে। তামিল, অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা থেকে বেশ কিছু ছাত্র এসেছিল পড়তে। পূর্ববঙ্গের সিলেটের ও কুমিল্লার অনেক ছাত্র ছিল। সেই সময় অন্যদিকে বড়দের বিভাগে শ্রীলঙ্কা, জাপান ও চীন থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এসেছিল। আমি ভর্তি হবার কয়েকমাস পরেই ক্ষিতিমামা গুরুদেবের সঙ্গে চীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

চীন থেকে ফিরে গুরুদেব আমাদের শিশু বিভাগের জন্য বিশেষ একটি পোশাক প্রবর্তন করলেন। ঐ পোশাকটি পরে আমরা শুধুমাত্র বুধবার মন্দিরে প্রার্থনা সভায় যেতাম। প্রার্থনা সভায় শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ) নুটু দি (পরে চিত্র শিল্পী সুরেন করের স্ত্রী), রেখা দি (পরে চিত্রশিল্পী মণীন্দ্র গুপ্তর স্ত্রী) গান গাইতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপাল রায়, ক্ষিতিমামা এবং মাঝে মাঝে গুরুদেবও প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। প্রার্থনা সঙ্গীতের পরে এঁরা ছাত্রছাত্রীদের নানারকম উপদেশ দিতেন যা জীবনে চলার পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গুরুদেব আমাদের শিশুবিভাগে এসে মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করতেন আমরা পেটভরে খাওয়া দাওয়া করছি কিনা, খেলাধূলা করছি কিনা, প্রতিদিন রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছি কিনা। আমাদের সঙ্গে তখন শিশু বিভাগে পড়ত গুরুদেবের নাতনি নন্দিনী (পরে নন্দিনী কৃপালনী হয়েছিলেন), নন্দলাল বসুর ছেলে গোরা, নিবেদিতা আর নন্দিতা। নিবেদিতার সঙ্গে পরে নন্দলাল বসুর বড় ছেলে চিত্রশিল্পী বিশ্বরূপদার বিয়ে হয়। সাগরময় ঘোষ (পরবর্তীকালে দেশ পত্রিকার সম্পাদক), ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ছেলে রমেন দেব বর্মন পড়ত আমাদের সঙ্গে। তবে রমেন আমাদের সঙ্গে হস্টেলে থাকত না। ওদের একটা আলাদা বাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনে, সেখানে থাকত।

গুরুদেব শিশুবিভাগে এসে কখনো কখনো আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন লাগছে তোদের এখানে? বৃষ্টিতে ভিজিস? খোয়াইয়ে যাস?' যখন শান্তিনিকেতনে কোন অনুষ্ঠানের রিহার্সাল হত, তখন আমরা শিশু বিভাগের ছাত্ররা গিয়ে হাজির হতাম দীনুদার (দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুর) বাড়িতে। বাল্মীকি প্রতিভা নৃত্যনাট্য দীনুদাই পরিচালনা করতেন; তবে গুরুদেবও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন, উৎসাহ দিতেন। ক্ষিতিমামার মেয়ে অমিতাদিকে নাচে অংশ নিতে দেখেছি। আমরা ছোটরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। গুরুদেবের পরনে থাকত বিস্কুট রঙের আলখাল্লা।

কলাভবনের ছাত্ররা আমাদের থেকে বয়সে বেশ কিছুটা বড় ছিল। তারা আমাদের সঙ্গে মিশত এবং আমাদের ওপর নজর রাখত। আমরা তাদের দাদা সম্বোধন করতাম। সূর্যদা বলে কলাভবনের এক ছাত্র ছিল যে আমাদের প্রায়ই নানা রকম ভূতের গল্প বলত। আমরা ছোটরা অবাক হয়ে তার গল্প শুনতাম। আমরা শিশুবিভাগের হস্টেলে প্রায় ৭৫ জন থাকতাম। রাত দশটা পর্যন্ত জেনারেটার দিয়ে বিদ্যুৎ দেওয়া হত তারপর জেনারেটার বন্ধ করা হত। আমরা খেতে যেতাম মেয়েদের হস্টেলে। মেয়েদের হস্টেলেই দুপুরে ভাতের সঙ্গে মাছ দেওয়া হত। শিশুরা যাতে মাছ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। তখন শুনেছিলাম মেয়েদের হস্টেলটি নাকি শান্তিনিকেতনের সীমানার বাইরে, সেজন্য মাছ খাওয়ার নিষেধ ছিল না। এই তথ্য কতটা ঠিক আমি জানি না।

ভোরবেলা ঘন্টা বাজত। আমরা মুখ হাত ধুয়ে আসন নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যেতাম। গাছের নীচে আমাদের ক্লাস হত। বৃষ্টির সময় ক্লাস চলত কোন ভবনের বারান্দায়। পড়া শুরুর আগে আমাদের শিক্ষক মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, "জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধন্বারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং।" আমরা হাত জোড় করে চোখবুজে মন্ত্রোচ্চারণে গলা মেলাতাম। কিছুক্ষণ হাতজোড় করে ধ্যান করতাম, তারপর পড়াশোনা শুরু হত। শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকলে ঐ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে কোন মানুষই সংস্কৃতিপ্রেমী হয়ে উঠতে বাধ্য বলে আমার ধারণা। চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ আমার তৈরি হয় শান্তিনিকেতনে থাকার সুবাদেই। অনেকে ভাবতে পারেন বাবা, মা ও নিকটজনদের ছেড়ে আমাদের শান্তিনিকেতনে থাকতে খুব মান খারাপ হত। তা কিন্তু নয়, আমরা ছোটরা মহা আনন্দেই শান্তিনিকেতনে থাকতাম। প্রতি সপ্তাহেই শান্তিনিকেতনে কিছু না কিছু ছোটখাটো উৎসব লেগে থাকত। তখন মনে হত জীবনটা বোধহয় এরকম উৎসবময়।

একবার গুরুদেব আমাদের দিয়ে 'মুকুট' নাটকটি

অভিনয় করিয়েছিলেন। গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সমস্ত অভিনয়টি একটি সাইলেন্ট ক্যামেরায় তুলেছিলেন। আরেকটি ঘটনা আমার বেশ মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের চারপাশে অনেক আদিবাসীরা থাকত। তারা শান্তিনিকেতনেরই প্রয়োজনে মাটি দিয়ে একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করল। বাড়িটি তারাই করল কিন্তু আমাদের শিশুভবনের ছাত্রদের কাজ ছিল মাটি বওয়া

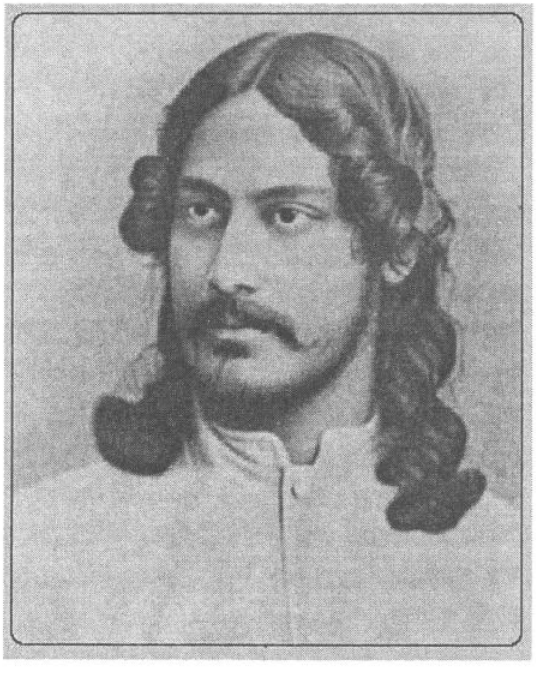

এবং অন্যান্যভাবে তাদের সাহায্য করা। জীবনে কোন কাজই যে ছোট নয় সেই শিক্ষা আমি শান্তিনিকেতন থেকেই পেয়েছি। দেখেছি বড়দের বিভাগে শরীরচর্চার জন্য গুরুদেব জাপান থেকে একজন জুডো শিক্ষককে আনিয়েছিলেন। এখন চারদিকে শরীরচর্চার আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু গুরুদেব কতদিন আগে এই শিক্ষা তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রয়োগ করেছেন—ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমার মেজদা সৌরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে হাজির। আমার মেজদা আমার থেকে ১৪ বছরের বড় ছিলেন। মেজদা বললেন, 'বাবার অসুখ, মা তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।' মেজদার সঙ্গে ঢাকায় পৌঁছে দেখলাম বাবা আগেই মারা গেছেন। বাবাকে আর শেষ দেখা হল না। আমার বয়স তখন বারো বছরও হয়নি।

অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারিনি। চেয়েছিলাম গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে চিত্রশিল্পী হতে। হয়ে গেলাম চলচ্চিত্র জগতের চিত্রগ্রাহক। ১৯৩৮ সালে ফিল্ম করপোরেশান অফ ইন্ডিয়ায় ঢুকে ছিলাম শিক্ষানবীশ ক্যামেরাম্যান হিসেবে। ১৯৪১ সালে সেই স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে; ফিল্ম পাওয়া যাচ্ছিল না—স্টুডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার সেটাই ছিল প্রধান কারণ। সেই সময় অনেক স্টুডিওই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেকেই কর্মহীন অবস্থায় ঘুরছি। সেই সময় একদিন খবর পেলাম গুরুদেব আর নেই। আমি ও আমার চলচ্চিত্র জগতের বন্ধুরা দৌড়লাম নিমতলা শ্মশানে । কিন্তু জনসমুদ্র পেরিয়ে আমরা কেউই তাঁর কাছে পৌছতে পারলাম না।

গুরুদেবের সার্ধশতবর্ষে তাঁকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানাই। আমার বয়স এখন ৯৪ বছর। অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়ে গেছি। তবে যেটুকু স্মৃতি এখনো অমলিন আছে তা বললাম।

(অনুলিখন ঃ কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সেই সে ঠাকুর

দীপ মুখোপাধ্যায়

নানা রঙের দিনগুলিতে
ফুলের মতন ফুটে
সেই সে ঠাকুর কথায় সুরে
হৃদয়পত্রপুটে,
নিঃশ্বাসে আর বিশ্বাসে যেই
চলছে ভাঙগড়া-
আলো আমার, আলো ওগো,আলো ভুবন ভরা।

দুকূল ভাসায় সুরনদীর
অপূর্ব মূর্চ্ছনা
ঠিক যখনি এই দুচোখে
দুঃখ আনাগোনা,
অন্ধকারে আলোর খোঁজে
গানের ভেলায় ভাসি-
পাতায় পাতায় হাসি,ও ভাই,পুলক রাশি রাশি।

চলার পথে হাজার বাধা
ক্লান্তি বিষন্নতা
সাহস জোগায় গানের ভুবন
বিশ্বমানবতা,
দিক দিশারি এমন ঠাকুর
সব অগতির গতি-
আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতি।

বন্দনা আর মহোৎসবে
সার্ধশত কাবার,
আমার ঠাকুর আছেন প্রাণে
প্রণাম তাঁকে আবার
হাত বাড়িয়ে পা ছুঁতে যাই
নিজস্ব আন্দাজে-
বাজে আলো বাজে,ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে।

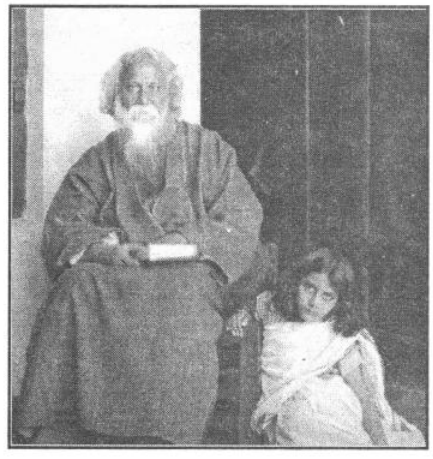

ছোট্ট ছেলের গল্প

সায়ন্তনী নাগ

ছোট্ট ছেলের মন লাগে না পড়ায়,
চৌখস সে বানিয়ে বলা ছড়ায়।
পাল্কি চড়ে পেরোয় তেপান্তর,
কিম্বা বাবার চিলেকোঠার ঘর,
রেলিংগুলো ছাত্র সারি সারি—
তাদের ওপর যত খবরদারি!
চাকরমহল, অজস্র রূপকথা
বটের ছায়া, মাঠের কথকতা,
স্কুল পালানো দস্যি ছেলেটাকে
নিঝুম দুপুর খিড়কি পুকুর ডাকে!
নীলকমল স্যার, অঘোরবাবুর পড়া,
তারই সাথে শরীরচর্চা করা,
তারই মধ্যে গানও মেলছে পাখা,
দুচোখে তার আকুল স্বপ্ন আঁকা।
ছোট্ট ছেলের সোনায় মোড়া হাত,
সরস্বতীর অঢেল আশীর্বাদ।
বড় হয়ে সেই তো কবিগুরু,
গাছের তলায় প্রকৃতিপাঠ শুরু,
এই ছেলেটা জন্মেছে বৈশাখে
আজকে থেকে দেড়শো বছর আগে।

রবিকথা ও জোড়াসাঁকোর ইতিকথা

অমলেন্দু মিত্র

রবিঠাকুর যখন জন্মেছিলেন তখন কলকাতার চিত্রটি কেমন ছিল তোমরা জানো কি? তবে শোনো, 'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে, তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ী।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতো গেল সেকেলে কলকাতার চিত্র। রবিঠাকুর যে সময়কালে জন্মেছিলেন সে সময়কার বাংলার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ওনার বছর চারেক আগে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের একশো বছর কেটে গেছে। আর ঐ বছরেই সিপাই বিদ্রোহের নিষ্ফল পরিণতি ঘটে। তার ফলে, ভারতের শাসনভার ইষ্ট-ইন্ডিয়ার হাত থেকে চলে যায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে। স্ত্রী শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলন ইতিপূর্বে শুরু হয়ে গেছিল ও পরে শুধু মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল খোলা হয়। শুধু তাই নয়, সেই সময়কালেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু হয়।

এবার জেনে নেওয়া যাক ঐ সময়কালে রবিঠাকুরের নিজের পরিবারে কী কী ঘটনা ঘটেছিল। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির গোড়াপত্তন থেকে যদি ঠাকুরগোষ্ঠীর আভিজাত্যের সূচনা ধরা যায়, তাহলে আমরা দেখবো রবিঠাকুরের জন্মকাল তা প্রায় একশো বছরের মুখে। এই একশো বছরে ঠাকুরগোষ্ঠীর ক্রমশই ধন, মান, সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছিল। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির এক সদস্য ঐ পরিবার ছেড়ে চলে এসে ১৭৮৪ সালে জোড়াসাঁকোয় বসবাস শুরু করেন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠার পর সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস তো হয়ই নি, বরং রবিঠাকুরের ঠাকুরদাদা, যাকে তোমরা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বলে জানো, তাঁর আমলে এই অবস্থা চরমতম সীমা লাভ করেছিল। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, মানে রবিঠাকুরের জন্মের পনেরো বছর আগে, সেই যুগের অবসান ঘটেছিল।

জানো তো, রবিঠাকুরের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু মোটেই ব্রাহ্ম ছিলেন না, ছিলেন হিন্দু, হিন্দু পিরেলি ব্রাহ্মণ। এই পিরেলি বা পিরালী ব্রাহ্মণদের নিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে।

জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর-বংশের আদি-পুরুষ। জগন্নাথ কুশারী ছিলেন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তাঁর আর্থিক সমৃদ্ধিও বড়ো একটা কম ছিল না, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক জাতের হীনতা স্বীকার করেও সংস্কার-মুক্তির যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছিলেন তাঁর বংশের পরবর্তী ইতিহাসে তা আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

রবিঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সেজ ভাই গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং রবিঠাকুরের জন্মের আগেই তাঁর বাবা পরিবারের প্রাচীন হিন্দুসমাজের অনেক কিছু সংস্কার তুলে দেন। রবিঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন মারা যান দেবেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান একটি মানসিক সংকটের আকার নেয়। সেজভাই গিরীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের শাস্ত্রানুযায়ী বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়া করলেও দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বাবার শ্রাদ্ধ করতে রাজি হলেন না। ফলে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠী জোড়াসাঁকোয় আসা বন্ধ করে দেন ও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সম্পর্ক ছেদের আরও কতকগুলি কারণও ছিল। দ্বারকানাথের সময় থেকেই জোড়াসাঁকোয় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হতো। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ পুত্তলিকা পূজা বন্ধ করে দেন। কারন ব্রাহ্মরা কোনও মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী

নন। যাই হোক, প্রথমে উনি জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করে দেন। আর দুর্গাপূজার সময় প্রতিবার বাড়ি ছেড়ে বেড়াতে চলে যেতেন। কালক্রমে দুর্গাপূজাও জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার থেকে উঠে যায়। বদলে যে সব অনুষ্ঠান শুরু হয়, তা মাঘোৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ, ইত্যাদি ব্রহ্মোপাসনামূলক অনুষ্ঠান। রবিঠাকুর তাঁর এক লেখায় বলেছেন—'আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।'

এখন তোমাদের আধুনিক যুগ, আধুনিকতার যুগ। আর আধুনিকতা মানেই বিদেশী আধুনিকতা। তার উপর বিশ্বায়নের প্রভাবে সর্বত্র এরই ছোঁয়া। এখন আমাদের খাঁটি ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতির দেখা মেলা ভার। তবে তোমরা শুনলে খুব অবাক হবে সেই কালে সেই সেকেলে কলকাতায় আধুনিকতা ছিল, বিশেষ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদে ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা ছিলেন আধামোগলাই। কারণ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেটাই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। এরই মধ্যে এসে পড়েছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার নয়া সাজ-সরঞ্জাম। রবিঠাকুরের ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথ শুধু ধনী ও মানীই ছিলেন না, শৌখিন ও বিলাসী ছিলেন। তাঁর সময় থেকে বিলাতি ছবি, ইতালীয় পাথরের মূর্তি, বিলাতি টেবিল-চেয়ার, শোফা কৌচ প্রভৃতি আসবাব-পত্রের আমদানি হয়েছিল জোড়াসাঁকোয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রও ছিল এই ঠাকুরবাড়িতে। যেমন বিলাতি অর্গান, পিয়ানো, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতির চলনও ছিল খুব বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দেশী ও বিলাতি সংস্কৃতির মধ্যে রবিঠাকুরের শিশুকাল কেটেছে।

তোমরা সবাই রবিঠাকুরের সেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ও সপ্তম দাদা জোতিরিন্দ্রনাথের নাম শুনে থাকবে। জানিয়ে রাখি এই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাঙলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম আই. সি. এস। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে ভারতে ফিরে আসেন ও তাঁর কর্মস্থল হয় এখনকার মুম্বাইয়ে। মুম্বাই থেকে কোন এক সময় তিনি কলকাতায় নিজের ভিটেমাটি জোড়াসাঁকোয় ফিরলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। ঠাকুরবাড়ির সামনে তাঁদের গাড়ি এসে থামলো। আর জ্ঞানদানন্দিনী পুরোদমে মেম সেজে সেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তাই দেখে প্রায় ভিরমি লাগার অবস্থা হয়েছিল। রবিঠাকুরের জ্যোতিদাদাও প্রায় এই ধরণের কান্ড ঘটিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে, আরেকটি ঘোড়ায় নিজে চড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়ের মাঠে যেতেন হাওয়া খেতে; এও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল। এইসব কান্ড দেখে ঘরে-বাইরে ছি-ছি রব উঠল। কেননা, এই ঠাকুরবাড়ির থেকে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যেতেন ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি চড়ে। বন্ধ পাল্কি-সুদ্ধ তাঁদের জলে চুবিয়ে আনা হত, ঘাটে নামবার রেওয়াজ ছিল না। রবিঠাকুরের কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন কাটে এই মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার সঙ্গে, নূতন আবহাওয়ায়, নূতন পরিবেশের মধ্যে।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার ছিল ভিন্নপথগামী। তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক—কথাবার্তা, লেখাপড়া ও চিঠিপত্রে। বাংলাভাষা ব্যবহৃত হতো অন্দরমহলে মেয়েদের শিক্ষায়—তার প্রসারও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরপরিবারে বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, তাকে ব্যবহার করা হতো সর্বত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো এক জামাই তাঁকে ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন বলে তিনি সেই চিঠি না পড়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ঠাকুরপরিবারে ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষা চর্চার ভিত হয়েছিল সুদৃঢ় এবং তাদের কথিত ভাষা এমন এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল, যাকে লোকে বলতো 'ঠাকুরবাড়ির ভাষা'। রবিঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক নিয়মিত আবৃত্তি করা প্রায় আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন।

এই পরিবারে ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চার আনন্দও উপেক্ষিত হয়নি। শেক্সপিয়ার, ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতি ইংরেজি লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ফরাসি কাব্যসাহিত্য নিয়েও পড়াশুনা করেছিলেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বদেশী সাহিত্যিকদের নূতন নূতন ভাবসম্পদে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে তোলা ছিল তাঁদের ব্রত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নিয়ম করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আসতেন।

রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংগীতিক ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল। রামমোহন হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয় বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়িতে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ও পরে তাঁর ছেলেরা, যথা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয় বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। যদুভট্টের মতো নামী সংগীত শিল্পীরা জোড়াসাঁকোয় বসবাস করতেন। এর ফলে তখন সেখানে

একটি বিশুদ্ধ সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, শিশুকাল থেকে রবিঠাকুর সুকণ্ঠ। তবে মন দিয়ে শেখা বা বিশেষ প্রণালীর মাধ্যমে শেখা রবিঠাকুরের ছোটবেলা থেকে ধাতে ছিল না। ইচ্ছামতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেতেন, ঝুলি ভর্ত্তি করতেন তাই দিয়ে। দাসদাসী, কর্মচারী, ভিখারি, বেদেনি, বাউল, মাঝিমাল্লা প্রভৃতি বিচিত্র লোককে যখন যা গাইতে শুনতেন তাই শিখে ফেলতেন। এই বিচিত্র রসের গান ও সুর শিশু রবির মনকে ভরিয়ে দিত।

তোমরা কি জানো প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দত্তক-পুত্র ছিলেন? জানো না তো! তবে শোনো—দ্বারকানাথের বাবার নাম ছিল রামমণি ও মায়ের নাম মেনকা। মেনকার গর্ভে রামমণির দুই ছেলে ও দুই মেয়ে হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। দ্বারকানাথের জন্মের এক বছরের মধ্যেই তার মা মেনকা মারা যান। দ্বারকানাথের জ্যাঠার নাম ছিল রামলোচন ও জ্যাঠাইমার নাম অলকা। অলকার গর্ভে রামলোচনের একটি মেয়ের জন্ম হলেও শিশুকালেই তার মৃত্যু হয়। রামলোচনের মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি রামমণির দ্বিতীয় ছেলে দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহন করেন। এ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন এক সন্ন্যাসী রামলোচনের বাড়িতে ভিক্ষা করতে এসে শিশু দ্বারকানাথকে দেখে অলকাদেবীকে বলেন যে, সুলক্ষণাক্রান্ত এই শিশুটি থেকে বংশের গৌরব ও ধনসম্ভ্রম বৃদ্ধি পাবে। এ কথা শুনেই নাকি অলকা দেবী দ্বারকানাথকে দত্তক নেবার জন্য স্বামীকে প্ররোচিত করেন।

হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ নিবারণ—রামমোহনের এই দুটি কীর্তির সঙ্গেও দ্বারকানাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহন একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ নিজে নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক হিন্দু হয়েও এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন এবং যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় তখন তিনি যথেষ্ঠ সহযোগীতা করেন ও পরে নিয়মিত উপাসনাতেও উপস্থিত থাকতেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর কয়েক বছর প্রধানত তাঁর দানের উপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মসমাজ বেঁচে থাকতে পেরেছিল।

প্রিন্স দ্বারকানাথ সম্বন্ধে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সকলকে গর্বিত করে। ১৮৪২-র জানুয়ারী মাসে উনি বিলাত যাত্রা করেন। ইংলন্ডে দ্বারকানাথ বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর অনুমতিতে ইংলন্ডের মার্শাল ডিউক অফ নরফোক তাঁকে একটি 'আর্মোরিয়াল এনসাইন' দেন। লন্ডনের মেয়র তাঁকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। দ্বারকানাথ ওখান থেকে স্কটল্যান্ডে গেলে তাঁকে এডিনবার্গ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে সেই মহানগরীর নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। ফ্রান্সের সম্রাট লুই

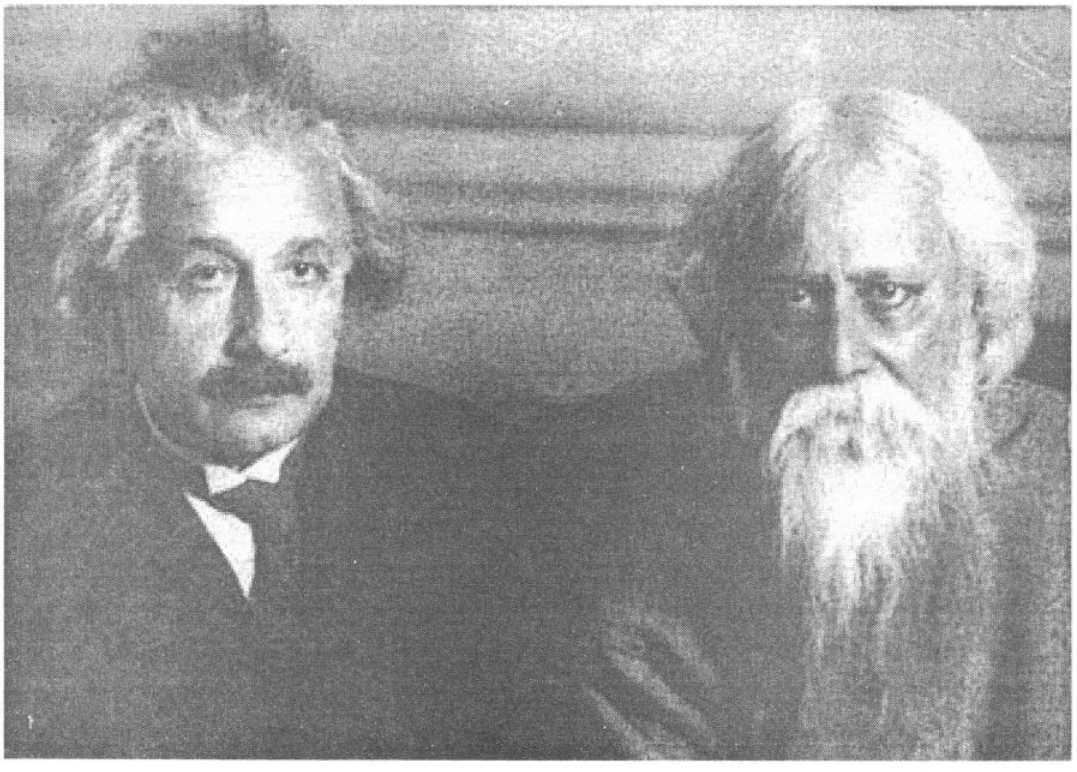

ফিলিপ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনিও একটি সান্ধ্যভোজে সম্রাট ও বিশিষ্ট অতিথিদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। দ্বারকানাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ব্যবসায়ের ও সামাজিকতার প্রয়োজনে তাঁর বাড়িতে নানাবিধ ভোজসভার আয়োজন লেগেই থাকত এবং সেখানে ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষের প্রাধান্য ছিল। দ্বারকানাথ নিজে ছিলেন আহার-বিহারে নিরামিষ ভোজী। সুতরাং প্রথম প্রথম সামাজিকতার অনুরোধে এই সব ভোজসভায় মদ্যমাংস পরিবেশিত হলেও তিনি নিজে তা স্পর্শ করতেন না। কিন্তু কালক্রমে তিনি এসব জিনিষে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার ফলে তাঁর পারিবারিক জীবনে একটি সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠে। তাঁর স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ওজস্বিনী রমনী। স্বামীর ভ্রষ্টাচারে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। দিগম্বরী দেবী ছিলেন আশ্চর্য সুন্দরী। বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দেবীমূর্তির মুখ নাকি তাঁরই মুখের আদলে তৈরি হত। যাইহোক, দিগম্বরী দেবী যখন তাঁর স্বামীর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, তখন দ্বারকানাথও পত্নীর বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ না করে তদবধি বৈঠকখানা বাড়িতেই বাস করতে থাকেন এবং বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাড়ি কিনে বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করে সেখানেই ভোজসভা, নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন করতেন।

বছর তিনেক পর তিনি আবার বিলাত যান। এবারে তাঁর সঙ্গে যান চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী চারজন বাঙালি যুবক, যাদের পড়াশুনার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে দ্বারকানাথ বহন করেছিলেন। পরের বছরের অগষ্ট মাসে লন্ডনের সারেতে মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিরে আসি রবিঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-বিবরণীতে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বড়ো ঘটনা হল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ। রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজ কোনোরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল। দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর ইচ্ছায় তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তারপর তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ধর্মতত্ত্ব প্রচার পত্রিকার প্রধান লক্ষ হিসাবে ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা সেখানে প্রকাশিত হত। আধুনিক বাংলা গদ্যের রূপগঠনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান অনস্বীকার্য। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ছাড়াও বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলার সমাজে এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। আলেকজান্ডার ডাফ প্রভৃতি খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবকরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন; যাঁরা তা করলেন না তাঁরাও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁদের বিতৃষ্ণা গোপন করেননি। আর এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুরা হিন্দুধর্মের সব কিছুকেই পবিত্র ও মাহাত্মপূর্ণ ঘোষনা করে যে কোনো সংস্কারমূলক কাজকর্মেই বিরোধিতা করতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকাকে আশ্রয় করে এই দুই স্রোতেরই গতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপন এই চেষ্টারই কার্যকরী রূপ। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যতম সম্পাদক। অবশ্য নানা কারণে বিদ্যালয়ের আয়ু দীর্ঘায়িত হতে পারেনি। কিন্তু এটি একটি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে এবং রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও নব্যপন্থী—হিন্দুসমাজের এই তিনটি শাখাকেই একসূত্রে গেঁথে যে একটি বড় কাজ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাবা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ভাই গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি অঘটন ঘটে। দ্বারকানাথ মারা যাবার পর ব্যবসার দ্বায়ভার ও ঋণভার দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের কাঁধে এসে পড়ে। প্রথমজন বিষয়কর্মে উদাসীন হলেও দ্বিতীয়জন বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঋণের জন্য সম্পত্তি বিষয়ে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পাওনাদারের নালিশে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়, এমন কি তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। পরিবারের অন্য এক সদস্যের মধ্যস্থতায় বাকি ঋণ পরিশোধের সুবন্দোবস্ত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ জেল-হাজতবাস থেকে রেহাই পান।

দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় দক্ষিণডিহি-নিবাসী সারদাসুন্দরী (শাকম্ভরী) দেবীর সঙ্গে। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বছর ও সারদা দেবীর আট। এই সূত্রে একটি দুঃখজনক ঘটনার কথা বলি। সারদা দেবীর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে স্বনাম ধন্য প্রিন্স দ্বারকানাথের ঠাকুরের প্রথম সন্তান দেবেন্দ্রনাথের বিয়ের জন্য সুন্দরী পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। কাকা দেশে ফিরে গিয়ে আট বছরের সারদাকে কলকাতায় নিয়ে এসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। যখন সারদাকে দেশের বাড়ি থেকে

কাকা নিয়ে আসেন তখন সারদার মা বাড়ি ছিলেন না। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি শোনেন তাঁর দেবর কাউকে না জানিয়ে তাঁর মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। এই খবর শোনার পর তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে অবিরত কাঁদতে থাকেন। তারপর সেখানে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা যান।

তোমরা সকলেই জান রবিঠাকুরের মা সারদা দেবী বহু-সন্তানবতী ছিলেন। সর্বমোট তাঁর পনেরোটি সন্তান ছিল—নয়টি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে। সেই কারণে তিনি ছেলে-মেয়েদের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারেননি। তখনকার দিনে অভিজাত পরিবারে তার প্রয়োজনও ছিল না, আত্মীয়-স্বজন ও দাসদাসীরাই ছেলে মেয়েদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করত। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মেয়ে সৌদামিনী দেবী তাঁর মায়ের সম্বন্ধে লিখছেন ঃ 'আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালোবাসিতেন, তাঁহার পরেই আমাদের যত আবদার ছিল।' দেবেন্দ্রন্যথের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথও সেই একই উক্তি করেছেন ঃ 'মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম স্থান। বলতে গেলে মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন।

এই কথার সূত্র ধরে আরো কিছু তত্ত্ব দেওয়া এখানে প্রয়োজন আছে। ধনীগৃহের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী জন্মের পরেই মায়ের কোল থেকে তিনি চলে যান ধাত্রীমায়ের কোলে। এই প্রসঙ্গে রবিঠাকুরের ন'দি স্বর্ণকুমারী দেবীর মেজ মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, 'সেকালের ধনিগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তুর জোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল—শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোল-ছাড়া হয়ে তারা এক একটি দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারী পরিচারিকার হাতে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না।' রবিবঠাকুরের ধাত্রীমায়ের নাম চিল দিগম্বরী ওরফে দিগ্‌মী।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ মেয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। কোনো বিদ্যালয়ে না পড়েও আন্তরিক আগ্রহে কিভাবে নিজেকে স্বয়ংশিক্ষিতা করে তোলা যায়, স্বর্ণকুমারীর জীবন তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর স্বামী জানকিনাথ ঘোষালের কৃতিত্ব অনেকখানি।

সবচেয়ে ছোটো মেয়ে বর্ণকুমারী দেবী। উনি রবিঠাকুরের মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সতীশচন্দ্র পরে দেবেন্দ্রনাথের খরচে স্কটল্যান্ডের আবারডিন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসেন।

সপ্তম জন এক পুত্র-সন্তান, নাম সোমেন্দ্রনাথ। সোমেন্দ্রনাথ প্রায় দুবছরের বড়ো হলেও রবিঠাকুরের সহপাঠী এবং হলেবেলাকার ও কিশোর বয়সের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। সংগীতে এঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সংগীতরচনা ও অন্যান্য গুণও তাঁর কিছু কিছু ছিল। রবিঠাকুরের কাব্যচর্চার ইনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' প্রকাশের ব্যাপারে এঁর হাত ছিল। আমরা দেখি রবিঠাকুরের দ্বিতীয় বই 'বনফুল' এর বেলাতেও দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধপক্ষপাতের উৎসাহেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁর মধ্যে মস্তিস্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, যদিও তা কখনই বীরেন্দ্রনাথের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। এই কারণে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়নি এবং দেবেন্দ্রনাথের উইলে আজীবন মাসোহারার বিনিময়ে সম্পত্তির অধিকার থেকেও তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর সঙ্গে রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে যশোহর ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশ বছরের মেয়ে ভবতারিনী (মৃণালিনী) দেবীর বিয়ে হয়। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে হয়—মাধুরীলতা, রেণুকা ও মীরা এবং রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেবল রথীন্দ্রনাথ ও মীরা রবিঠাকুরের মৃত্যুকালে বর্তমান ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমাদেবীর বিয়ে হয়। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। মীরা দেবীর ছেলে নীতিন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মারা যান এবং মেয়ে নন্দিতা দেবীরও ছেলে-মেয়ে হয়নি। সুতরাং রবিঠাকুরের প্রত্যক্ষ বংশধারা এখন লুপ্ত বলা যেতে পারে।

রবিঠাকুরের পরেও দেবেন্দ্রনাথের আরও একটি ছেলে হয়, নাম বুধেন্দ্রনাথ। কিন্তু নিতান্ত শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সপ্তম কিস্তি

রাজেশ বসু

চুম্বক

সন্দর্শন রায় ওরফে ইন্দ্রদা ডাক্তারীর ছাত্র ও টুকানদের বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট। বেশ কিছু জটিল রহস্যের সমাধান করে ইন্দ্রদার গোয়েন্দাগিরির খ্যাতিও ছড়াতে শুরু করেছে। আর টুকান ইন্দ্রদার গোয়েন্দাগিরির সহকারী। দুর্গাপুজোর আগে পঞ্চমীর দিন কার্সিয়ং থেকে প্রকাশ গোমস্ এলেন ইন্দ্রদার কাছে। তাঁর বাবা ফ্রেডেরিক চন্দ্র গোম্‌সের শখ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানা আশ্চর্য জিনিস সংগ্রহ করা। তাঁর কাছে হুমকি এসেছিল "কপোতের রক্ত" ফেরত চেয়ে। প্রকাশ এসেছেন ইন্দ্রদার কাছে—রহস্য সমাধানের অনুরোধ নিয়ে। ইন্দ্রদা এই মুহূর্তে কার্সিয়ং যেতে রাজি হলেন না। প্রকাশ হতাশ হয়ে ফেরার বারো দিনের মাথায় ফ্রেডেরিক গোম্‌সের হঠাৎ রাতে ভয়ঙ্কর ডাইরিয়া হয়। রাতেই হাসপাতালে ভর্তির কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মারা যান। পরের দিনই কার্সিয়ং গেলেন ইন্দ্রদা, সাথে টুকান। বিশাল বাড়ি 'গোমস্ ভিলা'-তে পৌঁছলে প্রকাশ গোমস্ বাবার ডায়েরিতে লেখা সন্দেহজনক কথা দেখালেন, মনে হয় তাঁর কাছে এক অমূল্য পাথর ছিল আর তার জন্যই কেউ তাঁকে হুমকি দিচ্ছিল। মৃত্যুর পর গোর দেওয়া হয়ে গেলেও মৃত্যুস্থলের ঘরটি বন্ধই রাখা ছিল। রাতে দুধ খাবার পরই ফ্রেডেরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে টেবিলে বসে দুধ খেয়েছিলেন, তার পাশে কার্পেটের উপর ইন্দ্রদা খুঁজে পেলেন একটা কলম। ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেডেরিকের বন্ধু জানাবাবু ও আর্ট ডিলার বাবান মিশ্র।

ফ্রেডেরিক সাহেবের সংগ্রহে রয়েছে দেশি-বিদেশি অসংখ্য জিনিস : বেশ কিছু ঐতিহাসিক বস্তু, অনেক মূল্যবান জিনিসও। একটা পেন্টিং-এ ত্রিপুরার রাজবংশের সূর্যশেখর মাণিক্য সিংহাসনে বসে, পাশে ফ্রেডেরিক সাহেব, তখন তিনি সূর্যশেখরের কাজ করতেন।

ইন্দ্রদা শিলিগুড়ি এসে সরকারী হাসপাতালের এক বিশেষ পরিচিত ডাক্তারের সাহায্যে মৃত্যুস্থলে পাওয়া কলমটিকে পরীক্ষা করালেন। ধরা পড়ল যে কলমের গায়ে লাগা শুকনো দুধের মধ্যে প্রচুর বিষাক্ত আর্সেনিক ছিল। তারপর ইন্দ্রদা গেলেন আর্ট ডিলার বাবান ওরফে হিন্দোল মিশ্রের দোকানে—প্রধানতঃ দামী পেন্টিং-এর কপি ও দামী পাথর বিক্রি হয় সেখানে। রাতে ইন্দ্রদা বললেন, নিঃসন্দেহে দুধে বিষ মিশিয়ে ফ্রেডেরিককে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর ডায়েরির সাংকেতিক কথাগুলো ঝালিয়ে দেখে মনে হল 'HM' মানে হিন্দোল মিশ্র।

প্রকাশের চেষ্টায় ও শিলিগুড়ির ডাক্তারের কথায় ফ্রেডেরিকের দেহ কবর থেকে বের করে তাকে পোস্ট-মর্টেম করা হলো। বিকেলে ফ্রেডেরিকের দাবা খেলার সঙ্গী জানাবাবুর বাড়িতে গিয়ে ইন্দ্রদা গোড়াতেই বললেন যে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ফ্রেডেরিককে হত্যা করা হয়েছে। জানাবাবুর কাছে মৃত্যুর ঠিক আগের ঘটনা শুনলাম, বারবার তাঁদের দাবা খেলায় বাধা

পড়ছিল—ফ্রেডেরিকের ছোট ছেলে রবিন এসে টাকা চাইল, আর তা দিতে বাধ্য করল। তারপর এলেন বাবান মিশ্র, আর দেবার্পণ নাথ, জিনি ফ্রেডেরিকের সংগ্রহের তালিকা তৈরি করছিলেন। তখন কয়েক মিনিটের জন্য লোডশেডিং হয়। তারপর বাবান ও রবিন চলে যান, ফ্রেডেরিকের সঙ্গে চা খেয়েছিলেন দেবার্পণ ও জানাবাবু।

জানাবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ফিরছি সন্ধ্যেয়, ফাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল—আমাদের মুখোমুখি ডানদিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছে একটা গাড়ি— বাঁয়ে গভীর খাদ।

টুকানের ডান হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে ইন্দ্রদা ওকে বাঁচালো। ইন্দ্রদা দেখালো—গাড়ির টায়ারের ছাপের ধারে অনেকটা জায়গা পানের পিকে ভর্তি। ইন্দ্রদার বিশ্বাস এই পান-চেবানো লোকটিকে সে দেখেছে যখন গোরস্থানে মিস্টার গোম্‌সের বডি গোর থেকে তোলা হচ্ছিল।

টুকানকে বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলে পরদিন ইন্দ্রদা কাজে বেরালো। টুকান বারান্দায় থেকে দেখল পিছনে, একটু দূরের সরু রাস্তায় একটা মারুতি ওম্‌নি গাড়ি, আর একজন লাল গেঞ্জি পরা লোক গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই পানের পিক ফেলছে।

টুকান বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে পিছনের রাস্তায় গেল। ওর পাশ দিয়ে একজন ষণ্ডা লোক গেল, হাতে একটা ভারি ব্যাগ নিয়ে। লাল গেঞ্জির কাছে গিয়ে সে ব্যাগটা তার হাতে দিয়ে গাড়িতে চড়ে স্টার্ট দিল। গাড়ি ঘুড়ে টুকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ও দেখল গাড়ির ডান ধারে বড় একটা ঘষটানোর দাগ আর সামনের হেডলাইটটা ভাঙ্গা। নম্বরটা পুরো দেখতে পেল না—শুধু শেষে দেখল ওয়ান-এইট-ওয়ান-ফাইভ।

লাল গেঞ্জি ভারি ব্যাগ নিয়েও বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, টুকান তার পিছু নিল। হিল কার্ট রোডে এসে লোকটি একটা বাসে চড়ে পড়ল—টুকানও উঠল।

লোকটি নামল এক গ্রামে, কাছের টয়-ট্রেনের স্টেশনের নাম টুং। লোকটির পিছু নিয়ে বড় রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে সে একটা বাড়িতে ঢুকল, টুকান একটু দূরে থেকে মোবাইল বার করে জায়গাটার কয়েকটা ছবি তুলল। বাড়ির ধারে একটা ড্রামের মধ্যে থেকে একজন বের করছে এক বুদ্ধমূর্তি, হাতে গ্লাভ্‌স্ পরে। বাইনোকুলার চোখে টুকান দেখল লাল গেঞ্জি এবার ব্যাগ থেকে একটা শিবমূর্তি বের করল। মোবাইলে তার ছবি তুলছে, এমন সময় পিছন থেকে সম্বোধন— এগিয়ে আসছে দুটি লোক—

লোকদুটিকে কাটিয়ে টুকান প্রাণপণে ছুটল উপরে কার্ট রোডের দিকে। ভাগ্য ভালো, টুং-স্টেশনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল গোম্‌স্ পরিবারের মারুতি এস্টিম গাড়ি ও তার ড্রাইভার। ফলে লোকদুটিও কার্ট রোডে উঠল না, আর চট করে কার্সিয়াং-এ ফিরে যেতে পারল টুকান।

ইন্দ্রদা বাড়ি ফিরেই বুঝে ফেললেন যে টুকান হুড়োহুড়ি করে কোথাও গেছিল—সুতরাং তখনই সব কথা খুলে বলল সে।

বিকেলে কার্সিয়ং রেল স্টেশনে খুব ভিড়—এক সিনেমার শুটিং হচ্ছে ও তার এক প্রধান চরিত্র রবিন গোম্‌স্। এরপর গোম্‌সের বাড়ি যেতে দেবার্পণবাবু ইন্দ্রদাকে বলল যে ফেডেরিকের সংগ্রহ থেকে একটি প্রাচীন ও দুর্মূল্য অষ্টধাতুর মনসা মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে না—সে কথা তিনি সাহস করে কাউকে বলতে পারেননি।

বাড়ি ফিরে ল্যাপটপ নিয়ে ইন্দ্রদা বসলেন কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করতে। কিছু পরে টুকানকে প্রমাণ দেখালেন যে ত্রিপুরার রাজসভার ছবিটি দুজনে মিলে আঁকা—"AJ" ও ফণি গুপ্ত। AJ কি জানাবাবু? ফ্রেডেরিকসাহেব খৃষ্টান হবার আগে কি তিনিই ফণি গুপ্ত ছিলেন?

সকালে ইন্দ্রদা বেরোবার জন্য তৈরি, বাজল কলিং বেল—কে এসেছে?

পিছন ঘুরতে দেখি শাল মুড়ি জানাবাবু। মুখে পাইপ। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। নজর বলতে হবে ভদ্রলোকের, চোখে কালো চশমা এঁটেও এত কম আলোতে ঠিক চিনেছেন আমাদের।

ইন্দ্রদা চাপা গলায় বলল, "থিংক অফ দ্য ডেভিল অ্যাণ্ড ডেভিল ইজ দেয়ার।"

জানাবাবুই আসল ডেভিল কিনা এটা জিজ্ঞেস করার আগেই ভদ্রলোক কাছে এসে পড়লেন।

"গুড ইভনিং!" ইন্দ্রদা উইশ করেছে।

"গুড ইভনিং! তা কাজ এগুচ্ছে তো। কিনারা হল কিছু। কাগজে যেন দেখছিলাম আত্মহত্যা লিখেছেন।"

ইন্দ্রদা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, "আপনি তো চন্দননগরের ন্যাশনাল আর্ট কলেজে আঁকা শিখেছিলেন। —সালটা বলতে পারবেন, মনে আছে কী?"

ইন্দ্রদা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক না বলবেন। কিন্তু মাথা উপরে নীচে দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে, কিন্তু কেন বল তো?"

"দরকার আছে। সেই সময়ের কোন সহপাঠীর নাম মনে করতে পারেন?"

"তুমি কি আমার মেমরি টেস্ট করছ নাকি হে," বললেন

জানাবাবু, "অত পুরনো কথা মনে থাকে নাকি।"

"মনে না থাকলে আমি বলে দিই। আপনার বন্ধু ফ্রেডেরিকসাহেবও সেই বছরে আপনার সহপাঠী ছিলেন।" জানাবাবু বাধা দিতে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রদা সুযোগ দিল না, "কারণ সে সময়ের একটি ছবি গোম্‌স পরিবারে এখনও আছে। তাতে আপনারা দু'জনেই ছিলেন।"

"কি জানি হতে পারে।" বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন জানাবাবু।

"হতে পারে না। হয়েছিল। শুনে যান জানাবাবু।" গম্ভীর গলায় বলল ইন্দ্রদা, "একটা সত্যি কথা বলুন তো, না বললে কিন্তু আপনারই বিপদ। আপনার বৈঠকখানার সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই করা ছবিটি কার?"

"কেন, বলেছি তো। আমার ভাইয়ের।" বললেন জানাবাবু।

"কিন্তু আমি যদি বলি ওটা আপনার নিজের। সূর্যশেখর আর ফ্রেডেরিক গোম্‌সের ফিগারটা ডিজিট্যালি ডিলিট করে খালি নিজের ছবিটা রেখে দিয়েছেন।"

জানাবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রদা থামিয়ে দিল, "অস্বীকার করার উপায় নেই জানাবাবু। যে স্টুডিওতে কাজটা করেছেন, তারাই এই ইনফরমেশনটা আমাদের দিয়েছে। তাছাড়া আপনার ভাই তো পূর্ণবয়স্ক হওয়ার অনেক আগেই মারা যায়। তার তরুণ বয়েসের ছবি আসবে কোত্থেকে?"

জানাবাবু হঠাৎ পাথর।

"আর আপনার পুরো নামটা হল অর্জুন বিকাশ জানা। এখন খালি বিকাশ জানাটুকুই লেখেন। ম্যাজিক হার্প কোম্পানি কিন্তু এটা কনফার্ম করেছে। এবার বলুন তো ফ্রেডেরিক গোম্‌স আগে কী নামে পরিচিত ছিলেন?"

ভদ্রলোক মনে হল এই ঠান্ডাতেও কুলকুল করে ঘামছেন।

বিড়বিড় করে বললেন, "সব তো জেনেই গিয়েছেন। ওর নাম ছিল ফ....ফণি গুপ্ত। তবে বিশ্বাস করুন, ফ্রেডেরিককে আমি মারিনি। কেনই বা মারতে যাব। কীসের জন্যে। বিয়ে-থা করিনি। অর্থেরও কোন অভাব নেই আমার। এতদিন পর পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ পেয়ে ওর আঁকা ছবিটা খালি বড় করে বাধিয়ে রেখেছি। এতে নিশ্চয় কোন অপরাধ নেই।"

"অপরাধ যদি না-ই মনে করেন, তবে সত্যিটা লুকোতে লেগেন কেন হঠাৎ?" ইন্দ্রদা বলল।

"মানে..."

"আর একটা কথা, ছবিটা কোথায় এঁকেছিলেন?"

জানাবাবু চমকে উঠলেন মনে হল।

বললেন, "ইয়ে ওটা,.....চন্দননগরেই আঁকা। সূর্যশেখর নিজে এসে সিটিং দিয়েছিলেন। ওর ছবিটা আমার করা। পরে সে ছবি না নিয়ে যাওয়াতে আমি আর ফণি মিলে সূর্যশেখরের দু'পাশে নিজেদের ছবি এঁকে ফেলি। তারপর তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম।"

ইন্দ্রদা খালি বললে, "অর্থাৎ ছবির শিল্পী AJ হলেন আপনি নিজেই, অর্জুন জানা—তাই তো। তখন আবার মধ্যের বিকাশটা উহ্য রাখতেন।"

জানাবাবু নিশ্চুপ।

"ঠিক আছে, আসুন আপনি।" ইন্দ্রদা বলল। ধীর পায়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। মুখের পাইপ হাতেই রয়ে গেল দেখলাম।

উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি নীচে নামছিল। হাত দেখিয়ে সেটাতে উঠে পড়লাম আমরা।

"রহস্যের সমাধান হয়ে এল রে।" গাড়িতেক উঠেই বলল ইন্দ্রদা।

আমার বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

"সত্যি!"

"ইয়েজ। তবে অনেক কাজ। বাড়ি গিয়ে আগে দেখতে হবে দেবত্রি কী খবর পাঠাল। অলরেডি একটা সাংঘাতিক ইনফরমেশন তো এই মাত্র ফোনেই দিল।"

"১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল আর্ট কলেজে ফণি গুপ্ত এবং অর্জুন জানা আঁকা শিখতেন!"

"কারেক্ট। খুব কঠিন কাজ ছিল। ছবিতে মুখ দেখে অনুমান করা গেলেও এতদিন পর নামটা মনে রাখা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জানিস তো ভাগ্যদেবী সবসময় বুদ্ধিমানদের ফেভারে হয়।"—আদপে যদিও ব্যাপারটা হল বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তবু কিছু বললাম না। ইন্দ্রদা নিজের মতো এরকম বানিয়ে নেয়।

"দেবত্রির এক তুতো-দাদুই নাকি সে সময়ে ঐ কলেজে পড়তেন। তিনি ছবির কপি দেখে তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এক, সে সময়ে অর্জুন নামে একটি ছেলে দুর্দান্ত ছবি আঁকত। ছেলেটির একটি দশ-বারো বছরের ভাই ছিল। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ সে মারা যায়। ভাইকে অর্জুন খুব ভালবাসত। তার মৃত্যুতে সে এতই অস্থির হয়ে পড়ে যে, সব ছেড়েছুড়ে কোথায় চলে যায় যেন। এবং দুই, ফ্রেডেরিক গোম্‌স কেন, সে সময়ে কোন ক্রিশ্চান ছাত্রই ছিল না ন্যাশনাল আর্ট কলেজে। তিন নম্বর হল, এই অর্জুন ছেলেটি তার এক সহপাঠীর সঙ্গে নতুন একটি পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শুরু করে। তা হল একটি ছবিকে দুজনে মিলে পর্যায়ক্রমে এঁকে শেষ করা। সেই সহপাঠীটির নাম ছিল ফণি। টাইটেলটা তিনি আর মনে করতে পারেননি। অতএব বুঝতেই পারছিস, জাস্ট আন্দাজের ওপরে ঢিল ছুঁড়েছিলাম। যদিও আর একটা সূত্র ছিল, সেটা পরে জানবি।"

বাড়ি পৌঁছে ইন্দ্রদা থানায় আর একটা ফোন করে নিল। তারপর লোবেনকে চা করতে বলেই বসে পড়ল ইন্টারনেটে। আমি আর কী করি, মনে মনে পুরো ঘটনাটা সাজাতে চেষ্টা করলাম। বিকেলে দেবার্পণবাবুর ওপর সন্দেহটা পড়ছিল। লোকটাকে খুনি হিসেবে ভাবতে যুক্তি খাড়া করছিলাম। কিন্তু, একটু আগেই আবার জানাবাবুর অপরাধী ভাব দেখে গোটা ব্যাপারটা আবার জট পাকিয়ে গেল। কাকে ছেড়ে কাকে যে সন্দেহ করতে হবে, বোঝাই যাচ্ছে না। অথচ ইন্দ্রদাকে এখন অনেকটাই রিল্যাক্সড্ দেখছি। ওর প্রিয় পিট সিগারের একটা গানও গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছে। আমাকে খালি বলেছে রাতের খাওয়া হাল্কা করে এখনই সেরে রাখতে। সেই মত খেয়ে-দেয়ে বসে আছি। তাও আধঘন্টা হতে চলল খাওয়া হয়েছে। বসে থেকে থেকে ঘুম ঘুম পাচ্ছে এমন সময় 'গট ইট' বলে পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রদার গলার আওয়াজ পেলাম, আর পরক্ষণেই আমাকে ডাক দিল।

"ঠিক যা সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু আরও আগে এটা আমাদের স্ট্রাইক করা উচিত ছিল।"

"আমাদের বল না", বললাম আমি, "তুমি তো আমাকে আদ্ধেক কথা বলছই না।"

ইন্দ্রদা ঘড়ি দেখল, "অলরেডি সাড়ে-সাতটা বাজে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে বেরুতে হবে। অনুমান মতো আজ রাতেই ক্ল্যাইম্যাক্সটা হবে।—কী জানতে চাস ঝটপট বল।"

শুনেই আমার বুকের মধ্যেটা গুড়গুড় করে উঠল। বললাম, "বাঁশে ঝোলান ছাব্বিশটা দড়ির রহস্যটা জানতে চাই।"

"ওটার কথা আর বলিস না। ছিঃ ছিঃ, সত্যি পড়াশোনাটা আজকাল একদমই করা হচ্ছে না। প্রথমদিনেই বোঝা উচিত ছিল।"

বললাম, "দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইন্দ্রদা।"

"জিনিসটা কি জানিস, ইনকাদের লেখার একটা পদ্ধতি। এটাকে বলে ক্যুইপু বা কিপু। শব্দটা এসেছে স্প্যানিশ Khipu শব্দ থেকে। ইট মিনস নট, অর্থাৎ গিট। সে যুগে ডেফিনিট কোন রাইটিং-স্টাইল বা স্ক্রিপ্ট ছিল না। জাস্ট কতগুলো দড়ির বিভিন্ন জায়গায় গিঁট বেধে সাংকেতিকভাবে ইনফরমেশন রেকর্ড করে রাখা হত। অনেক সময় দড়িতে নানারকম রঙও থাকত। এক একটা রঙ এক-একটা জিনিসকে বোঝাত। যেমন দড়িতে হলুদ রঙ করলে বুঝতে হবে সোনা বা ভুট্টার কথা বলা হচ্ছে। অনকটা চাইনিজ অ্যাবাকাসের মতো। ফ্রেডেরিকসাহেব এটারই একটা মডিফায়েড ফর্ম নিজের মতো বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ক্যুইপু-তে ছিল ছাব্বিশটা দড়ি, মানে ইংরেজির ছাব্বিশটা লেটার। দুর্মূল্য একটা স্টোন যে ওঁর কাছে ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কারণে সেটা তিনি কাউকে দেখাতেন না। যদিও সেটারও একটা আভাস এইমাত্র দেবত্রির মেল থেকে জানললাম। সে কথায় পরে আসছি। আসল ঘটনা হল ফ্রেডেরিকসাহেব কু কু বলতে এই ক্যুইপু'র কথাই মিন করেছিলেন। যদিও এর উচ্চারণ কিপু-ও হতে পারে। তবে আমার ধারণা তিনি ক্যুউপু উচ্চারণটাই করতেন। আর তাতেই যত গন্ডগোল। নিজে যে ভুলেও কখনো ছেলেদের এই ক্যুইপুর ব্যাপারে কিছু বলেননি, সেটা হয়তো অন্তিম সময়ে খেয়াল ছিল না। ফলে ঘটনাচক্রে সকলে ভাবল, নাতনি ক্যুইনিকে দেখতে চাইছেন।"

"কিন্তু ক্যুইপু- তে কী বলা ছিল?"

"উহু, আর না প্লিজ। ঘাবড়াস না সব বলব। সাসপেন্সটাও তো এনজয় করার জিনিস—না কি?" উঠে পড়ল সে, "হাতে একদম সময় নেই। এক্ষুনি বেরতে হবে।"

"এখন আবার কোথায় যাবে?"

"ডাউহিল রোডে গোম্‌সভিলার আশপাশে নজরদারি আছে। ভাগ্যিস পাহারাটা রাখতে বলেছিলাম।"

।। ১০ ।।

অনেকক্ষণ ধরে গলার কাছটায় সুড়সুড়ি লাগছিল। পিঁপড়ে না পোকা কে জানে। বেরনর সময় ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখে বেরিয়েছি। এখন অবশ্য সব মেঘে বা কুয়াশায় ঢেকে গিয়ে চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তৈরি করে রেখেছে। ইন্দ্রদা ঠিক আমার পাশেই বসে। পাথরের মত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও টের পাচ্ছি না কিছু। অতিকষ্টে ওকে রাজি করিয়ে এই রিয়েল-লাইফ অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হতে পেরেছি। বেরনর সময় হঠাৎ বলে কিনা, তোর আর ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। যদিও শেষে আমার জেদের কাছে হার মেনেছে। বলেছে, বেগড়বাই করলে বাড়ি তো রেখে আসবেই, আর কোনদিন সঙ্গে নেবে না।

কাজেই নট নড়নচড়ন অবস্থায় দমবন্ধ করে এই ঝোঁপের মধ্যে বসে আছি। কিন্তু আর কতক্ষণ পারব জানি না, সুড়সুড়িটা যে দেখছি নাকের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। হাত দিয়ে সরাতে যেতে সরসর করে পায়ের ওপর দিয়ে কী চলে গেল, আর তক্ষুনি সব ভুলে ওরে বাবা বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। আর পরমুহূর্তে মাথার ওফর ইন্দ্রদার গাঁট্টা।

ফিসফিস করে বলল, "চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"কী একটা পায়ে উঠছিল।"

ইন্দ্রদা নির্বিকার হয়ে বলল, "কী আবার, ইঁদুর-টিদুর হবে। আমার পায়েও উঠছিল। তুই কি ভাবছিস, সাপ!"

বললাম, "হতেও তো পারে, এত কিছু আনলে, একটু কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াতে পারতে।"

"ছড়ালাম তো।"

"কিন্তু ওটা তো দেখলাম ফেনলের বোতল।"

"বুদ্ধ আমার, এই পড়াশোনা হচ্ছে। ফেনলটাই তো কার্বলিক অ্যাসিড। তাও জানিস না। তাছাড়া এত ঠান্ডায় সাপ বেরবে না। আর কথা না। জ্যাকের ভূত কামড়ে দেবে তবে।"

কথাটা শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। জ্যাকের ভূতের ভয়ে না। অমন সুন্দর কুকুরটা মরে ভূত হতেই পারে না। কিন্তু জলজ্যান্ত জীবটা মরে গিয়ে এখন মাটির তলায় শুয়ে আছে ভাবতে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল বুকের মধ্যে। এখানে বলা দরকার, আমরা রয়েছি গোমসভিলার পিছনের পাঁচিল ঘেরা জমিটাতে। আগাছার মধ্যে বড় বড় ফার্ন গজিয়েছে, তারই মধ্যে বসেছি আমরা। আমাদের থেকে হাত বিশেক তফাতে জামরুল গাছ, তার নীচেই আজ সকালে জ্যাককে কবর দেওয়া হয়েছে। ক্ল্যাইম্যাক্সের জন্য এরকম বিদ্‌ঘুটে জায়গা কেন, জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হয়নি, শুধু বলেছে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রেখে বসে থাকতে। অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট তো হবেই এমন বসে আছি। আরও কতক্ষণ থাকতে হবে কিছুই জানি না। চোখ নাক মুখ ছাড়া শরীরের বাকি অংশ গরম পোশাকে ঢেকে রেখেও স্যাঁতসেতে একটা ঠান্ডা টের পাচ্ছি মাটির থেকে।

পাশ থেকে একটা হাল্কা বেগুনি আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ইন্দ্রদার চাইনিজ পেন। পেনের খাপে লাইট আছে।

"ঘড়ি দেখলে?"

"হুঁ।"

"ক'টা বাজল?"

"দশটা, ... সস্‌স্‌স্‌ ... কথা বলিস না।"

গোম্‌সভিলা থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ আসছে। উপরের ঘরগুলো অন্ধকার কেবল নীচের দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। পুরুষ কণ্ঠে কথা কাটাকাটির আওয়াজ। থামল একটু। পিছনের দরজা খুলে গেল। ভিতরের আলো বাইরে ফুলের বাগানে এসে পড়েছে। বাগান পেরিয়ে পাঁচিল! পাঁচিলে ছোট লোহার গেট। আর তার পরেই এই জমি।

দু'জন বেরিয়ে এল। সামনের জনের হাতে টর্চ। সেটা এদিক-ওদিক ঘুরছে। পিছনের জন কী একটা বলল।

"ডিসগাস্টিং! সব কিছুতে তোমার বাড়াবাড়ি। বাড়ির কুকুরটা মারা গেল, আমাকে একটা খবর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না।" টর্চধারী বলে উঠল। টর্চের আলো ঘুরছে আমাদের ওপর। দমবন্ধ করে বসে আছি দুজন।

পিছনের জন কী একটা হাত নেড়ে বলল, বোঝা গেল না। কিন্তু সে যে টর্চধারীকে কিছু বোঝাচ্ছে সেটা বলা যায়। কাজও হল। টর্চের আলো এবার উল্টোদিকে। ফিরে যাচ্ছে দুজন। দরজা বন্ধ হল। আবার অন্ধকার।

"কে বুঝলি তো?" ইন্দ্রদা বলল চাপা স্বরে।

"মিঃ গোম্‌স তো একজন, আর..."

"আর একজন ওর ভাই, রবিন গোম্‌স। জ্যাক এভাবে হঠাৎ মরে যাওয়াতে দুঃখ পেয়েছেন।"

তাই হবে। গলার আওয়াজটা ওরকমই মনে হল। খুব কাছ থেকে বিচ্ছিরি রকম ঝিঁঝির ডাক শুরু হল হঠাৎ। এত তীক্ষ্ণ, কানের পর্দা ফেটে যাবে যেন।

ইন্দ্রদা বলল, "কেমন লাগছে?"

"মানে, —ঝিঁঝির ডাক?"

"তাছাড়া আর কী, তোর ডাকের ব্যাপারে তোকেই তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না।"

বললাম, "নিজে এখন এত কথা বলছ, এই বেলায় কিছু হয় না,—না?"

"সরি। আওয়াজটা কেমন হয়েছে সেটা বল?" ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হঠাৎ।

"উরিব্বাস, তুমি এটা করছিলেন। রেকর্ড করে এনেছ?"

"ইয়েস বস", বলল ইন্দ্রদা, আবার চালিয়েছে, অন্ধকারে কী করে অপারেট করছে কে জানে। "কেমন হয়েছে বল, ওরিজিন্যাল মনে হচ্ছে কী?"

"সেন্ট পার্সেন্ট! কোত্থেকে তুললে?"

"এনসাইক্লোপিডিয়ার সিডি থেকে। তবে এটা কিন্তু ক্রিকেট্‌স সং মানে ঝিঁঝির ডাক না। সিকাডার।"

"সেটা আবার কী?"

"এও ইনসেক্ট, তবে লার্জার দ্যান ইয়র ঝিঁঝিঁপোকা। বড় ডানার জন্যে আওয়াজটাও অনেক বেশি তীক্ষ্ণ আর কন্টিনিউয়াস। বাংলায় কী একটা নামও আছে যেন—, দূর ছাই, মনে আসছে না।" হাই তুলল একটা।

ক্রীরর্‌র ক্রীরর্‌র করে কী একটা পাখি ডেকে উঠল আমাদের মাথার ওপর থেকে। গোমসভিলার নীচের ঘুরদুটোর আলোও নিভে গেছে কখন। চারিদিক অথৈ জমাট অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও বাড়িও নেই এদিকটাতে। মাঝে মাঝে ঝাপটা বাতাসে গাছের পাতায় অদ্ভুত একটা সরসর শব্দ উঠছে। ঘুম চোখ জড়িয়ে আসছে। ....ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিনা কে জানে, অদ্ভুত একটা আওয়াজে নড়েচড়ে বসলাম। আওয়াজ না, সুর আছে যেন। গান গাইছে কেউ নেপালি ভাষায়।

আমাদের পিছনে চারফুটের পাঁচিল। তার ওপাশে সরু পায়ে চলা রাস্তা। সেটা মিশেছে বড় রাস্তায়। সংযোগস্থলে একটা বড় কালভার্ট। সেটার ওপর একটি ভিখিরিকে জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। সে ব্যাটাই এখন সঙ্গীতচর্চা শুরু করল মনে হচ্ছে। একটুপরই অবশ্য গানের গুঁতো বনধ হল। এবং তার একটু পরে মনে হল বড় রাস্তার

মোড়ে কোন গাড়ি এসে দাঁড়াল। ইঞ্জিন বন্ধের আওয়াজ পেলাম।

ইন্দ্রদা আমার ডানহাতে আলতো চাপ দিয়েছে। অর্থাৎ চরম সময় সমায়াত। আমিও ওর বাঁ হাতে একটু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম বিলক্ষণ স্টেডি আছি।

কিন্তু কই, আবার সব চুপচাপ নিঝুম যে। দূরে কোথাও একটা কুকুর সুর করে ডাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার অখণ্ড নীরবতা। এক একটা সেকেন্ড যেন এক একটা বছর। সময় এগুচ্ছেই না।

আচমকা একটা শব্দ। খসখস .... খসখস ....., পায়ের আওয়াজ!

কেউ আসছে। আমাদের পিছন দিক থেকে। মানে পাঁচিল টপকে ঢুকবে। আমরাও ঐভাবে ঢুকেছি।

ঝপ করে শব্দ হল। অন্ধকারে চোখ এখন অনেকটাই অভ্যস্ত। বেঁটে মতো একটা লোক। হাতে কী একটা, ... কোদাল! সোজা গিয়ে দাড়িয়েছে জামরুল গাছটার নীচে। ভঙ্গিতে বোঝাই যাচ্ছে, এ জায়গা তার যথেষ্ট পরিচিত।

এবার অন্য শব্দ, —মাটি খোঁড়ার আওয়াজ।

লোকটা আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটি খুঁড়ছে। খক্ করে কাশল একটু। ওরে বাপরে, কী বিকট একটা গন্ধ! কী কান্ড, জ্যাকের মৃতদেহটা বের করেছে। কোদাল রাখল। এবার হাতে অন্য কী একটা, ছুরি!

জ্যাকের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। অদ্ভুত তো। কী করছে লোকটা। পকেটে হাত দিয়ে সেলোফেন-পেপারের মতো কি একটা বের করল। দেখার কথা না, হঠাৎই কুয়াশা পাতলা হয়ে চাঁদের আলোর ঠিকরে বেরিয়েছে, তাতেই লোকটার সেলোফেনটা চকচকিয়ে উঠেছে।

আচমকা আমার পাশেই অন্য একটা খসখস আওয়াজ। কী সাংঘাতিক।

ইন্দ্রদা ঘসটে ঘসটে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটার দিকে।

গাছগাছালির জন্য চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে না পড়লেও পাতার ফাঁকফোকর থেকে উপচে তো পড়েইছে। লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরলেই ইন্দ্রদাকে দেখতে পাবে। প্রচন্ড উত্তেজনায় আমারই হাত-পা কাঁপছে। ইন্দ্রদা আর

বড়জোর দু'হাতের মধ্যে। লোকটা এখনও উঁবু হয়ে বসে আছে। কী করছে ইন্দ্রদা, উৎকট গন্ধের বদলে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল যেন পরক্ষণেই দেখি ইন্দ্রদা লোকটাকে দুহাতে জাপটে ধরে উল্টে ফেলেছে। সামান্য ধস্তাধস্তি। লোকটাকে ছেড়ে উঠে ধাড়াল ইন্দ্রদা। মাটি থেকে সেলোফেনের মোড়কটা তুলে পকেটে ভরল। তারপর লোকটাকে টেনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে ফেলল। আর ঠিক তক্ষুনি, আমার পিছনে পাঁচিলের ওধার থেকে কে যেন বলে উঠল, "কিঁ ভাই, ইতনা টাইম কিউ লেতা?"

ইন্দ্রদা দেখি ঝট্ করে বসে পড়েছে। ভ'বখানা এমন ওই যেন গর্তটা খুঁড়ছে।

ধপ করে আবার একটা শব্দ। দ্বিতীয় ত ন্তুক পাঁচিল টপকালেন। থুঃ করে একটা শব্দ। আর পর· র্তেই চিনতে পারলাম লোকটাকে।

ট্যাটুড স্পিটিংস্পাই!

এখন আবার মাথায় একটা ক্রিকেট ক্যাপ-ও চড়িয়েছেন।

"কিউ রে হুয়া কেয়া?" আবার বলল সে। ইন্দ্রদা উঁবু হয়ে মাটি ঘাটছে।

লোকটা কী বিপদ টের পেল,—দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সব্বোনাশ! ঠিক যা ভেবেছি, পকেট থেকে টর্চ বের করেছে। স্টান ইন্দ্রদার ওপর।

কী একটা বলল বিচ্ছিরিভাবে। হিন্দী না, নেপালি—তাই বুঝলাম না। গালাগাল দিচ্ছে, বুঝতেই পারছি। সে না হয় দিক, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক কান্ড লোকটার অন্য হাতে কখন উঠে এসেছে একটা পিস্তল, তার ব্যারেলটা চাঁদের রুপেলি আলোতে চকচক করছে।

আর সময় নেই। নার্ভগুলো সব টানটান হয়ে উঠল যেন।

ঝট্ করে উঠে দু'পা তাক করে শূণ্যে ভাসিয়ে দিলাম শরীরটা। প্রচন্ড জোরে গিয়ে পড়লাম লোকটার পিঠে। ওক্ করে একটা আওয়াজ তুলে ছিটকে পড়েছে ব্যাটা। গতবছরে শেখা কিক্‌বক্সিংটা এতদিনে মোক্ষম কাজে এল।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন, মধ্যেই দেখি ইন্দ্রদা লোকটার ওপর চড়ে বসে কী একটা গুঁজে দিয়েছে তার মুখে। সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা পেলাম আবার। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল স্পিটিং স্পাই।

"গ্রেট টুকান! গ্রেট!" বলল ইন্দ্রদা। হ্যান্ডশেক করল আমার সঙ্গে। "আমার ব্যাগটা চট করে নিয়ে আয় তো।"

ব্যাগ আনতে ভিতর থেকে নাইলনের দড়ি বের করে লোকটার হাত-পা বাধা হল।

"আগের লোকটা কে ছিল, ইন্দ্রদা?"

"সে কি, তুই চিনতে পারিস নি, রুইদাসের ছেলে সুবল।"

"সু-ব-ল!"

"ইয়েজ স্যার, দাঁড়া সে ব্যাটাকেও বাঁধতে হবে। ক্লোরোফর্মের রেশ কতক্ষণ থাকবে কে জানে।"

এতক্ষণে বুঝলাম মিষ্টি গন্ধটা তবে ক্লোরোফর্মের।

সুবলকে বাঁধার পর জ্যাকের দেহটা কোদাল দিয়ে কোনমতে ঠেলে গর্ত বুজিয়ে ফেললাম দুজনে। ইন্দ্রদাকে দেখি বারে বারে জিনস তুলে পা চুলকাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করতে যাব, পাঁচিলের ওপার থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "আরে ভাই, দু'জনে কী করছ এত সময়?"

ইন্দ্রদা করল কী চট করে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে সিকাডা পতঙ্গের সেই কানজ্বালানি আওয়াজটা চালিয়ে দিল। লোকটার চেহারা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পাঁচিলের ওপাশেই দাড়িয়ে আমাদেরকে ঠাওর করার চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রদা ঝট করে মাটির থেকে গুটখাখেকো লোকটার টুপিটা তুলে আমাকে বাড়িয়ে দিল।

"মাথায় দে। আর এটা ধর।" দেখি জিনসের পকেট থেকে সেই সেলোফেনের মোড়কটা বের করেছে।

"কী এটা?"

"প্রশ্ন পরে। লোকটার হাতে এটা দিবি। খুলে দেখতে পারে, না-ও পারে। যদি না দেখে তবে এটা নিয়ে ও চলে যাবে। তুইও যাবি পিছন পিছন। নাথিং টু ফিয়ার। মনে রাখবি স্পিটিংস্পাইয়ের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছিস। অন্ধকারে চট করে ধরতে পারবে না। তোদের দুজনের হাইট প্রায় সেম।"

এইবার আমার পা কাঁপছে। যদিও সাংঘাতিক একটা উত্তেজনাও হচ্ছে ভিতরে। এমন পরিস্থিতিতে কখনোও পরিনি। রিয়েল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার বুঝি এমনই হয়!

"এ পাসাং, পাসাং...." লোকটা ডাকছে আবার। গলার আওয়াজ বুড়োটে মতন। গুটকাখেকো স্পিটিংস্পাইয়ের নাম তবে পাসাং।

কিন্তু, এ কী, এও যে পাঁচিলের ওপরে উঠে বসেছে, টপকালো বলে। না, চমকে ওধারে আবার নেমে পড়েছে। চমকেছি আমিও। ঘেউ ঘেউ করে দু'তিনটে কুকুর হঠাৎ ডেকে উঠল। খুব কাছ থেকেই।

ইন্দ্রদার দুর্জয় সাহস। ভ্রুক্ষেপ না করে পাসাং মানে স্পিটিংস্পাইয়ের পা দুটো টেনে জামরুল গাছের তলায় এনে ফেলল।

পাঁচিলের ওধার থেকে নতুন লোকটা এধারে ঠিক কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

নেপালিতে কী একটা বলল। তারপর আবার হিন্দীতে, "মাল মিলা কেয়া।"

"যা হাতে গুঁজে দিয়ে আয়।" আমতা আমতা করছি, বলল, "এক কাজ কর, একটু কাছে গিয়ে হাতটা তুলে

দেখা। ভাববে ওয়েট করতে বলছিস। কুকুরের ভয় পাস না। ঝিঁঝির মত এটাও ফলস।"

শুনে তাও একটু স্বস্তি পেলাম। কিন্তু তিন পা এগোতেই হৃদপিন্ড আবার গলার কাছে। বুড়ো লোকটার পিছনে আরও একটা লম্বা-চওড়া লোক সোজা এদিকেই এগিয়ে আসছে। ইন্দ্রদাও পিছনের লোকটাকে দেখেছে। বলল, "স্মার্টলি গিয়ে পাঁচিলের ওপরে মোড়কটা রাখ। অ্যাক্টিং এমন হবে যেন কুকুরের তাড়া খেয়েছিস।"

ইন্দ্রদা বলছে বটে। কিন্তু পা যেন চলছে না। উত্তেজনায় বুকের মধ্যেটা ধড়াস-ধড়াস করছে।

"টুকান...," দাঁত চেপে বলল ইন্দ্রদা। "লোকটা এসে পড়লে মুশকিল। কাম অন..."

যা থাকে কপালে। কুকুর তাড়া করেছে এমন করে একটু ছুটেই পাঁচিলের কাছটায় চলে এলাম। বুড়ো লোকটা মাংকিটুপি পরে আছে। আমার থেকে বড়জোর তিন-চার হাত তফাতে। চিনতে পারছে কী? ভাবার সময় নেই। মোড়কটা পাঁচিলের ওপরে রাখলাম, তারপরেই বিদঘুটে একটা আওয়াজ করে ঝট করে বসে পড়েছি। ভাবটা এমন কিছু যেন কামড়ে দিয়েছে।

মাংকিটুপি টোপটা গিলল। বসে বসে দেখলাম হাত বাড়িয়ে সেলোফেনটা উঠিয়ে নিয়েছে। কী একটা বলল নেপালিতে। বোঝার কথা না। এবার কী করব ভাবছি, তক্ষুনি পরিষ্কার বাংলা শুনলাম, "ব্যাপারটা কী, এত সময় লাগছে কেন। পাসাং কই?"

সব্বোনাশ! পিছনের লোকটা এসে পড়েছে যে। আমার বুকের মধ্যে বুলেট ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই দেখলাম প্যাকেটের হাতবদল হল। মাংকিটুপি নেপালিতে কী একটা বললও যেন বিড়বিড় করে। পাসাংকে নিয়ে যে কথা সেটাই খালি বুঝতে পারছি। ওরা যদি এপারে নামে তো সব্বোনাশ। ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে পিছনে সরতে শুরু করলাম। তিন-চার পা যেতে যেতে না যেতেই কান্ডটা হল, তীব্র ট র আলো সে পড়ল আমার ওপর। আর সেই সঙ্গে রক্তহিম করা গলায় বিশুদ্ধ বাংলায় শুনলাম, "এক পা নড়েছিস কী খুলি উড়ে যাবে।"

আমি যেন আর আমাতে নেই। মাথা ঘুরছে বনবন করে।

"উঠে দাঁড়া ছোকরা।"

(চলবে)

ছবি ঃ সুদীপ্ত দত্ত

ছোটো বড়ো সকলের মনের মতো বই—

লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র

হলদে পাখির পালক, পদিপিসির বর্মিবাক্স...

প্রতিটি বইয়ের মূল ছবিসহ

প্রচ্ছদ: রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড প্রতি খণ্ডের দাম: চার-শো টাকা

৫ম খণ্ড থেকে বড়োদের গল্প উপন্যাস ও অগ্রন্থিত রচনাগুলিও পর্যায়ক্রমে পাইবেন।

প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত বিস্তারিত গ্রন্থপরিচিতিসহ গল্পসমগ্র রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পের একত্রে সংকলন

গল্পগুচ্ছ, লিপিকা, সে, তিন সঙ্গী, গল্পসল্প, এতাবৎ অগ্রন্থিত চারটি গল্প, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ও অন্যান্য দুর্লভ ছবি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়্যাল সাইজ, জ্যাকেট, কাপড় বাঁধাই, ১০৪০ পৃষ্ঠার বই দাম: চার-শো টাকা

যামিনীকান্ত সোম-এর কবিদাদুর গল্প দাম: চল্লিশ টাকা

বিমল ঘোষ (মৌমাছি) রবি-ছবি দাম: এক-শো টাকা ও শিশু রবি (নাটক) দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা

মৌমাছি রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড দাম: চার-শো টাকা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়া সমগ্র ১

নারায়ণ দেবনাথের কমিকস্‌সমগ্র (সিডি সহ ৫০০)

ও

বেস্ট অফ বাহাদুর বেড়াল ৬০ টাকা

২০০৮ বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বই ৫০টির অধিক ছোটো বড়ো গল্প নিয়ে

নবনীতা দেব সেনের ছোটোদের গল্প সমগ্র ১ম, ২য় প্রতিটি: এক-শো পঞ্চাশ টাকা

স্টল ৫৪৯

লালমাটি ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩ দূরভাষ-৯৮৩১০২৩৩২২ Stall 549

মিগুছোগলের পুঁথি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

'আইস-এক্স'টা একটা বরফের চাঙড়ে গেঁথে হতাশ ভাবে শেরপা নামচি বলল, 'আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অন্ধকার নামবে, তুষার ঝড়ও শুরু হবে। মাথা গোঁজার কোন জায়গা নেই। কাল দিনের আলো যখন ফুটবে তখন অন্তত পনেরো ফুট নিচে চাপা পড়ে থাকবে আমাদের দেহ। আর কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।'

নামচির কথা শুনে আমি আর হান্স একবার চারপাশে তাকালাম। যেদিকে চোখ যাচ্ছে, সেদিকেই শুধু বরফ আর বরফ! নেপাল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখররাজি রাত্রি নামার প্রতীক্ষায়। কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বারোহাজার ফুট উচ্চতায়। তিন হাজার ফুট নিচে ফেলে এসেছি বেসক্যাম্প। গ্লেসিয়ার বেয়ে এখন নিচে নামার চেষ্টা করা মানে সরাসরি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো। আবার সামনে কোন দিকে এগোব তা এখন জানা নেই। পথ হারিয়েছি আমরা। সামনে রাত্রি আসছে। অতএব.....।

হান্স রুমেনিয়ার মানুষ। বেশ শক্তপোক্ত ধাঁচের লোক। ইওরোপের বেশ কয়েকটা পিক এক্সপিডিশনে গেছে। পাহাড় বা বরফ ওর কাছে নতুন নয়, কিন্তু তার চোখেও কেমন একটা হতাশার ভাব লক্ষ করলাম। আমার মনে পড়ল রিম্‌চেন মনাস্ট্রির অধ্যক্ষ চেন-পো-র সাবধানবাণী, 'আপনারা মিগুছোগল গুম্ফায় যাবেন না। সে পথ বড় দুর্গম। তুষার ঝড়ে বহু মানুষ হারিয়ে গেছে ও পথে। তাছাড়া ঐ গুম্ফায় নানা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। ওখানে আপনাদের না যাওয়াই ভালো।' মৃদু তুষারপাত শুরু হল। তার সাথে কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা। কোথায় যাব আমরা? এই দুর্গম বরফাবৃত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম বৃদ্ধ লামা চেন-পো-র কথা শুনলেই ভালো হত। আটঘন্টা ধরে এই বরফ রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মিগুছোগল মনাস্ট্রির চিহ্ন কোথাও নেই!

চেন- পো আমাদের সাবধান বাণী শোনালেও তিনি কিন্তু মিগুছোগল মনাস্ট্রির সন্ধানে আমাদের অভিযানের নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আমি বৌদ্ধ শাস্ত্র গবেষক সুকুমার রক্ষিত, আর হান্স, ভেষজ বিজ্ঞানী স্বস্ব প্রয়োজনে কিছুদিন আগে নেপালের রিম্‌চেন মনাস্ট্রিতে এসেছিলাম মনাস্ট্রির লাইব্রেরীতে কাজ করার জন্য। বেশ কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আছে সেখানে। বলা বাহুল্য সেখানে মঠাধ্যক্ষ চেন- পোর আতিথ্যেই আমরা ছিলাম। একই জায়গাতে থাকা ও লাইব্রেরীতে কাজ করার সূত্রে হান্সের সঙ্গেও আমার পরিচয় সেখানেই। যাইহোক, কাজের জন্য প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমরা বেশ কয়েকটা পুঁথিতে 'ব্রহ্ম পুঁথি' নামে পালি ভাষায় লিখিত এক পুঁথির উল্লেখ দেখি। যে পুঁথিতে নাকি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সহ, বহুবিধ মারণ রোগের ভেষজ প্রতিষেধকের খোঁজ দেওয়া আছে। কৌতূহল নিরসনের জন্য আমরা এ ব্যাপারে চেন- পোকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানান, 'হ্যাঁ, এ পুঁথি সত্যিই আছে নেপাল হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত এক মঠে। মঠাধ্যক্ষের নাম মিগু ছোগল। তাঁর নাম অনুসারে ঐ মঠের নাম। মিগুছোগল অন্ধ মানুষ। অতিবৃদ্ধ। তার বয়স নাকি তিনশ বছর! তিব্বতের প্রাচীন ছোগল রাজবংশে তাঁর জন্ম। 'ব্রহ্মপুঁথিও' ঐ রাজবংশের সম্পত্তি। আরও দুজন অন্ধ বৃদ্ধ লামাকে নিয়ে তিনি ঐ মঠ সেই পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আর ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা করেন। প্রকৃতি মানুষ জীব জগত সম্পর্কে বহু গূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ঐ পুঁথিতে।"

লামা-চেন-পোর এ কথা শোনার পরই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলাম আমি আর হান্স। ও পুঁথি আমাদের দেখতেই হবে! এরপর আমরা চেন- পোর কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিয়ে, তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে রওনা দিয়েছিলাম মিগুছোগলের মঠের সন্ধানে। সঙ্গে নিয়েছিলাম গাইড নামচিকে। ও অনেকদিন আগে একবার এ পথে এসেছিল। দূর থেকে দেখেছিল মঠটা।

তুষারপাত ক্রমশ বাড়ছে। অসহায় আমরা। আমি হতাশ ভাবে বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাহলে, এখানে এভাবে মৃত্যুই কি আমাদের ভবিতব্য?' ঠিক সেই সময় হান্স হঠাৎ বলল, 'আরে ঐ দেখুন কি একটা প্রাণী!'

হান্সের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি আর নামচি তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের বেশ কিছুটা দূরে বরফের সাথে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে সাদারঙের এক চতুষ্পদ জন্তু। তুষার ঝড়ের জন্য তাকে ঠিকমতো চেনা না গেলেও মনে হচ্ছে সেটা কুকুরজাতীয় কোন প্রাণী হবে। দূর থেকে সে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নামচি আমাদের বলল, 'প্রাণীটাকে অনুসরণ করতে হবে আমাদের। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোন গর্ত্তে বা পাহাড়ের ফাটলে ওর আস্তানা। ওর পিছু পিছু গিয়ে সেরকম কোন আস্তানাতে মাথা গুজে তুষারপাতের হাত থেকে রাতে যদি নিজেদের বাঁচাতে পারি তবে শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো বেঁচে যাব।' এই বলে সে

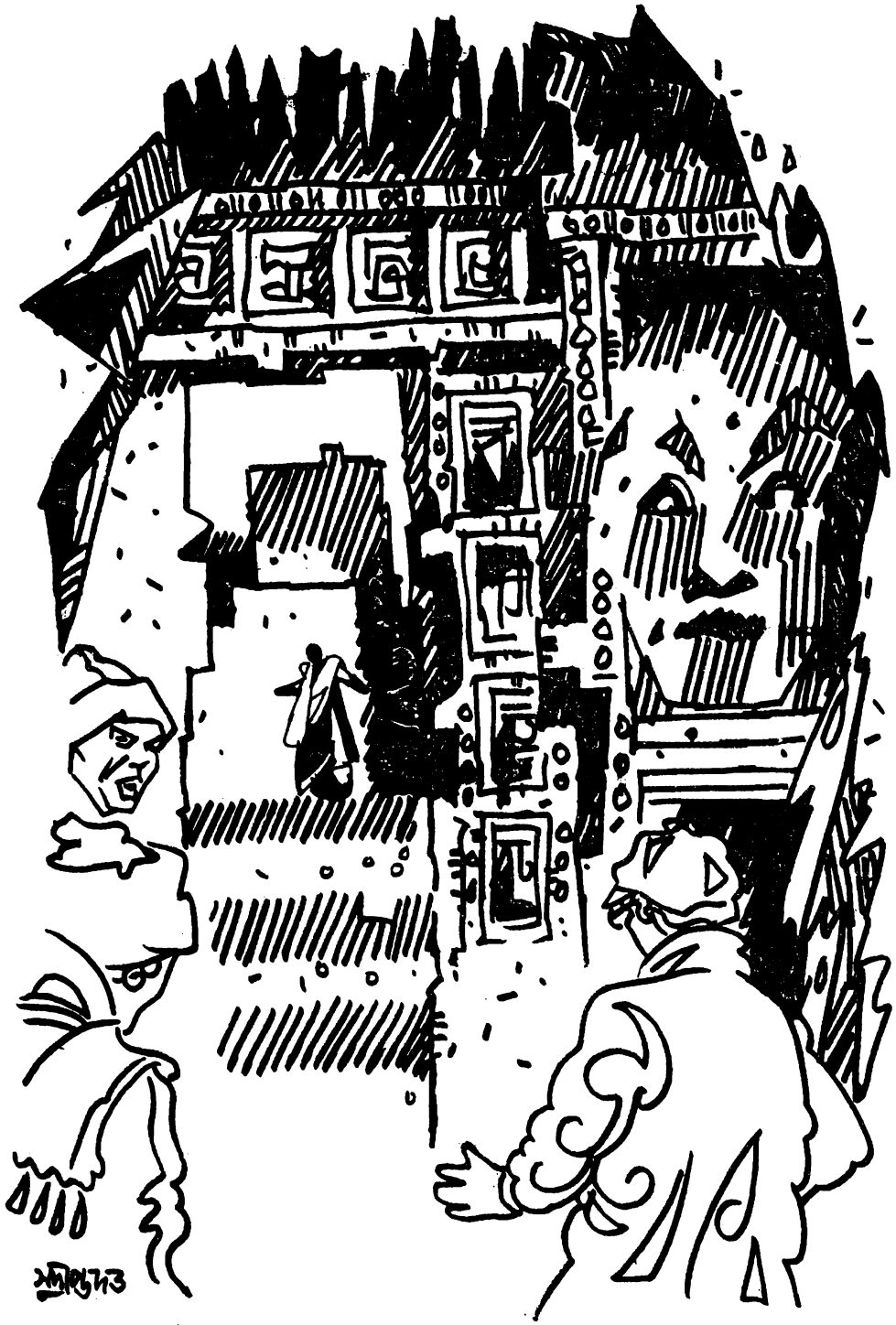

আইস অ্যাক্সটা তুলে নিয়ে যেদিকে প্রাণীটা সেদিকে এগোল। প্রাণীটাও চলতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। আমরাও এগোলাম।

প্রাণীটা ধীর গতিতে চলছে। মাঝে মাঝে থামছে। পিছনে তাকাচ্ছে। আবার চলছে। তুষার পাতের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে আমরাও তাকে অনুসরণ করছি। কোনদিকে চলছি আমদের কোন ধারণা নেই। বরফের ঢাল বেয়ে এক সময় ওপরে উঠতে শুরু করল প্রাণীটা। আমরাও তাই করলাম, বেশ উঁচু ঢাল। পা ফসকালেই কয়েক হাজার ফুট নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। অতি সাবধানে আমরা উঠতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওপরে ওঠার পর আমরা যখন ঢালের মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছি, ঠিক তখনই কোথায় যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাণীটা। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। হান্স প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'যাঃ, এবার কি হবে?' নামচি বলল, 'পিছনে ফিরেতো লাভ নেই। ঢালের মাথায় ওঠা যাক। তারপর কপালে যা আছে হবে।' তার কথা শুনে অবসন্ন

শরীরগুলো নিয়ে কোনরকমে ওপর দিকে এগোতে থাকলাম আমরা।

যা হোক কোনরকমে এক সময় ওপরে আমরা উঠে এলাম। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তুষারপাত হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরই সামনে তাকিয়ে আমরা যা দেখলাম তাতে আনন্দে কিছুক্ষণের জন্য কথা হারিয়ে ফেললাম আমরা। তিনদিকে পাহাড়ের ঢালের মধ্যে বরফাবৃত চত্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নপ্রায় এক প্রাচীন মনাস্ট্রি। তার ঢালু ছাদ বরফে ঢেকে গেছে। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। সম্ভবত এটাই সেই মিগুছোগল গুম্ফা! যার খোঁজে মৃত্যুমুখে পতিত হতে চলেছিলাম আমরা! সেই প্রাণীটাকেও আবার দেখতে পেলাম। মঠের তোরনের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, তারপর ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত মঠের পোষা কুকুর হবে। ওই তাহলে আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে এনেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরার পর এগোলাম মনাস্ট্রির দিকে।

মনাস্ট্রির সামনে ছোট্ট চত্বরটায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা চোর্তেন বা ধর্মীয় স্তম্ভ। সেগুলোও চত্বরের মতই বরফে মোড়া। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনস্ট্রিটা যত প্রাচীন মনে হয়েছিল আসলে তা তার চেয়ে প্রাচীন। স্থানে স্থানে পাথর-কাঠ খসে পড়েছে। বিবর্ণ হয়ে গেছে মন্দির গাত্রের অলঙ্করন। মনাস্ট্রি প্রবেশদ্বারের দু-পাশে পাথুরে খিলানে খোদিত আছে নৃ-মুন্ডমালা শোভিত বিকট দর্শন মূর্ত্তি। তাদের দেহের নানা স্থানও খসে পড়েছে। তবে তার জন্য সম্ভবত ঐ বিকট মূর্তি দুটোর বীভৎসতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গুম্ফার মাথায় বাতাসে উড়ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া শতচ্ছিন্ন এক ধর্মীয় পতাকা বা লুংদার।

আমরা চত্বর পেরিয়ে মনাস্ট্রির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মুন্ডিত মস্তক, ন্যুব্জ, অতিবৃদ্ধ মানুষ। পরনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতো লাল চাদর আর মারং। অসংখ্য বলিরেখা আঁকা তার মুখে। আর তার পিছন পিছন বেরিয়ে এলেন আরও দুজন, তাঁরাও মুন্ডিত মস্তক, বয়ঃবৃদ্ধ। তবে তাদের পরনে সাদা পোশাক। তাঁদের দৃষ্টি দেখে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে তাঁরা তিনজনই অন্ধ।

আমাদের উপস্থিতি অনুভব করলেন তাঁরা। মুহূর্ত্তখানেক চুপ করে থাকার পর প্রথমে আগত লামা আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই প্রাচীন গুম্ফায় মিগুছোগল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে।' তিব্বতী ভাষায় তিনি কথা বললেও, পেশা গত কারণে ভাষাটা আমাদের জানা। তাই তাঁর কথা বুঝতে পারলাম আমরা। বুঝতে পারলাম তিনিই লামা মিগুছোগল।

এরপর আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে যখন আমাদের আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি তখন তিনি আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আমি জানি আপনারা এসেছেন ব্রহ্মপুঁথির জন্য। হ্যাঁ ও পুঁথি এ মঠেই রক্ষিত আছে। আপনারা দেখতে পাবেন সে পুঁথি। ভিতরে আসুন।' শুনেছি অনেক তিব্বতীলামা নাকি দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন হন। মিগুছোগল হয়তো সেই ক্ষমতার অধিকারী।

মিগুছোগল আমাদের নিয়ে মঠের ভিতর প্রবেশ করলেন। অতি প্রাচীন মঠ। বহুবিধ প্রাচীন শিল্পবস্তু ছড়িয়ে আছে ভিতরে। প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি, বিভিন্ন চিত্রকলা, সোনা রূপোর কাজকরা সিল্কের থাংকা, জপযন্ত্র আরও কত কিছু! একটা ঘরে এনে তোলা হল আমাদের। মিগুছোগল বলল, 'এই আপনাদের রাত্রিবাসের জায়গা।' খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিন। তারপর সে পুঁথি দেখতে পাবেন আপনারা। এই বলে মিগুছোগল অন্তর্হিত হলেন। ঘরে রয়েছে কাঠের তৈরি কিছু আসবাব। আর রয়েছে একটা চর্বির তেলের প্রদীপ। সে আলো ছড়াচ্ছে ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে মিগুছোগলের সঙ্গী সাদা পোশাক পরা লামা দুজন ঘরে খাবার দিয়ে গেল। খাবার দেবার সময় লক্ষ করলাম, লামা দুজনের হাতে বিরাট বিরাট বাঁকানো নখ। সম্ভবত বহু যুগ নখ কাটেননি তাঁরা। মাখনের মন্ড দেওয়া দইয়ের মতো খাবার বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। দেহে বল এল, খাওয়ার পর জানলায় দাঁড়িয়ে নামচি আমাদের বলল, 'সাহেব কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন, চারপাশের পাহাড়ে তুষার ঝড় হচ্ছে, কিন্তু মঠের চত্বরে কোন ঝড় নেই!'

জানলার কাছে গিয়ে আমরাও দেখলাম ব্যাপারটা। সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যাপার! যেন কোন যাদুমন্ত্রে ঝড় প্রবেশ করতে পারছে না মঠ চত্বরে। কেউ যেন মঠের চারপাশে অদৃশ্য দেওয়াল তুলে ঝড়ের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে! এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে ঝুপ করে অন্ধকার নামল। তার সাথে সাথে কাঁচের শার্শির ফাঁক গলে ঘরে প্রবেশ করতে লাগল সুতীক্ষ্ণ ঠান্ডা বাতাস। তার থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলাম। তারপর প্রদীপের আলোতে লামা মিগুছোগলের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর মিগুছোগল ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে স্বযত্নে ধরা রেশম কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস। সেটা যে একটা পুঁথি তা তার আকার দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ব্রহ্ম পুঁথি! লামার হাতে ওটা দেখেই রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। ওর টানেই তো মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করে এত দূরে ছুটে এসেছি।

লামা পুঁথিটা যত্ন করে টেবিলে নামিয়ে রেখে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনাদের দেখার জন্য পুঁথিটা রেখে যাচ্ছি। এ বড় অমূল্য সম্পদ। তবে আপনারা এখানে আসতে দেরি করে ফেলেছেন। মাত্র একদিন আপনারা এ পুঁথি দেখার সুযোগ পাবেন। বহু যুগ আমরা এ মঠে কাটিয়েছি। মাত্র

কালকের দিনটা, তারপরই আমরা এ মঠ চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করে চলে যাব হিমালয়ের আরও গভীরে। আরও কঠিনতম তপস্যার জন্য। যে স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য।'

তাঁর কথা শুনে আমি জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, এ পুঁথিতে সত্যিই এমন কিছু কি লেখা আছে সাধারণ মানুষের অজানা?'

মিগুছোগল বললেন, 'হ্যাঁ। এ পুঁথির প্রথম অংশে বিবৃত আছে ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলার তত্ত্ব। তবে তা বোঝার জন্য বিশেষ জ্ঞান ও অনুশীলনের প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় অংশে আছে বিভিন্ন ওষধির কথা। দ্বিতীয় অংশটা হয়তো আপনাদের কাজে লাগতে পারে।' হান্স শুনে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা বলি, 'এ পুঁথি আপনারা সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন কেন? আপনাদের কথা যদি ঠিক হয় তবে এ পুঁথি থেকে তো মানুষের প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা আছে।'

হান্সের বক্তব্য শুনে বৃদ্ধ লামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথা হয়তো সত্যি, কিন্তু প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলার যে অসীম ক্ষমতা এ পুঁথির আছে, তা ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা যায়। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে এ পুঁথি স্বযত্নে রক্ষা করেছি আমরা। বলা যেতে পারে, আপনারাই বাইরের পৃথিবীর প্রথম মানুষ যারা এই পুঁথি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এত কষ্ট করে আপনারা এসেছেন তাই আর আপনাদের ফেরালাম না। এরপর কোন মানুষ আর এ পুঁথির হদিস পাবে না।' আর কোন কথা বললেন না লামা, পুঁথি রেখে ঘর ছেড়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিগুছোগল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই সাগ্রহে আলোতে পুঁথি নিয়ে টেবিলে বসে পড়লাম আমরা। রেশমের আবরণ উন্মোচন করতেই বেরিয়ে পড়ল তুলোট কাগজে লেখা সেই পুঁথি। থরে থরে সাজানো বেশ কয়েক হাজার পৃষ্ঠা। একটা অদ্ভুত প্রাচীন গন্ধ ছড়াচ্ছে তার থেকে। অতি যত্নে পৃষ্ঠাগুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম। সময় এগিয়ে চলতে লাগল। কালো কালির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হরফ। ভাষাটা আমরা পাঠ করতে পারছি ঠিকই, তবে কিছুতেই তার মর্ম উদ্ধার করতে পারছি না। ঘন্টা পাঁচেকের ব্যর্থ চেষ্টার পর পুঁথির প্রথম অংশের কিছুই বুঝতে না পেরে একসময় অধৈর্য্য হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম জানলার কাছে। প্রদীপের চর্বি পুড়ে একটা ধোঁয়া আর কটু গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে ঘরের মধ্যে। জানলাটা খুললে যদি বাইরের বাতাসে ঘরের বদ্ধ বাতাসটা কেটে গিয়ে মনটা একটু চনমনে হয় সে জন্য। জানলা খুললাম আমি। হান্স আর নামচিও সম্ভবত এক ঝলক তাজা বাতাস নেবার জন্য আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জানলা খুলতেই প্রথমে আমাদের চোখে পড়ল জ্যোৎস্না আলোকিত বরফাবৃত পাহাড়শ্রেণীর অপূর্ব দৃশ্য। মেঘমুক্ত আকাশে রূপালী চাঁদের আলোতে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আর এরপরই আমরা দেখতে পেলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদের জানলার কিছু দূরে মঠের সামনের চত্বরে বরফ ঢাকা একটা স্তম্ভের নিচে বসে আছেন মিগুছোগল। সম্ভবত তিনি ধ্যানস্থ। আর তার দু-পাশে পাথরের মূর্ত্তির মতো বরফের ওপর বসে আছে বিরাট শ্বেতকায় দুটো কুকুর! চাঁদের আলোতে ধবধব করছে তাদের শরীর। যেন জ্যোৎস্না চুইয়ে পড়ছে তাদের দেহ থেকে। বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাদের দেখার পর হান্স বলল, 'কুকুর দুটোকে দেখেছো, কি বিশাল আর সুন্দর দেখতে!'

আমি তার কথায় সহমত প্রকাশ করার আগেই নামচি বলল, 'সাহেব ওগুলো কিন্তু কুকুর নয়, ওগুলো তুষার নেকড়ে! খুব হিংস্র প্রাণী। আমি ভুল বলছি না। ও প্রাণী আমি আগে দেখেছি।' তার কথা শুনে চম্‌কে উঠলাম আমরা। তার মানে কি মিগুছোগল এমন কোন জ্ঞানের অধিকারী যার দ্বারা হিংস্র প্রাণীকে বশ মানানো যায়? আর এ জ্ঞানের আধার কি এই ব্রহ্ম পুঁথি? ব্যাপারটা চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ এরপর আমরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ঘরে আবার ঠান্ডা বাতাস ঢুকতে শুরু করেছে। জানলা বন্ধ করে আমরা আবার ফিরে এসে বসলাম আগের জায়গাতে।

এবার আমরা দেখতে শুরু করলাম পুঁথির দ্বিতীয় অংশ। দেখলাম এ অংশ আমরা বেশ বুঝতে পারছি। বিভিন্ন ভেষজ ওষধীর কথা বিবৃত এ অংশে। কোন রোগে কি গাছ-গাছড়া প্রয়োজন ও তাদের উৎস সন্ধানও বিবৃত আছে পাতার পর পাতায়। বেশ কিছু মারন রোগের প্রতিষেধক, বিজ্ঞান যা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি তার খোঁজও দেওয়া আছে পুঁথিতে। কৌতূহলের সাথে আমরা এক একটা পাতা উল্টাতে লাগলাম আর বিস্মিত হতে থাকলাম। সারা রাত যে কিভাবে কেটে গেল আমাদের তা বুঝতেই পারলাম না। এক সময় দেখি হাতঘড়িতে ভোর পাঁচটা বাজে। অথচ পুঁথির সিকি ভাগ পাতাও পাঠ করতে পারিনি আমরা। আমি তাই হান্সকে বললাম, 'এ পুঁথির বেশীর ভাগটাই অপাঠ্য থেকে যাবে আমাদের কাছে। হাতেতো মাত্র একটা দিন। নোটটোট নেওয়া কিছুই করা যাবে না।'

হান্স পুঁথির থেকে চোখ সরিয়ে কি যেন ভাবছিল, 'আমার কথা শুনে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'সব করা যাবে। কিছুতেই এ পুঁথি আর হাতছাড়া করব না আমি।'

আমি বললাম, 'মানে?'

সে এবার একটু ইতস্তত করে আমাকে চম্‌কে দিয়ে বলল, 'আমি ঠিক করেছি, এ পুঁথি নিয়ে আমরা চলে যাব।

মাত্র তিনজন লোক। তাও আবার অন্ধ বৃদ্ধ। আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। বাইরে আলো ফুটলেই এ কাজ করার চেষ্টা করব।'

আমি উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তার মানে আমরা লামাদের অসহায়তার, সরলতার সুযোগ নিয়ে চুরি করব? না, এ হতে পারে না। এ পুঁথি মঠের সম্পত্তি। এটা নিয়ে ওরা যা করে করুক।' নামচিও আমার কথা সমর্থন করে বলল, 'সাহেব ঠিকই বলেছেন। তাছাড়া এ কাজে পাপ হবে।' হান্স বলল, 'না, এ পুঁথি নিয়ে যা খুশি করতে দেওয়া যায় না। হয়তো ওরা এ অমূল্য পুঁথিকে ধ্বংস করে ফেলবে। বহু অমূল্য গাছগাছড়ার সন্ধান আছে এতে যা চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। আর এ পুঁথির মূল্য কত হতে পারে ধারণা আছে? বিলিয়ন ডলার! ঐ টাকা পেলে আমরা আরও ভাল গবেষণা করতে পারব। নামচিকেও আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।'

তার এই কথা শোনার পর নামচিরও মুহূর্তের মধ্যে যেন মত পরিবর্তন ঘটে গেল। সে বলল, 'তেমন হলে আমি রাজি আছি।'

আমি তবুও প্রতিবাদ করে বললাম, 'না আমি তবুও রাজি নই। আমি সঙ্গে পুঁথি নিয়ে যেতে দেব না, আমরা চোরের দল নই।'

হান্সও এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আপনি এই বরফের রাজ্যে পচে মরুন। অথবা ঐ লামাদের সাথে হিমালয়ে পাড়ি দিন। আপনি তো দেখছি চোখ থাকতেও লামাদের মতই অন্ধ! এ পুঁথি আমি নিয়ে যাবই।' বেশ রূঢ় শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

তার কথা শুনে আমি যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই টেবিলটা কিসের ধাক্কায় যেন নড়ে উঠল। তারপর আমাদের চমকে দিয়ে টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল বিরাট বড় একটা প্রাণী। মিগুছোগলের সঙ্গে যাদের দেখেছিলাম, ঠিক সেরকম একটা তুষার নেকড়ে।

টেবিলের পাশ থেকে ছিটকে সরে এসে আতঙ্কে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রাণীটা আমাদের আক্রমণ করল না। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। প্রাণীটা চলে যাবার পর হান্স প্রথমে বলল, 'প্রানীটা হঠাৎ দেখা দিয়ে বেশ চমকে দিল। সম্ভবত যখন আমরা পুঁথিতে মগ্ন ছিলাম, তখন খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে ও টেবিলের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা খেয়াল করিনি। বাইরে দিনের আলো ফুটবে বলে চলে গেল।' এ কথা বলার পর সে আমার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি কি করবেন সিদ্ধান্ত নিন। আমি নামচিকে নিয়ে বাইরেটা একবার দেখে আসি।' কথাগুলো বলে নামচিকে নিয়ে ঘর থেকে হান্স বেরিয়ে গেল। আমি খোলা পুঁথির সামনে বসে ভাবতে লাগলাম, 'কি করব?' ওদের সঙ্গে পুঁথি নিয়ে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। আবার ওরা চলে গেলে এই বরফের রাজ্য থেকে আমি ফিরব কি ভাবে?'

আধ ঘন্টা পর তারা আবার ঘরে ফিরে এল। উৎফুল্ল হান্স বলল, 'বাইরে আলো ফুটেছে। তুষারপাতও আর হচ্ছে না। আমাদের বেসক্যাম্পে নামার অন্য একটা পথও দেখতে পেয়েছি। আমরা দ্রুত নেমে যাব। রাত্রী জাগরণের পর মিগুছোগল আর তার সঙ্গীরা মনে হয় ঘুমোচ্ছেন, কোথাও তাদের সাড়া পেলাম না। নেকড়ে দুটোও মনে হয় চলে গেছে। এই সুযোগ...।' এ কথা বলে হান্স পুঁথিটাকে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে এগোল দরজার দিকে। তার সাথে সাথে নামচি।

আমি তাদের শেষ বারের জন্য নিরস্ত্র করার চেষ্টায় বলে উঠলাম, 'ভেবে দেখুন, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে। আমার কথার জবাবে ঘর ছেড়ে বেরতে বেরতে হান্স বলল, 'আপনার ইচ্ছা হলে আমাদের সঙ্গে আসুন নইলে ঘরেই থাকুন। আর ফিরতে পারবেন না আপনি।'

হান্সের শেষ কথাটা শোনার সাথে সাথেই কেমন আতঙ্ক সৃষ্টি হল আমার মনে। অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের অনুসরণ করলাম আমি।

মনাস্ট্রি ছেড়ে আমরা পা রাখলাম বরফাবৃত চত্বরে। সূর্যোদয় হয়েছে। তুষার পাতও বন্ধ। ভোরের আলোতে ঝলমল করছে চত্বরকে ঘিরে রাখা তুষার আবৃত পাহাড় শ্রেণী। বেশ শান্ত পরিবেশ। চারপাশে কেউ নেই। আমার কিছুটা আগে পুঁথি নিয়ে হান্স আর নামচি, তাদের কয়েকপা পিছনে আমি। নিঃশব্দে আমরা চত্বরটা পার হচ্ছি। আমরা যখন চত্বরের ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছে গেছি ঠিক তখনই আমাদের কানে এল একটা গলা! 'আপনারা কি পুঁথিটা নিয়ে চলে যাচ্ছেন?'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পিছনে ফিরে দেখি মনাস্ট্রির দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন মিগুছোগল। তার দু-পাশে তার সঙ্গী দুইলামা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। প্রশ্নকর্ত্তাকে বেশ শান্তই মনে হল, তবে তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে।

হান্স, একটু ইতস্তত করে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

মিগুছোগল শুনে শান্ত ভাবেই বলল, 'আমরা অন্ধ, অশক্ত বৃদ্ধ। আপনারা পুঁথিটা নিয়ে যেতে চাইলে আপনাদের বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। তবে যাবার আগে একটা অনুরোধ আছে। অন্ধ হয়ে যাবার পর দীর্ঘ দিন ও পুঁথি পাঠে বঞ্চিত আমি। আমার সহকারীদেরও ক্ষমতা নেই। আপনি পুঁথির

প্রথমাংশের অর্থ নির্ণয় করতে না পারলেও পাঠে নিশ্চয়ই সক্ষম। আমার অনুরোধ, আপনারা চলে যাবার আগে যদি ও পুঁথির কিছু অংশ পাঠ করে আমাকে শোনান।'

মিগুছোগলের অনুরোধ শুনে চুপ করে কি সিদ্ধান্ত নেবে তা সম্ভবত ভাবতে লাগল হান্স। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিগুছোগল এরপর বললেন, 'এতে আপনার উপকার হবে। আমার সাহায্য ছাড়া ব্রহ্মপুঁথির গূঢ় তত্ত্বের অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন না আপনি। আপনাকে আমি অর্থ বুঝিয়ে দেব। নিন পুঁথিটা খুলুন। প্রথম অংশের অষ্টাদশ পৃষ্ঠা থেকে পাঠ শুরু করুন।' বেশ শান্ত সমাহিত স্বরে অতিবৃদ্ধ লামা কথাগুলো বললেও আমার মনে হল তার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন নির্দেশ আছে। কানের মধ্যে মিগুছোগলের কথাগুলো কেমন যেন অনুরণন সৃষ্টি করছে।

দেখলাম কয়েক মুহূর্ত মিগুছোগলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হান্স পুঁথিটা খুলে ফেলল, তারপর সম্ভবত অষ্টাদশ পৃষ্ঠা খুঁজে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করল। ঠিক সেই সময় আবার কোথা থেকে যেন মৃদু তুষার পাত শুরু হল। ধীরে ধীরে পাঠ করছে হান্স। মিগুছোগল এক সময় বলে উঠল, 'আরো জোরে, আরো জোরে পাঠ করুন। আপনার পাঠ আমি ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি না। দেখলাম তাঁর নির্দেশ মেনে উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুরু করল হান্স। তুষার পাত মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বেড়ে চলেছে, আর তার সাথে যেন বাতাসও বাড়ছে। আমাদের দেহের ওপর পেঁজা তুলোর মতো বরফ জমছে। আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে পুঁথি পাঠ করে চলেছে হান্স। আর আলোও যেন চারপাশে কমতে শুরু করেছে হঠাৎ। আমার কেন যেন এবার ভয় ভয় লাগলো। আমার এরপর হঠাৎ চোখ পড়ল মনাষ্ট্রির চারপাশে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর দিকে। পাহাড়গুলো যেন কাঁপছে। একটা গুড়গুড় শব্দ আর প্রচন্ড বাতাস এগিয়ে আসছে সেদিক থেকে। আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। হঠাৎ আমার মনে হল, হান্সের পুঁথি পাঠ সত্যি সত্যিই প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলছে। ব্রহ্মপুঁথির গূঢ় অর্থ কি শব্দ ব্রহ্ম? তাই কি মিগুছোগল উচ্চস্বরে পুঁথি পাঠ করতে বললেন? হান্সের কোন কিছুই খেয়াল নেই। সে যেন সম্মোহিতর মতো আরও উঁচু থেকে উঁচু গলায় পাঠ করে চলেছে। তার কাছে নামচি সেও যেন বাহ্যজ্ঞানহীন পাথরের মূর্ত্তি! না হান্সকে থামাতেই হবে! আমি চিৎকার করে থামাতে গেলাম কিন্তু বাতাসের ঝাপটা আমার গলার শব্দ মুছে দিল। একটা প্রচন্ড ঝড় হঠাৎ এরপর হান্সের হাত থেকে পুঁথিটাকে ছিটকে দিল। রাশি রাশি পুঁথির পাতা উড়তে লাগল প্রবল বাতাসে। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে হান্স। আর এপরই ঝড়ের মধ্যে অট্টহাসির শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করছেন লামা মিগুছোগল। আর তার দু-পাশে সেই লামাদের জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট দুটো তুষার নেকড়ে!! লাল জিভ আর হিংস্র সাদা দাঁত বার করে তারাও যেন হাসছে। আশে পাশের স্তম্ভগুলোর বরফ খসে পড়ে পড়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে বীভৎস সব মূর্ত্তি! কান ফাটানো ঝড়ের শব্দ! দেখলাম আসেপাশের পাহাড় থেকে লক্ষ লক্ষ টন বরফের চাঁই নিচে মনাস্ট্রি চত্বরের দিকে ঝড়ের গতিতে নেমে আসছে আমাদের পিষে ফেলার জন্য! আর তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে লামা মিগুছোগলের রক্ত জল করা হাসি। ঝড়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম আমি। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার নেমে এল চোখে। জ্ঞান হারাবার আগে শুধু শুনতে পেলাম মিগুছোগলের হাসির অনুরণন।

একদিন পর আমাদের বেস ক্যাম্পের কাছে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে ক্যাম্পের লোকেরা। তুষার ঝড়ে ওপর থেকে এত নিচে গড়িয়ে পড়ে কিভাবে বাঁচলাম তা জানি না। একদিন পর একটা বড় দল আবার ওপরে উঠল হান্সের খোঁজে। কিন্তু তখন সেখানে হান্স, নামচি বা মিগুছোগল গুম্ফার কোন চিহ্নই নেই।

ছবি ঃ সুদীপ্ত দত্ত

বইমেলায় রবীন্দ্রনাথ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ডঃ সিদ্ধার্থ দত্ত

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় – এর জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তাঁর পড়াশোনা শুরু গ্রামেরই এক স্কুলে। প্রথমিক পাঠ শেষ করে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। পড়াশোনা শুরু করেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরবর্তী সময়ে মেট্রোপলিটন কলেজে। যদিও সাহিত্য তার প্রথম পছন্দের বিষয় ছিল, কিন্তু আলেকজান্ডার পেডলার এর বক্তৃতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শোনার পর রসায়নশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন।

১৮৮১ সালে তিনি এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২সালে 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওখান থেকেই তিনি বি এস সি ডিগ্রি লাভ করেন ১৮৮৫সালে। ১৮৮৭সালে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি ডি এস সি উপাধি লাভ করেন এবং তৎসহ হোপ পুরস্কার এবং আরও দুটি স্কলারশিপ লাভ করেন।

১৮৮৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন এবং প্রথম এক বছর বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে পরীক্ষাগারে কাজকর্ম করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন। Mercurous nitrite এবং তার derivatives - এর উপর তাঁর লেখা গবেষণাপত্র তাঁকে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে পৌছে দেয়, শিক্ষক হিসেবেও তিনি বহু কৃতি ছাত্রছাত্রীকে তৈরী করেন এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলেন Indian School of chemistry, তাঁর বহু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম – বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এবং শান্তিস্বরূপ ভাটনগর।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের উন্নয়ন শিল্পায়নের পথ ধরেই অগ্রসর হতে পারে। তিনিই প্রথম রসায়ন শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন ভারতবর্ষে, নিজের বাড়িতে অল্প কিছু সম্বল নিয়ে। তারই ফলস্বরূপ দেশে গড়ে ওঠে সেই Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd.। সে সময় বিদেশী জিনিষ সর্বত্র জাল বিস্তার করেছিল ভারতবর্ষে। প্রায় সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন ওষুধপত্র, কাপড়, কাঁচের বাসন এমনকি সামান্য সূঁচটি পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। স্বাবলম্বন, দেশপ্রীতি ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তাঁকে দেশি শিল্প ও বানিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগাল।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণ করে বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর মধ্যেই বিজ্ঞানী এবং শিল্পোদ্যোগির উভয় ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁকেই আমাদের দেশে father of the Indian Pharmaceutical Industry হিসেবে লোকে মান্য করে।

ভারতবর্ষ যখন পরাধীন এবং যখন বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং বিজ্ঞান গবেষনা পরিকাঠামোর অভাবে প্রায় অসম্ভব সে সময়ই তার গবেষনা তাকে বিশ্বের দরবারে পৌছে দেয়, যখন একটা ধারনা পোষন করা হত যে ভারতবাসীরা সব ব্যাপারেই পিছিয়ে এবং তাদের পশ্চিমী দেশ- এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত তখন তিনি তার বিখ্যাত বই "The History of Hindu Chemistry " লেখেন যা তখন বহু ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করে। এ ছাড়া তিনি কখনই নিজেকে পরীক্ষাগারে আবদ্ধ করে রাখেননি, মানুষের সুখে দুঃখে তাদের সাথী হয়েছেন,বিশেষ করে বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক

দূর্যোগের সময় ত্রাণ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সরল, আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা এবং কর্মজীবনে উদার মনের যে পরিচয় আমাদের সামনে রেখেছেন, তা আজকের প্রজন্মের শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করবেই। বর্তমান কালের শিক্ষাব্যবস্থায় যখন শিক্ষার বানিজ্যিকিকরণ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক আলোচনা শোনা যায়, পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠে আসে শিক্ষক ও শিক্ষাজীবী শব্দদুটি কি একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী শব্দদুটি কি সমার্থক? এ সব নিয়ে আলোচনা করতে হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফলিত জ্ঞানের চর্চার প্রতি অক্লান্ত প্রয়াস, ছাত্রবৎসলতা, শিক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং সব্বোপরি শিক্ষক সমাজের মর্যাদা নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ -- এ সবই অনুধাবনযোগ্য। কৃষির উন্নয়নে , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অনীহা, দেশের অর্থনীতির পশ্চাদপদতা এবং শিল্পবিকাশের প্রতি বাধাবিপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ভাবনা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা শিক্ষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারনা পরিস্কার করে ব্যক্ত করেনঃ 'এইবার আমি শিক্ষা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের শিক্ষা বড়োই 'স্থাবর'। যদি ইহার কোন্যো গতি থাকে তবে তাহা বড়োই মন্থর। বিলাতের গতযুগের শিক্ষার একটা নকল এদেশে চালান হইয়াছিল; এই সত্তর- পচাত্তর বৎসরেও ইহার তেমন বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। ইহা বড়োই 'কেতাবি' এবং সাহিত্যঘেঁষা'(Literary)। মনস্বী হার্বার্ট স্পেনসার তাঁহার 'এডুকেশন' গ্রন্থে বহুকাল পূর্বে শিক্ষাকে বিজ্ঞানমূলক এবং কার্যাভিমুখী (Practical) করিবার জন্য বলিয়াছেন। ইহাতে "observation" এবং-- "experimental " বীক্ষনও সমীক্ষার স্থান বড়োই অল্প। আমাদের মন তাই তেমন সচল নয়, কার্যপটুত্ব, কার্যাভিমুখতা ভারতীয় মনের ধর্ম নহে, চিন্তাশীলতা, কর্মে অনাসক্তি তাহার বৈশিষ্ট --- বাইরের লোক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। আর আমরাও কার্যক্ষেত্রে হটিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখন আমাদিগকে "modern"-- আধুনিক অর্থাৎ বর্তমানকালে বাঁচিয়া থাকিবার, উন্নতিশীল হইবার শিক্ষা দিতে হইবে।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষকে কখনই মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজি বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করা সম্ভবপর হবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান পাকা হওয়ার পরে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা হলে তবেই তা সহজে এবং তাড়াতাড়ি হতে পারে। তাঁর মতে অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা--এটাই হচ্ছে অনর্থক, এতে করে যেমন সময় নষ্ট হয়, ভাষা শেখানোর উদ্যমও ব্যাহত হয়। শিশুদের শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষা দিলে আপাত সাফল্যলাভ করা যায়, কিন্তু এর ফলে মাতৃভাষার ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমগ্র দেশ এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান নিয়ে বহু জায়গায় বিভিন্ন ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। কলকাতা শিক্ষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন:'আমাদের মাতৃভাষাকে 'শিক্ষার বাহন' করিতেই হইবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন সময়েই এটি হওয়া উচিত ছিল, প্রচুর সময়,শক্তি,স্বাস্থ্য ও প্রতিভা অকারণ নষ্ট হইয়াছে। আর নয়, একদিনও নয়, এখনই মাতৃভাষা পঠন- পাঠন ও পরীক্ষার ভাষা করিতে হইবে। জগতের কোথাও এমন অদ্ভুত, মারাত্মক ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নাই। একটু কিছু শিখিতে হইলে বিদেশী ভাষার ব্যূহভেদ করিতে হইবে। বাঙালি শিক্ষক বাঙালি ছেলেকে শিক্ষাদান করেন পরের ভাষায়। গণিত, ইতিহাস ভূগোল এই পরভাষার বিভীষিকার দুরূহ হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানোর আনন্দ এবং সজীবতা চলিয়া যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিষ না হইয়া নিগ্রহের মূর্তি ধারন করে।'

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের চিন্তাভাবনা এতোটাই প্রসঙ্গিক যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিল্প যখন সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, চাকরির বাজার যখন সংকুচিত হচ্ছে, তখন আধুনিক শিল্প উপযোগী শ্রমশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার

প্রসার ঘটনার প্রয়োজনীতা সহজেই অনুমেয়। প্রফুল্লচন্দ্রের কথায়: 'পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে এই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা জয়লাভ করিতে চাই, আমরা বাঁচিবার উপকরণ প্রচুর অন্ন, প্রচুর শক্তি, প্রচুর আনন্দ চাই। আমাদের শিক্ষা এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে আমাদের ছেলেদের মনে practical bias -- কার্যাভিমুখতা জন্মে, তাহাদের মন সচল এবং কর্মপ্রমুখ হয়। শুধু দলে দলে উকিল, কেরানি,মাস্টার তৈয়ারি না করিয়া,আমরা কাজের লোক তৈয়ারি করিতে চাই, যাহারা কাজ ভালোবাসিবে, কলম-পেশা অপেক্ষা যন্ত্র ধরিয়া নিজের হাতে কাজ করা যাহাদের অধিকতর আগ্রহ ও আনন্দর বিষয় হইবে। এতাবৎকাল আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল 'মস্তিক'-কেই চালিত করিয়াছে। এইবার শিক্ষাব্যবস্থায় যাহাতে মানুষের বর্তমান যুগের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাসংকুল কার্যক্ষেত্রে টিকিয়া থাকা একটা গোটা জাতির পক্ষে অসম্ভব। ইহার প্রতিকারের আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।'

Vocational Education- ব্যবহরিক শিক্ষা সম্বন্ধ তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন: 'যথার্থই আমাদের মনের জড়তা এবং কমনিস্পৃহতা দূর করিতে হইলে, অন্নসমস্যা সমাধানের উপযোগিতা অর্জন করিতে হইলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ইহা বাধ্যতামূলক করিতেই হইবে।— মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা জীবিকার্জনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু ইহা তাহার প্রথম সোপান এবং ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীগণের মনে কর্মানুরাগ ও কর্মপ্রমুখতা জাগিবে।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা যে কতখানি প্রাসঙ্গিক সে প্রসঙ্গে তাঁর কিছু মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে, মধ্যবিত্ত বাঙালির আর্থিক ভবিষ্যৎ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে এবং সেই প্রসঙ্গেই তিনি মন্তব্য করেন:

আজ এই জীবনসন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগার থেকে বাইরে এসে উৎকট অন্ন সমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা আরম্ভ করে থাকি, তবে আপনারা জানবেন সে নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বাঙালির আজ পেটের দায়,— আজ সমস্ত দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে - সাবধান। বিপদ সন্নিকট। ছাত্র তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল। তাই এই সকল অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করেই বলছি।

— মধ্যবিত্ত বাঙালির সন্তান ডিগ্রি পেলেই জীবিকা -সংস্থান করতে পারবে, আর ডিগ্রির অভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখবে — এটা কত বড় ভুল আজ নিঃসমশয়ে তা বুঝে নিতে হবে — কলেজের দ্বারে এই যে শত শত ছাত্র আঘাত করছে মাথা খুড়ছে , এরা কি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অথবা ডিগ্রি প্রপ্রার্থী মাত্র— উদ্দেশ্য গলাধঃকরন, উদ্গীরন ও ডিগ্রি গ্রহণ। — যে শিক্ষায় শুধু মেরুদন্ডহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'করে খেতে' শেখায় না, দুর্বল অসহায় শিশুর মতো সংসার পথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার প্রয়োজন কী।'

(অন্ন সমস্যা --- প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৬)

জীবন সায়াহ্নে ১৯৪০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বক্তৃতায় তিনি আবার দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেন: 'ভারতবাসী এখনো ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প - বাণিজ্য - ব্যবসায়ে মন দাও— তবে যদি বাঁচতে পারো, নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই।'

জীবনযাত্রায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলির সমাধান করার ব্যাপারে 'শিক্ষিত মূর্খদের' (অর্থাৎ - বিশ্ববিদ্যালযের ডিগ্রিধারী অথচ ব্যাবহারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাহীন) কোন ভূমিকা নেই – এটাই ছিল আচার্যদেবের সমাজচিন্তার মূল কথা। সে জন্য তাঁর মত হ'ল যে, 'শিক্ষিত লোক যদি জীবনযাত্রাকালে কোথাও জীবনের পরিচয় না দিয়ে সর্ববিষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন,তবে সে পথ তাঁদের মরণ পর্যন্তই পৌঁছে দেবে। —তাই সমাজ, ধর্ম, নীতি — সকল বিষয়েই যে- সব অন্ধ সংস্কার বহুযুগ ধরে তোমাদের হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাঁদের উপড়ে ফেলে,প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ ছিল তার পরিচয় লাভ করতে হবে এবং সেই প্রাণের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচিত্র বিবিধ রসে ও অভিনব গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে হবে।'

('এখন ও তখন'। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৭)

আচার্যের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই কাছে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে বহু ভারতীয় পরবর্তীকালে নানা ক্ষেত্রে যশ অর্জন করেছে। শেষ জীবনে এই ছিল আচার্যের গর্বের কথা। তাঁর অন্তিম অভিভাষণ থেকে তার কিছুটা আভাষ আমরা পাই :

'আজ জীবনসন্ধ্যার উপকূলে এসে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছে হ'ল, সেই কোন সুদূরে ফেলে আসা শৈশবের সোনার দিনগুলির কথা, আজ আমার একান্ত নিভৃত নির্জন চিন্তার মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে আমাকে চকিত আহ্বানে জানিয়ে দিয়ে যায় -- ঐ দূর নীলিমায় অস্ফুট বারতা। আজ আমি জীবন- মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেছি, পৃথিবীর বন্ধন ও মমতা হাসি ও গান- - সব কিছু আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার সুদীর্ঘ

জীবনে এতটুকু বুঝেছি যে — আমি এই ধরণীকে ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি আমার দেশকে ও জাতিকে, ভালোবেসেছি আমার প্রিয় জন্মভূমিকে। তোমরা হয়তো জানোনা, কিসের মায়া আমাকে এই বঙ্গের নিম্নভুমির জল- জঙ্গলে টেনে এনেছে। ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে বসন্তের দিনমান কাটিয়েছি. তোমাদের সুখ-দুঃখের্ সহিত আমি সুদীর্ঘ দিন জড়িত আছি — তোমাদের ব্যথা ও বেদনা আমার বিগত কর্মবহুল জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অশান্তি এনেছে - তোমাদের উৎসব ও আনন্দ আমাকে আশান্বিত করেছে। জানি এই বন্ধন একদিন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সেদিন আর বেশী সুদূরে নয়।

(২৪শে এপ্রিল ১৯৪৩, জন্মভূমি রাড়ুলিতে প্রফুল্ল চন্দ্রের অন্তিম অভিভাষণ)

অবশেষে ১৯৪৪ সালের জুন মাসে আচার্যের তিরোভাব ঘটল। তাঁর এই বর্ণময় কর্মজীবনের ব্রত কতটা ফলপ্রসূ হল দেশের ভবিষ্যতের ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মদিবসে টাউন হলে অনুষ্ঠিত ১১ ডিসেম্বর ১৯৩২ সভার সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষনের কিছুটা অংশ উল্লেখ করে শেষ করছি :

'আমরা দু'জনে সহযাত্রী'

কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌছেছি. কর্মের ব্রতে ও বিধাতা আমাদের মিল ঘটিয়েছেন। আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন যে জ্ঞানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।-—— সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্ত মানুষের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে — পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।'

পবিত্র সরকারের লেখা ছোটোদের বই

ছড়া

দম্ ফটাশ (৪র্থ সং), হাসতে হাসতে বানান (১০ম সং), কথামালাঃ ছড়া ঢালা (৫ম সং), কম্পিউটার বলে কি মানুষ নয়? (১ম সং), মায়ের ছড়া শিশুর ছড়া (১ম সং), ছোটোদের লিমেরিক (১ম), ইলিশ আর কিনছি না (২য় সং)।

গল্প

বাচ্চাটা অত কাঁদছিল কেন, কোদালের হালুয়া, ওকার সূক্ষ্মবিচার, উধাও অশ্বমুন্ড রহস্য (গোয়েন্দা উপন্যাস), কিশোর সঞ্চয়ন, ছোটোদের নতুন গল্প, নাতিনাতনিদের কথা।

ভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা বলো (উচ্চারণতত্ত্ব, ৩য় সং), ব্যাকরণের হাসিখুশি, ভাষা-বিজ্ঞান (৬ষ্ঠ শ্রেণি), ভাষা-জিজ্ঞাসা (৭ম-৮ম), ভাষা-জিজ্ঞাসা (৯-১০ম); ভাষা-পরিচয় (৬ষ্ঠ), ভাষা-পরিচয় (৭ম-৮ম), মাধ্যমিক ভাষা-সন্ধান (৯ম-১০ম), বাংলা লেখার সহজ পাঠ। হাসতে হাসতে ইংরেজি (১০ম সং) , এসো ইংরেজি শিখি ১, এসো ইংরেজি শিখি-২। নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণগুলি অধ্যাপক গণেশ বসুর সহযোগিতায় লেখা।

ছানাভূত গা না ভূত

রাকা দাশগুপ্ত

চরিত্র ঃ এক্কা, দোক্কা, তেক্কা—তিনজন ভূতের ছানা
একজন গায়ক-তথা সিনেমার সুরকার

সূত্রধর

প্রথম দৃশ্য

(খোলা ছাদ। ওপরটা অন্ধকার। তিনজন ভূতের ছানা একটা ভাঙ্গা তবলা, একটা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছে।)

সূত্রধরের প্রবেশ।

সূত্রধর-
এপাড়ার ধার ঘেঁষে বেপাড়ার ছাদে
গুটিকত ছানা ভূত নানা তান সাধে।
শুনবে সে গান? তবে চলো গিয়ে দেখি
আজ রাতে মাঝরাতে ওরা করে কে কি।

(প্রস্থান)

তবলা ও হারমোনিয়াম সহযোগে
এক্কা, দোক্কা, তেক্কার গান :

আকাশ জুড়ে নিকষ কালো, চাঁদভায়া পিঠটান
আমরা কজন ভূতের ছানা একসাথে গাই গান।
কেউ দেবে না পাত্তা জানি, বলবে না কেউ "বাহ্"
হাততালি? ইশ, কক্ষনো নয়। প্রাইজ-টাইজ? নাহ্!
তাও কি মোরা হাল ছেড়েছি? জেদ কি মোদের কম?
সাধছি গলা সপ্তমে, আর শোনাচ্ছি সরগম।
লাইট ক্ল্যাসিক, গজল, খেয়াল, কিম্বা পপ আর রক
যা চাও সে গান শুনিয়ে দেব, মিটিয়ে দেব শখ।
তাও আমাদের হয় না খ্যাতি, দেয় না তো কেউ মান
আমরা কজন ভূতের ছানা প্রাণ খুলে গাই গান।

এক্কা :
ওপাড়াতে আছে এক নামজাদা লোক
বিখ্যাত সুরকার, মস্ত গায়ক।
কাজ করে সিনেমাতে
সুর বাঁধে দিনেরাতে
টুংটাং পিয়ানোর বাজনাতে ঝোঁক।

দোক্কা :
জবর খবর! এই তো চাই!
চল না ওকেই ভয় দেখাই।
ভয় পেয়ে ও বাৎলে দেবে
গায়ক হবার রাস্তাটাই।
তারপরে আর ভাবনা কি?
এলেম মোদের কম নাকি?

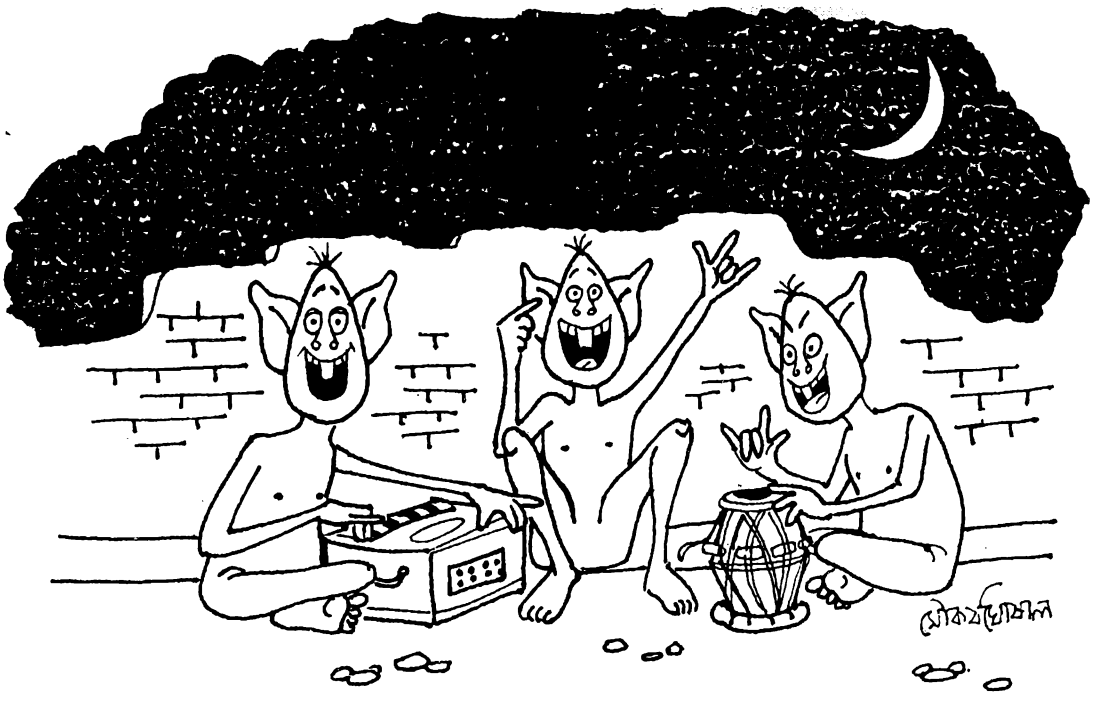

দেখতে দেখতে দেশ-বিদেশে
ছড়িয়ে যাবে নামডাকই।
তেক্কা :
তার কাছেই
চল না আজ
আজ না হয়
থাক রেওয়াজ।
রাত গড়ায়
দুই প্রহর
সয় না তর
আর তো মোর!
এক্কা ভাই
দোক্কা ভাই
এখখুনিই
চল না যাই!
তিনজনের গান :
আকাশ জুড়ে নিকষ কালো, চাঁদভায়া পিঠটান
তিন ছানা ভূত, তিনটি গায়ক ভিন পাড়াতে যান।
(গান গাইতে গাইতে তিনজনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একটা সাজানো গোছানো ঘর। সামনে একটা পিয়ানো। আরামকেদারায় বসে আছেন গায়ক-তথা-সুরকারটি)

(সূত্রধরের প্রবেশ)
সূত্রধর :
ভূতেরা তো হাঁটা দিল গায়কের বাড়ি
আমরা সেদিক পানে দিই তবে পাড়ি?
আপাতত উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখি ষ্টাডিরুমে
তিনি কি এখনও জেগে? নাকি, উঁহু....ঘুমে?
(প্রস্থান)
সুরকার :
রাত আজ ঢের হল, তাও আসছে না ঘুম
পিয়ানোয় বসব নাকি, একটুখানি?
কিছু সুর বাঁধতে হবে এই কদিনে
এ যাবৎ তৈরী কেবল একটা গানই।

সিনেমায় ভার পড়েছে সুর সাজানোর
যে-সে নয়, মস্ত সে এক ভূতের মুভি
হাতে তাই ট্র্যাক কিছু চাই হাড়কাঁপানো
ইদানিং রয়েছি তাতে ব্যস্ত খুবই।
কি করে ছমছমে গা গান বানাব?
কতটা থমথমে চাই ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর?
এসবই পাক খেয়ে যায় মাথার ভেতর
কিছুতেই ঘুম আসে না রাত থেকে ভোর।
(উল্টোদিক থেকে এক্কা দোক্কা তেক্কার প্রবেশ ও নাচ।)

এক্কার গান-
কুলোপানা কান আছে মুলোপানা দাঁত
এই নিয়ে নাচানাচি করি সারারাত
নখও আছে ক্ষুরধার
ওরে ব্যাটা সুরকার
কথা না শুনিস যদি, হবি কুপোকাৎ।

সুরকার :
ও বাবা নাচছে কারা ওই ওখানে?
কারা ওই কিলবিলিয়ে পা-হাত নাড়ে?
কিরকম ঝাপসা যেন ছায়ার মত!
দুচোখে দেখছি কি ভুল অন্ধকারে?

তেক্কা :
শোন রে শোন
শোন মানুষ
আমরা ভূত
পাস কি হুঁশ?
আজকে তোর
মটকে ঘাড়
করব বেশ
জলখাবার।
সুরকার :
আরে রাম! সত্যি পেলাম ভূতের দেখা?
আমাকে করবে শেষে জলখাবারই?
(গলা খাঁকরিয়ে)
আহা হা, তোমরা এসো! কি ভাগ্যি আজ!
অধমের কোন অপরাধ, জানতে পারি?
তোমাদের অন্য খাবার খাওয়াই যদি?
ধরা যাক চিকেন কারি-প্রন পকোড়া?
ভূতেদের খাবার কি হয় অন্য কিছু?
কি খাবে? হিংবাটা আর রসুন-পোড়া?
আমাকে খেতেই পারো। কিন্তু তাতে
সেরকম ভরবে না মন। স্বাদটা তেতো।
ও ভোলা কই গেলি তুই? ঘুম থেকে ওঠ!
বাবুদের গেলাস ভরে জলটা দে তো!

এক্কা :

খাওয়াটা কথার কথা। সে এখন থাক।
বড় বেশি মোটা তুই। হবি গুরুপাক।
তোকে যে চিবিয়ে খাব
তাতে কিছু নেই লাভও
কাজের কথাটা আগে বলে রাখা যাক।
আমাদের আছে এক জম্পেশ ঠেক
গান বাঁধি, গান গাই। প্রতিভা অনেক।
তোরও তো ক্ষমতা ঢের
সিনেমাতে আমাদের
ছোটখাটো একখানা দে দিকিনি ব্রেক!
সুরকার *(পিয়ানোয় টুংটাং করতে করতে স্বগতোক্তি)*
কি আপদ! এদের নিয়ে যায় কী করা?
ভূতেরা গান গাবে আর শুনবে লোকে?
যদিবা না হই রাজি, বিপদ তাতে
কে জানে বলবে কিনা "খাবোই তোকে"!
দোক্কা :
আমরা দেদার গান লিখি
এই কথাটা মানলি কি?
শুনেই তো দ্যাখ আজকে না হয়!
গলাও সরেস। জানলি কি?

আমরা তো ভূত। নই দেহী।
একটা নাহয় চান্স দেহি!
হলফ করে বলতে পারি।
হাম কিসিসে কম নেহি!
সুরকার *(স্বগত, কিন্তু উত্তেজিত)* :
আরে হ্যাঁ! ইউরেকা! এক কাজ করা যায়!
আমাদের ভূত-সিনেমার কথায়-সুরে
কিছু গান এদের দিয়েই রেকর্ড করি
তারপর সুযোগমত দিই তা জুড়ে!
তাছাড়া ওদের লেখা গান যদি পাই
অবিকল ভূতের গলায় ভূতের ভাষা!
এ যেন চাঁদ পেয়েছি হাতের মুঠোয়
সিনেমায় এমন জিনিস জমবে খাসা!
(উত্তেজনায় পিয়ানোর চাবিগুলোতে চাপ দেয় সুরকার, ঝমঝম করে বেজে ওঠে যন্ত্রটা)
তেক্কা :
চক্ষু গোল
ঠোঁট-কুলুপ
রইলি ফের
তুই যে চুপ!
বাজনা রাখ
আজ এখন
তিন ভূতের
গান তো শোন!
ঠোঁট-কুলুপ
চক্ষু গোল
একটু নয়
মুখটা খোল!
সুরকার :
সে তো বেশ! এবার চলো পাশের ঘরে
কিছুটা সময় তো চাই, রিহার্সালও
সিনেমায় প্লেব্যাক করার সুযোগ দেব
যদি আজ গাইতে পারো দারুণ ভালো।

তোমাদের নিজস্ব গান শোনাও আগে
ভূতুড়ে কথায়, সুরে, ভূতের স্বরে
আমিও তুলতে থাকি রেকর্ডারে
তাহলে এবার চলো, পাশের ঘরে?
তেক্কা-
বেশ তো বেশ
ভাইসকল
গাইব গান
চল রে চল
(সকলের প্রস্থান)
তৃতীয় দৃশ্য
(আগের মতই খোলা ছাদ। এক্কা, দোক্কা ও তেক্কা বসে আছে। এবারে অনেক ঝলমলে জামা তাদের গায়ে)
(সূত্রধরের প্রবেশ)
সূত্রধর :
সিনেমা বেরিয়ে গেছে। ভারি ধুমধাম।
বাজার কেটেছে খুব নয়া অ্যালবাম।
ভূতো ভূতো গান সব, ভূতুড়ে প্লে ব্যাক
জমে গেছে সব কটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্র্যাক।
লিরিকও তো জুৎসই, উৎরেছে খাসা
নাকিসুরে ঝাঁকিসুরে ভূতেদের ভাষা।
ভূতেদের হয়ে গেছে ভারি নামডাক
এখন কি বলে তারা, শুনে আসা যাক।
(প্রস্থান)
এক্কা :
হলিউড থেকে এক চিঠি এল কাল।
ভৌতিক ছবি হবে। বাজেট বিশাল।
গোটা দুই আছে গান
ওঁরা সকলেই চান
ভূতেরা করুক সেটা, হ্যাঁ, অরিজিনাল।

তেক্কা :
হিপ্পি হিপ
হুররে হুর
লিখব গান
বাঁধব সুর।
আর কী চাই!
আর কী নেই!
গাইব গান
মার্কিনেই।
সব দেশেই
হচ্ছে, ভাব!
ভূত ট্রায়োর
ফ্যান কেলাব।
এক্কা :
তাছাড়া এদেশে আছে যত ভূত, সব
ঘোষণা করেছে এক "ভূত উৎসব"
সেখানে ডেকেছে। আর
ভূতোগান শোনাবার
আয়োজন হয়ে গেছে, কি নিখুঁত সব!

তেক্কা-
হুররে হিপ
হিপ্পি হুর
আজকে চল
সাধব সুর।
এক্কা দোক্কা ও তেক্কার গান-
আকাশ জুড়ে নিকষ কালো, চাঁদভায়া পিঠটান
আমরা কজন ভূতের ছানা আহ্লাদে গাই গান।
একটা কথা বলতে পারি, করতে পারি জাঁক
দেশবিদেশে এখন মোদের অজস্র নামডাক।
আমরা এখন বিখ্যাত লোক, আমরা এখন স্টার
হয়তো বুঝি জুটেও যাবে গ্র্যামি বা অস্কার
সবাই মোদের বাসছে ভাল, দিচ্ছে দেদার মান
আমরা কজন ভূতছানা তাই ফূর্তিতে গাই গান।

ছবি ঃ সৌকর্য ঘোষাল

ধারাবাহিক অজানা উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

মূল ইংরিজি থেকে রূপান্তর ঃ শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

চুম্বক : *মঙ্গলপুর পদ্মপুকুরের তলায় নেমেছে ব্যোমযান, যাত্রী তার একা অবতার। মস্ত একখানা মাথা, চোয়াল দুটো আছে চুমসে। এক কান, চোখ আর একেক হাতে তিনটে আঙ্গুল। মঙ্গলপুরের সুখা-ফাটা জমি খুঁড়ে জল বার করার কাজ চলছে। করাচ্ছে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী গগনলাল বাজোরিয়া। তদারকিতে রয়েছে ৩৫-৩৬ বছরের সুঠাম সুপুরুষ কেজো প্রকৃতির এক মার্কিন—জো ডেভলিন, গ্রামে এসেছে ক্যালকাটা হেরাল্ডের সাংবাদিক মোহন। ডেভলিনের সাক্ষাৎকার নেবে সে, এদিকে জলের নীচ থেকে সবকিছু নজর করে অবতার। হাবার মাথায় রক্ত দেখে ওর চোখের রং হয়ে যায় সবুজ। এদিকে বৃদ্ধ নারায়ণ পালোধির শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। রাতের বেলায় চণ্ডীতলা দেবীর থানে এসে হাজির হয় ডেভলিন, আর রাতের খাওয়া সেরে মোহন ব্যস্ত হয়ে পড়ে লেখায়। একই সঙ্গে গল্প চলে স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গেও। মোহনকে কল্যাণী কথা দেয় যে সে গ্রামের মেয়েদের কাছে যাবে, শুনবে ওদের সুখ-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার কথা। সাঁওতাল পল্লীর নাচের অনুষ্ঠান দেখে ফেরার পথে ডেভলিন থামে ছোট্ট গির্জাটায়। আলাপ হয় পাদরী অতুল বিশ্বাসের সঙ্গে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাস তালতলার অতুল আজকাল মঙ্গলপুরের অনেক ছোটোখাট বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করেন। মঙ্গলপুরকে একটুকরো স্বর্গই ভাবেন রেভারেন্ড অতুল বিশ্বাস। খানিক গল্প গুজবের পর ডেভলিন গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে রওয়ানা হল। রাতের অন্ধকারে দূর থেকে ভেসে আসা সাঁওতাল পল্লির গান, মাদলের শব্দে মিলে মিশে গেল ডেভলিনের গান। তারপর...ডেভলিনের গান দূরে মিলিয়ে যেতে অবতার বেরিয়ে এল তার ব্যোমযান থেকে। হাওয়ায় ভেসে ঘুরে বেড়ালো মঙ্গলপুরের আনাচে কানাচে। ফুল ফোটাল চারা গাছে। ওর হাতের ছোঁয়ায় এক পলকে মাঠ ভর্তি ধান পেকে গেল। ঢুকে গেল ও হাবার স্বপ্নেও। এদিকে গোবিন্দকে সবাই বেশি ফসলের মন্তর চেয়ে ধরে বসল। জ্ঞানীদের সন্দেহ এতে মার্কিন সাহেবের হাত আছে। হাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'মন্দির ফুটেছে, মন্দির!' এদিকে অবতার তার যানে বসে সব বুঝে নেবার চেষ্টা করছে। সবাই মন্দিরের ঠাকুর দেখতে চাইলে হাবা জানাল, ওতে ওর বন্ধু আছে। ফণীবোস বাড়িতে ফিরে দেখলেন, দেবীর কৃপায় জগার আমগাছ ফলে ভরে গেলেও তাঁর পেয়ারাগাছ যে কে সেই—এ ঘোর অন্যায়। তারপর?*

মন্দির আবির্ভাবের খবর ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল মঙ্গলপুরে। ঝিলের পাড় লোকে লোকারণ্য। গ্রাম্য পুকুরের চেহারা পুজোর তিথিতে কলকাতার বাবুঘাটের মতো। খবর পেয়ে বাজোরিয়াও হাজির তার প্রকাণ্ড গাড়ি ছুটিয়ে। বাজোরিয়া দেখছে সোনার 'মন্দির'-এর চেহারার ব্যোমযানকে, আর অবতার দেখছে বাজোরিয়াকে। বাজোরিয়া ঘোষণা করল যে মঙ্গলপুর ভারতের সেরা তীর্থস্থান হবে। হঠাৎ একটা বিকট, কর্কশ, অপার্থিব হাসির ঢেউ যেন ফেটে পড়ল চারদিকে। কে যে হাসল বুঝতে পারল না কেউ।

স্থানীয় গির্জায়, মন্দিরে ধর্মসমাবেশে নতুন মন্দির নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—দেখছে অবতার। ডেভলিন গির্জা পেরিয়ে বটতলায় সাধুর ডেরায় গিয়ে বসল। নারায়ণের দেহ তখন শ্মশানে চিতায় তোলা হচ্ছে। অবতার কাছ থেকে দেখছিল, হঠাৎ তার চোখ হয়ে উঠল তীব্র, উজ্জ্বল সাদা—আর নারায়ণ চোখ মেলল, তার ঠোঁট কাঁপছে। দেখে আর সবাই দৌড়ে পালাল ভয়ে, শুধু হোমিও ডাক্তার সরকার এগিয়ে গেলেন নারায়ণের দিকে। ততক্ষণে অবতারের চোখের সাদা আলো নিভে গেছে, সরকার দেখলেন নারায়ণ সম্পূর্ণ মৃত। অবতার দুষ্টুমির হাসি মুখে দৌড়াল অন্য কোথাও।

।। ১৬ ।।

বটবৃক্ষি ছাড়িয়ে রাত হেলছে,দুলছে সাধুবাবার আস্তানায়। সাধুর ছিলিমে কষে কটা গাঁজার টান দিতেই দোলা শুরু হয়েছে জঙ্গলের গাছপালার, রাতের আকাশের। এ এক আজব মেজাজ ধরেছে জো ডেভলিনের। হুইস্কির চুমুকের থেকে যেন অন্যরকম।

ওর চোখ দুটোও লাল হতে লেগেছে।

ওই ঝিম মেজাজে সাধুবাবার দিকে চেয়ে ডেভলিন বলল, বহুত জ্ঞান তোমার তাই না?

কথাটার মধ্যে সবটাই বিলাসী নয়,একটু খোঁচাও যেন কোথায় একটা।

ডেভলিন দেখল অন্ধকারে বসা জটাজুটধারী সাধুর মূর্তিটা যেন কীরকম কাঁপছে। চোখের সামনে সবই যেন ঠিক স্থির নেই, কাঁপছে, দুলছে, তিরতির করছে। প্রকান্ড বট গাছটাও নাচের ভঙ্গিতে বাঁকছে। ওর মুখগলে বেরিয়ে এল—যিসাস!

ডেভলিন এবার কড়া করে তাকাল হাতের কল্কেটার দিকে, তারপর কী মনে করে সেটা সড়াৎ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। মাটিতে পড়ে মটাস করে সেটা টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাবাও ওঁর হাতে ধরা হুইস্কির ফ্লাস্কটা ওই দিকেই ছুঁড়ে মারলেন।

করে কী সাধুটা!— এই মনে করে ডেভলিন দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ কড়া করেই বলা শুরু করল — অ্যাই, করোকী? করো কী? এটা কী হল?

বলতে বলতে মাটিতে পড়ে থাকা কল্কের পাশ থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিল। কটমট করে তাকাল সাধুর দিকে, যিনি দিব্যি বসে আছেন দুর্বোধ্য এক চাউনি নিয়ে। ওঁর এই ভাবখানা দেখে ডেভলিনের বুঝতে বাকি রইল না যে কল্কে ছুঁড়ে ফেলাটা সাধুর পছন্দ হয়নি। তাই আপসে আসতে স্বগতোক্তির মতো করে বলল, ঠিক আছে, বুঝলাম!

তারপর বড় বড় নিঃস্বাস ফেলতে ফেলতে ফের নিজের জায়গায় এসে বসল ডেভলিন। সাধুর দিকে চোখ রেখে বলল, তুমি ভারতের বিখ্যাত দড়ির খেলা জানো?

সাধু স্থির। নির্বিকার। নির্বাক।

ডেভলিন শুধোল, তোমার এখানে একটা কাঁটার বিছানাও নিশ্চয়ই পড়ে আছে কোথাও তাই না?

সাধু তবুও নিরুত্তর।

ডেভলিন ফুট কাটল— বাজি রাখতে পারি কোনও কাঁটার বিছানা নেই তোমার। তুমি নরম তোষকেই ঘুমোও,যা অমিও করি। তাহলে তুমি আর আমার চেয়ে আলাদা কী হলে ?..... কে জানে, জে ডেভলিনই হয়তো তোমার চেয়ে ভাল!

খোঁচা মেরে মেরে সাধুকে নড়াবার, নাকি জাগাবার ? তাল কষল ডেভলিন। সাধুর ওই নির্বিকার, তূরীয় ভাবটা ভাঙার উপায় বার করার ফন্দিতে পেল ওকে। বলল, আমার সঙ্গে তোমার আবার তুলনা কিসে? বাজি রাখব তুমি মাটি খুঁড়ে জল বার করতে পারো না। পারো? তুমি দেখেছ কী ভাবে যন্ত্র দিয়ে শুকনো মাটি ফুঁড়ে হুস্

হুস্ করে জল ঠিকরোচ্ছে? এই পোড়ারমুখো দেশের পক্ষে কত বড় কাজ বলো তো? ..... তুমি নিজে, ওহে সাধু, এমন কিছু করতে পারলে দেশটার জন্য? তা করবে কেন? কিস্যু না করেই যদি এভাবে দিব্যি ঠেট বসে বসে সময় কাট তো করার দরকারটাই বা কী ? চুপচাপ বসে আছ, এই না কত!

ডেভলিন উঠে কয়েক পা গিয়ে একটা গাছের ডাল ধরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইল। পূর্ণ চাঁদের চারপাশ ঘিরে আলোর ছটা যেন চাঁদের মালা। ডেভলিন একটু মুগ্ধ চোখে তাকাল চাঁদের দিকে, তারপর সেদিকে আঙুল তুলে সাধুকে বলল, দেখছ, কী জিনিস ভাসছে আকাশে? ওখানে বসে একটু গাঁজা টানলে হয় না? চারিদিকে রটে যাবে 'সাধুর নির্বাণ হল চাঁদে'! — কী? বেড়ে হয় না কান্ডটা ? চাই কী, তুমি জমিও কিনে ফেলতে পারো এখানে। ঠাট্টা নয়, মার্কিনরা ওই চাঁদে পা রাখল বলে! কমুনিস্টরাও চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে কী, সাধু, ওসব করতে বুকে দম চাই, পকেটে ক্যাশ চাই, আর তোমার মতো ওই থুম্ হয়ে না বসে আমার মতো দৌড়নো চাই, বুঝেছ? বাঁচতে হবে। তোমার মতো ঘট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তোমার ওই গ্যাট মেরে বসাটা কি জীবন নাকি? ওটা তো মরারই শামিল .....

ডেভলিন দূরে শ্মশানের চিতার আগুনের দিকে দেখাল। লেলিহান শিখা উঠছে বৃদ্ধ নারায়ন পালধির চিতা থেকে। ডেভলিন বলল, ওই যে ঝলসে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে দেহটা..... ওর কোনও সমস্যা নেই।.....না আয়করের সমস্যা, না যুদ্ধে যাওয়ার। .....ওর প্রয়োজন নেই সঙ্গিনীর ..... মাথা ঘামাতে হবে না বাড়ির জলের নালি ফাটলে .... না, না কোনও সমস্যাই .....

কথার মধ্যে হোঁচট খেল ডেভলিন। এত যে বকে যাচ্ছে যার জন্য সে তো স্থির দৃষ্টিতে বোমভোলা হয়ে বসে! চোখের পাতা পড়ে না, কিন্তু সে দেখছেটা কী? জোরালো নজরে অর্থহীন ভাবে কী দেখে.....

ডেভলিন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই তুমি কি মাছ নাকি ? তোমার চোখের পাতা পড়ে না কেন? পাতা নেই নাকি!

সাধু কিন্তু সেই অপলক চেয়ে। ডেভলিনকে যেন বশ করেছে ওই দৃষ্টি। সাধুর থেকে ও আর নজর সরাতে পারে না .....

কী দেখছ তুমি আমায় ওভাবে? —গর্জে উঠল সাহেব। কিছু ভুল বলছি?

ডেভলিন দেখল সাধুর দেহটা কাঁপছে — নেশায় ধরা ডেভলিনের দেখাটা যা দাঁড়িয়েছে। তবু সেই ভাবেই ডেভলিন দেখতে থাকল সাধুকে, যার নির্নিমেষ চাহনিতে ও নিজই বাঁধা পড়ে আছে।

তোমারও কিছু একটা সমস্যা আছে তাহলে.....সাধুর দিকে প্রায় হতাশার সুরে বলল ডেভলিন। .....সেজন্যই বসে বসে, বসে বসে তুমি.....

ডেভলিনের কথা শেষ হল না, হঠাৎ বাঁশঝাড় থেকে বেদম সুরে শুরু হয়ে গেল শেয়ালদের হুক্কা হুয়া ! হুক্কা হুয়া!

ডেভলিন চমকে গেছে। ও মাটি থেকে একটা পাথর তুলে ছুড়ে দিল বাঁশঝাড় লক্ষ্য করে। —চুপকর, ব্যাটারা! জোরে চেঁচিয়েও উঠল।

আর পাথর ছোঁড়ার ওই ঝাপ্টায় সাধুর অবশ করা সম্মোহক চাহনি থেকেও ও বেরিয়ে আসতে পারল।

মনে একটা ছোট্ট নিষ্কৃতির ভাব এল — উঃফ্, বাঁচা গেল!

ডেভলিন এলোমোলো পা ফেলতে ফেলতে হাঁটা ধরল জলমহলের দিকে।

(১৭)

জলমহলে পৌঁছতে ডেভলিনকে নিতে হচ্ছিল বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে গলে যাওয়া রাস্তাটা।

রাতের এই আলো- আঁধারি বেলায় বাঁশবনের চেহারা দাঁড়িয়েছে এক আশ্চর্য গথিক গির্জার মতো। বাঁশগুলো এধার থেকে ওধারে হেলে এক অন্যকে যে ভাবে খুঁচ্ছে, আর তারই ভেতর থেকে চাঁদের আলো যেভাবে পাতার

বেড়া পার করে মাটিতে ছড়ানো শুকনো পাতার চাদরে এসে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তাতে পুরনো গির্জার মধ্যেকার সেই রহস্যগম্ভীর ছোঁওয়া যেন। চাঁদের আলো পড়ে হলুদ, সাদা, নীল ফুল সব রঙে ঝিলমিল করছে। আর পাশের ছড়ানো অন্ধকারকে থেকে থেকে আলোয় চমকে দিচ্ছে রাশি রাশি জোনাকি । সব মিলিয়ে এমনই এক অমর্ত্য পরিবেশ এখন বাঁশবাগানে যে ডেভলিনকে কয় দন্ড দাঁড়িয়ে চোখ বুলিয়ে চারপাশটা দেখতেই হল। আর সেভাবে এদিক -ওদিক দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত ভাবনা এল মনে— আমি কি একা? নাকি কেউ কোথা থেকে নজর রাখছে আমার ওপর?

ওর গলা থেকে আচম্‌কা একটা হাঁক ছুটে গেল —হেঁই!

ওর চিৎকারের একটা প্রতিধ্বনি হল। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিধ্বনি ঠিক ওর কন্ঠস্বরের নয়, একটা তীক্ষ্ণ, খনখনে,উচ্চগ্রামের ধ্বনি সেটা। যেন ডেভলিনের ডাকের জবাব।

ডেভলিন সে- আওয়াজের পাত্তা না দিয়ে নিজের রাস্তায় চলতেই থাকল। আর চলতে চলতে.....

হঠাৎ খোলা মাঠে এসে একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়ল অবতারের।

আর পথের মধ্যে চমকে থমকে পড়ল ডেভলিন।

ও শিশুর আকারের অবতারের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েই রইল।

ও একটু সামনে ঝুঁকে ছোট্ট জীবটার হদিশ নেবার চেষ্টা করল। তখন একটা ছোট্ট চারা গাছের ফিনফিনে পাতায় বসা অবতারও চোখ মেলে ওকে দেখতে লাগল।

ডেভলিনের অবাক ভাব ততক্ষনে চাঁদ ছুঁয়েছে । সেই ঘোরেই ওবলে ফেলল — পুঁচকে,তুই?..... না,না, তোর সঙ্গে তো আমার কোনদিন দেখা হয়নি। হয়েছে কি ?

ওর এই কথায় অবতারের চোখের সবুজ আলো জ্বলে উঠল। তা দেখে ডেভলিন শুধোল কেমন চোখ রে তোর, পুঁচকে?

বলতে না বলতে অবতারের চোখ প্রায় নিভে এল। আলো কম,তবু সেই চোখে ডেভলিনকে দেখে যাচ্ছে অবতার।

ডেভলিন বলল, তোদের ব্যাপারটা কী বল্ তো ? সারাক্ষন সব্বাই দেখি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাস। আগে কক্ষনো একটা অ্যামেরিকান দেখিসনি নাকি? যা, যা, বাড়ি যা। পালা!

অবতার বলল, পালা!

ডেভলিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ভাল জ্বালা তো!

বলেই পিছমুড়েই চলা ধরল। অবতার নিঃশব্দে ওর পছনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকল। ডেভলিন বুঝল পুঁচকেটা ওর পিছু নিয়েছে। ও থামল, তারপর ঘুরল। তখন অবতারও থেমে পড়ল। ডেভলিন ওর দিকে নজর ফেলে বলল, টাকা চাস? বখশিস ? এই নে।

অবতারের দিকে একটা আধুলি ছুড়ে দিয়ে ডেভলিন ফের পা চালাল। অবতার আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রান ভরে হাসতে লাগল। বড় আনন্দের হাসি।

।। ১৮।।

জানলায় দাঁড়িয়ে উদাস ভাবে তাকিয়ে ছিল মোহন, যখন ঢং ঢং করে ঘড়িতে কোথাও বারোটা বাজল। আর তাতেও যেন ওর দুঃখী দুঃখী চাউনিটার কোনও হেলদোল হল না। সেই চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। হঠৎ পিছন থেকে ডাক এল কল্যানীর -- কী গো, বারোটা যে বাজল

সম্বিৎ ফিরে মোহন ঘুরল, দেখল খাটের পাশটায় দাঁড়ানো কল্যানী আস্তে আস্তে বিছানার ধারটায় বসে পড়ছে। আর মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

কী হয়েছে কল্যানী? —খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল মোহন।

কল্যানী বলল, কিছু না।

মোহন বুঝল কিছু তো হয়েইছে। বউয়ের গলাটা এত ধরা, তার ওপর কাঁপছে। মোহন ওর দিকে সরে এসে হাত রাখল ওর থুতনিতে, তারপর আস্তে করে মুখটা তুলে ধরল ওপরে, নিজের দিকে। দেখল জল টল টল করছে দুই চোখে। মোহন বসে পড়ল পাশে। কল্যানী ওর মাথাটা শুইয়ে দিল বরের কাঁধে।

মোহন আমতা আমতা করে বলা শুরু করল — আসলে কী জান, কল্যানী.....ব্যাপারগুলোকে কিছুতেই মিলিয়ে এক করতে পারছি না সব কীরকম ছেদরে মেদরে পড়ে আছে। যা-ই মেলাতে যাই ..... ওর কথার মধ্যেই কল্যানী বলে উঠল, মিলবে কী করে তোমার মনটাই যে সারাক্ষন উড়ে উড়ে বেড়াছে চাঁদ, তারা শূন্য, মহাশূন্যে..... আর সেখানে তোমার পাশে পড়ে থাকা এই আমার জন্যে একটুও ভাবার সময় হয়না! অ্যাত্তোটুকুও না!

মোহন বউকে বুঝ মানাবার জন্য ওর পিঠে হাত রাখল। আস্তে আস্তে বলল, চাঁদ-তারা নিয়ে তো ভেবে মরছি না, কোনও শখের ভাবনাই নয় ওটা।

বলতে পারো একটা ব্যাপারের জট খুলতে পারছি না। এমন একটা ব্যাপার যার তল পাচ্ছি না। আমার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে একটা রহস্য। আর তুমি তো আমার কাছে কোন রহস্য নও, কল্যানী।

তা হলেই তো ভাল ছিল — চোখে জল নিয়েও সামান্য হাসল কল্যানী। তা হলে তোমার ভাবনায় একটু জায়গা হত আমার।

কেন ?— মোহনের গলায় বেশ স্পষ্ট আবেগ। তুমই তো আমার ভাবনায় এখন।

কল্যানী ফস্ করে জিজ্ঞেস করল, আর সেই ভাবনাগুলো কী, জানতে পারি কিন্তু.....

ওর ওই চাহনি দেখে কল্যানী বলল,তুমি কিন্তু ফের ভাবা শুরু করেছ।

মোহন প্রতিবাদ করে বলল, না, ভাবছি না। আমি একটা ঝিলের জলের দিকে তাকাচ্ছি।

কল্যানী জিজ্ঞেস করল, একটা পদ্মপুকুর?

মোহন উত্তর করল, না। তবে পুকুরটার আকৃতি একটা পদ্মপাতার মতো। তার চারদিকে গাছপালা, আর তার মাঝখানে একটা রহস্যময় মন্দির যার আকৃতি একটা শুন্যের মতো ..... আর সে-মন্দিরে একটা দুষ্টুমিতে ভরা দেবতার অধিষ্ঠান যিনি মানুষের মনকে তার কাজের থেকে কেড়ে নেন,আর যিনি চকমক করেন একটা.....

মোহন ওর কথার মধ্যে একটু জিরোতে চাইল, কিন্তু কল্যানীর আর তর সইছেনা। ও জিজ্ঞেস করে বসল, তি-তি- তিনি কিসের মতো চকমক করেন?

মোহন বলল,তারার মতন।..... হাবা একটা তারার কথা বলেছিল, না?

কল্যানী ব্যাজার মুখে বলল, তাহলে তুমি এখন হাকে নিয়ে ভাবতে বসলে?

মোহন বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, কল্যানী । একেক সময় একটা শিশুও বড় মানুষদের থেকে ঢের বেশি বুদ্ধি ধরে।

নিজের কথার মধ্যেই উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেছে মোহন। ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। ও বলল, আচ্ছা, ওই কাগজটা কোথায়?

কল্যানী কিছু ঠাওরাতে না পেরে বলল, কী কাগজ?

মোহন জিজ্ঞেস করল আমরা কবে যেন পড়লাম ফুটন্ত আলো সম্পর্কে? —গতকাল ?..... তার মানে আলোটা দেখা গিয়েছিল দু রাত আগে, আর ওই মন্দির .....

কথার মধ্যেই বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খালি পায়েই মোহন ছুট লাগাল বাড়ির বাইরে।

কল্যানী কিছুটা বিরক্ত, অনেকটা অবাক হয়ে প্রায় হাঁ মেরে বসে রইল বিছানায়। ওর ঢাল কালো চুল দু কাঁধ জুড়ে এলোমোলো ছড়িয়ে।

।। ১৯ ।।

মোহন বাড়ি থেকে ছুটে বার হতেই দেখল এক দল লোক ওরই বাড়ির উদ্দেশ্যে হন্টন লাগিয়ে আসছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হচ্ছিল না কে বা কারা এরা। আর কেনই বা ওরই বাড়ি মুখো। ও দৌড় থামিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা কী হতে পারে। ঠিক তখনই ভিড়ের থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল..... ফনী উকিলের।

ফনী বলছেন আর সক্কলকে — ওই তো দেখি মোহনবাবু। বাঁচালে মাইরি! তেনাকে আর ঘুম থেকে জাগাতে হল না।

দেখতে দেখতে গোটা দল এসে পড়েছে মোহনের সামনে। তাতে ফনী বোস, মোতি পরামানিক, নন্দ পুরোহিত, নারায়ন খুড়ার নাতি, কেশব, কৃষক গোবিন্দ ছাড়াও আরও বেশ ক'জনা। সব্বার হয়ে কথা চালাচ্ছেন ফনী। তিনি তো বলেই চলেছেন এক নাগাড়ে গ্রামের গেরো নিয়ে — আরে মোহন বাবু, সাধে এই রেতবিরেতে দল করে রাস্তায় নামতে হল? সব খবর কি রাখে, রিপোর্টার সাহেব?

মোহন না জিজ্ঞেস করে পারলনা, আবার কী ঘটল, উকিল বাবু? ফনী প্রায় আদালতে মামলা পেশের ভঙ্গিতে বললেন, এখন তো শহরে গিয়ে কতৃপক্ষকে পিটিশন না করে উপায় নেই দেখছি। কালই যাব।

কিসের পিটিসন ? কাকে ? —— মোহনের মাথায় কিছু ঢুকল না।

কিসের পিটিসান! জিজ্ঞেস করছে? নিজের চোখে দেখলে না কীরকম ডাইনবৃত্তি শুরু হয়েছে গোটা গ্রামে ? — ফনী এবার চাঁছাছোলা।

মোহন জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি পুকুরের ব্যাপারটা নিয়ে বলছেন? ওটাকে নিশ্চয়ই মন্দির ভাবছেন না ?

ফনী বোস বড় বড় চোখ করে পুরুত ঠাকুরের দিকে চাইলেন। মুখে বললেন, নিন ভটচায্যি মশায়, এবার আপনিই বোঝান।

ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারলে নন্দ পুরোহিতকে রোখে কে? এই চাঁদনি রাতে তিনি সাধে বেরিয়েছেন ? আর ফনী যখন বলার সুযোগ করেই দিল। কোঁচড় থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টিপ নস্যি চড়িয়ে, কাঁধের গামছা দিয়ে হাত-মুখ ঝেড়ে, দুটো গলা খাঁকারি দিয়ে নন্দ শুরু করলেন —শোনেন, আমি কিন্তু পাঁজি দেখেছি। নতুন মন্দির জাগার কতা কিছু ল্যাখেনি। তবে শনি আর বুধের অবস্থানে কিছু গোলমেলে কাইন্ডো ঘটতিই পারে। তা বেশ পরিসন্ন করে লিকেসে।

ফনী এইটা শুনেই নিজের মামলা পেয়ে গেলেন। বললেন, এই সব উৎপটাং অলৌকিকে আমাদের মঙ্গল হবার নয়, মোহনবাবু। সকলের যাতে মঙ্গল হয় না, তা আবার ভাল কিসের? তুমি কি ভাবো যে,যে দেবতা সত্যি মঙ্গল করে সে লোক বুঝে, বেছে বেছে করে? আবার যে- সব লোকের চরিত্রে কিছু ভালই দেখি না, সেও দেখি দিব্যি দেবতার কোল পাচ্ছে। এই দ্যাখো না গোবিন্দকে। সে ফসল তুলবে না সিদ্ধান্ত করেছে , আর গোটা গাঁ এখন ওর বিপক্ষে ! আর এই তো কেশব, সে স্বচক্ষে দেখলে চিতায় শুয়ে দাদু চোখ মেলছেন!

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে কেশব বলে উঠল,হক কথা। ডাক্তার তো বলেই খালাস দাদু নাই। অতচ আমি দ্যাখলাম তেনি চোখ মেলতিছেন চিতায় শুয়ে। আপনারা বিশ্বেস করেন চাই নাই করেন একিন্তু আমি দেকিচি।

কেশব ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চোখের নীচে টোকা দিল।

এই সময় মধু সরকার কথা ধরে নিলেন — আপনারা তো সব্বাই ছেলেন যখন নারান খুড়ার হাঁপ ধরল। ছটফট করে দম ফুরাতেও দেখলেন। আর আমি তো ডাক্তার, নাড়ি চিনি না ? প্রানবায়ু যে ফুড়ুত হয়ে গেছল এ তো হলপ করে কবো।

ফনী উকিল ফের নিজের দিকে ঝোল টানলেন — তবে যেটার জন্য এত কথা, দেবতাটা যে ভাল নয় তা তো প্রমান হল গাঁয়ের সব চেয়ে অখেদ্যে, কেপ্পন, গেঁড়াকলে লোক কুন্ডুটার বাগানে আম ফলাল। জীবনে কোন পুন্যিটা করল কুন্ডু দেবতার বর পেতে?

প্রশ্নটা যেহেতু মোহনের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন উকিল তাই এতক্ষনে কিছু বলার একটা সুযোগ হল

ওর। বলল, ফনীদা, খুব ভাল লাগছে জেনে যে আপনারাও মনে করেন না যে পুকুরে একটা দেবস্থান জেগেছে। তবু তড়িঘড়ি কিছু না করতেই অনুরোধ করব। অন্তত কাল সকালে।

কেন নয়, মোহনবাবু ?—সাফ সওয়াল করে বসলেন উকিল।

মোহন জবাব দিল, প্রথমত এটা তো স্বীকার করবেন যে পুকুরে যাই থাকুক তা এখনও কারও কোনও ক্ষতি করেনি? কোনও রোগ ছড়ানো বা ওই জাতীয় কোনও অপকান্ড তো সে করেনি। সে যা করেছে তা বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষও করতে চায়, কিন্তু পারেনি। আর যে টুকু- যা দেখা গেল তাতে মানতেই হবে যে সে দারুন ক্ষমতা ধরে। সুতরাং তাকে শত্রু বানানোটাও কাজের কথা নয়। যাই করি খুব অগ্রপশ্চাৎ ভেবে করা দরকার।

তা তোমার বক্তব্যটা কী?—ফনী বোস সিদ্ধান্তে আসার জন্য বললেন। পুকুরের এই শক্তিটার সঙ্গে কী ভাবে বোঝাপড়া হবে?

চিন্তায় পড়ে গিয়ে একটু চুপ মেরে রইল মোহন। শেষে বলল, আমার মনে হয় এর সঙ্গে অন্য কোনও গ্রহের যোগাযোগ আছে তবে সেটা জ্যোতিষ-টোতিষের ব্যাপার নয়। পাঁজির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

মোহনের এ কথায় গাঁয়ের মাতব্বরদের বড় একটা মন ভিজল না। ভট্‌চায্যি তো ক্ষেপেই আগুন!— তাইলে তুমিই না হয় একটা পঞ্জিকে ল্যাখো! মোহন ওঁর মানভঞ্জনের জন্য বলতে লাগল, না, না, ওরকম ভাবছেন কেন? গ্রহরা তো সবই প্রভাব আর শক্তি ফলাবার জন্য নয়। যদিও সব গ্রহে নয়, তবে কিছু কিছু গ্রহেও প্রাণীর বসবাস আছে। ঠিক আমাদের এই পৃথিবীর মতন। তা.....

নিজের কথার মধ্যেই মোহন টের পেল যে এই জটলার সামনে ব্যোমযানের ব্যাখা করার কোনও মানেই হয় না। ও কথা বন্ধ করতে দেখল এক অদ্ভুত নীরবতা ভর করেছে সবাই কে। পূর্ণিমার আলোয় গাঁয়ের পথে গ্রামের একদল লোককে চাঁদে পেয়েছে যেন।

নীরবতা ভাঙল সেই উকিলের প্যাঁচে। ফনী বোস বললেন, ওসব ছাড়ো, মোহনবাবু। গ্রহতারকা নিয়ে অতশত জেনে আমাদের কাজ নেই। আমাদের এই ছোট্ট গেরামটার মঙ্গল হলেই মঙ্গল। আমাদের কাছে এটাই জগৎ, এই আমাদের গ্রহ। তা তোমার যা-ই থিওরি হোক, পুকুরের ব্যাপারটা নিয়ে যা -ই করার কথা ভেবে থাক শুধু দেখো বাপু ওই মারোয়াড়ি আর মার্কিনটার সঙ্গে হাত মেলাতে যেও না। ওটি চলবে না।

মোহন তো থ'। এরা ভেবেছে কী? কী জিনিসের কী মানে করতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, এরকম বলছেন কেন, ফনীদা?

কারন, বললেন ফনী, ওই দুটোই রাবিশ। মারোয়াড়িটার ধান্দা সোনা। সোনার চূড়োটার দিকে ওর জুল জুল করে তাকানোটা দ্যাখোনি? আর ওই মার্কিনটা ..... ওটাও একটা জিনিস। যা ভাবা গেছে । তাই। কালরাতে বাবু শাঁওতাল গ্রামে ঢুকে পড়েছিলেন.....

মোহন ফনীর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি কথা দিচ্ছি, এ গাঁয়ের যাতে কোনও ক্ষতি না আসে তা দেখার চেষ্টা করব। তবে আপনারাও হুটহাট কিছু করে বসবেন না প্লিজ ! একটু সময় দিন আমাকে। ফনী বললেন, ঠিক আছে, ওই কথা রইল। ঠিক চব্বিশটা ঘন্টা পাবে তুমি। দ্যাখো কী করে উঠতে পারো । না হলে আমরাই যা করার করব।

দল আস্তে আস্তে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। মোহন দাঁড়িয়ে রইল যেখানে ছিল। দেখছিল অপরূপ চাঁদনি আলোয় দল মিলিয়ে যাচ্ছে গাছগাছালির মধ্যে। হঠাৎ তারই মধ্যে ডান হাত তুলে ফনী বোস একটা জোর আওয়াজ তুললেন— মোহনবাবু, চব্বিশ ঘন্টা!

(আগামী বারে সমাপ্য)

লিয়রের লিমেরিক

অশোককুমার মিত্র * শৈলশেখর মিত্র

প্রাগে বাড়ি লোকটা ছুটছিল বেগে,
অম্নি ধরল তারে ভারি রোগ প্লেগে।
শহরের লোকজন
খাওয়াল মাখন
তারে, বিড়বিড় করে তার রোগ গে ভেগে।

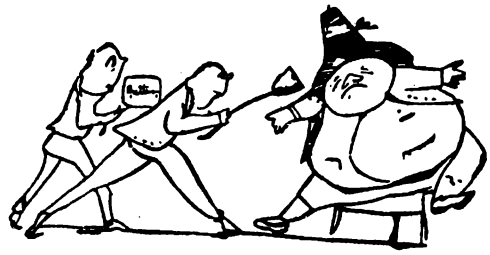

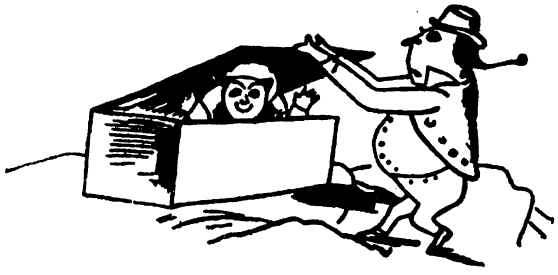

পাহাড়ে থাকত এক বিটকেল বুড়ো,
বউকে বাক্সে ভরে ঠেসে ল্যাজা মুড়ো।
বউ বলে, 'করো কী, ছাড়ো,'
'তোর আমি ধরিনে ধার-ও
এখানে কাটাবি বাকি জীবনের পুরো।'

জানালার ঝুল ছিল—পাগল নিশ্চয়—
'পড়ে যাবে'—দেখে তারে লোকে ডেকে কয়।
'খসবে জানালা বাসা।'
'না-রে ভাই আছি খাসা'
বুড়ো বলে, 'পড়বার নেই কোনো ভয়।'

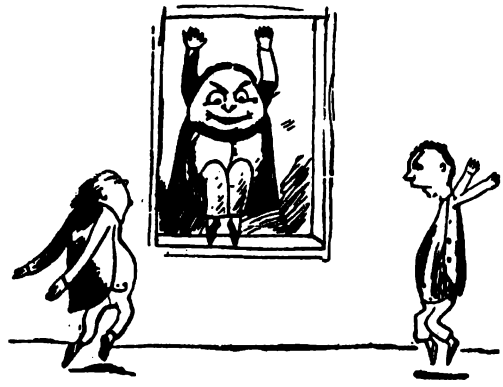

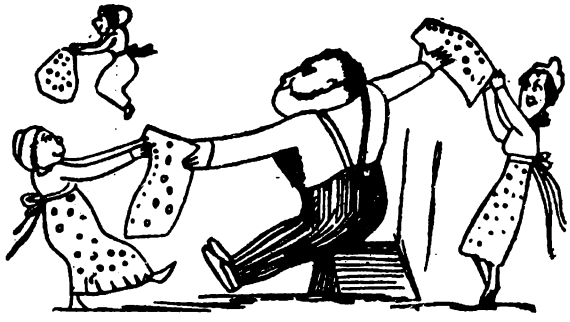

গির্জের ঘরে বসে লোকটা যে ছিল,
জামাটা বাহারি আর ফুলকাটা নীল-ও।
সে জামা টুকরো করে,
বোনেদের দিল ধরে।
মজাদার লোকটা, বড়ো-তার দিল-ও।

ছবি ঃ এডওয়ার্ড লিয়র

ছাতিম বুক্‌স্-এর বই পরিবেশক ঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার ? — গৌতম ভদ্র ❑ ১৬০০.০০
বেতার জগতে সংবাদ কথা — সম্পাদনা ইন্দিরা বিশ্বাস ❑ ৪২৫.০০
ইন্দুমাধবের চীন ভ্রমণ সরোজিনীর জাপানে বঙ্গনারী — সম্পাদনা সীমন্তী সেন ❑ ৩৫০.০০
বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য — গুরুসদয় দত্ত ❑ ৩৯৫.০০ **সমাজ, স্মৃতি সাহিত্য** — অশোক মিত্র ❑ ২২৫.০০
বাংলার মুখ — রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৯৫.০০ **ভাল মুসলমান মন্দ মুসলমান**—ইসলাম, আমেরিকা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ — মাহমুদ মামদানি,
অনুবাদ - রজত রায় ❑ ২৯৫.০০
এই পৃথিবীর তিন কাহিনী — (নারী নগরী, নোটন নোটন পায়রাগুলি, ভা[illegible]লি) কেতকী কুশারী ডাইসন ❑ ৩৭৫.০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর বই

ছোটদের বই

নতুন রূপকথা পশুকথা—দিব্যজ্যোতি মজুমদার ❑ ৬০৲
চেকদেশের রূপকথা—আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৫৲
একগুচ্ছ গল্প—নীলিমা ঘোষ ❑ ৭০৲
Child's ABC+Nursery Rhymes—নীলিমা ঘোষ ❑ ৩০৲
শিশু রামায়ণ—নীলিমা ঘোষ ❑ ২০৲
শিশু মহাভারত—নীলিমা ঘোষ ❑ ২৫৲

জীবনী গ্রন্থ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—অনিলচন্দ্র ঘোষ ও সুবীরকুমার সেন ❑ ৭০৲
আচার্যজগদীশ—অনিলচন্দ্র ঘোষ ও সুবীরকুমার সেন ❑ ১২০৲
প্রমথনাথ বসু বাংলা রচনা সংকলন—সুবীর কুমার সেন ও দীপক দাঁ ❑ ১২০৲
রবীন্দ্রনাথ—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৪০৲
বিবেকানন্দ—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৪০৲
রবীন্দ্রনাথ (বড় অক্ষরে ছাপা)—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ২৫৲
বিবেকানন্দ (বড় অক্ষরে ছাপা)—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ২৫৲
বিজ্ঞানে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ১২০৲
ব্যায়ামে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৮০৲
বীরত্বে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৪০৲
বাংলার ঋষি—অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ১০০৲
বাংলার বিদুষী—অনিলচন্দ্র ঘোষ
বাংলার মনীষী—অনিলচন্দ্র ঘোষ
সরল প্রাণিবিজ্ঞান—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ❑ ১৫৫৲

নতুন আর্থার কোন্যান ডয়েল-জীবন ও সাহিত্য —প্রসাদ সেনগুপ্ত ❑ ২৭৫৲
বাঙালি হিন্দু জাতি পরিচয় — সন্তোষকুমার কুণ্ডু ❑ ২৯৫৲

সুসঙ্কলিত ও সর্বদা ব্যবহার্য আধুনিক বাংলা অভিধান

ব্যবহারিক শব্দকোষ— কাজী আবদুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৩৫০৲

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

—জগদীশ চন্দ্র ঘোষ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ১০০৲
জীবনগড়া — অনিলচন্দ্র ঘোষ ❑ ৩৫৲
কর্মবাণী— জগদীশচন্দ্র ঘোষ ❑ ৫০৲
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা — জগদীশচন্দ্র ঘোষ ❑ ৬০৲
চাণক্য শ্লোক—জগদীশচন্দ্র ঘোষ ❑ ১৫৲
ভারত আত্মার বাণী —জগদীশচন্দ্র ঘোষ ❑ ১৪৫৲
Soul of India Speaks–Jagadish Ch. Ghosh
শ্রী শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী — রমেশচন্দ্র সরকার ❑ ১০০৲
আমাদের নবী — কবি বজলুর রশীদ ❑ ৩৫৲
কারবালা কাহিনী — কবি বজলুর রশীদ ❑ ৩৫৲
চার খলিফা — কবি বজলুর রসীদ ❑ ৩৫৲

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের
সুবিখ্যাত গীতা-গ্রন্থমালা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবত ধর্ম— ❑ ১৩০৲
শ্রীগীতা — (রাজসংস্করণ) ❑ ৩২০৲
শ্রীগীতা — বৃহৎ ❑ ২৩০৲, শ্রীগীতা — সংক্ষিপ্ত ❑ ১৩০৲
বৃহৎ পকেট গীতা (মূল ও অনুবাদ) ❑ ৬০৲
ও গীতার অন্যান্য ছোট সংস্করণ

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ফোন ঃ ২২৪১-৬১৩৮
E-mail : presidencylibrary@gmail.com

বাদুড় কেন নিশাচর

দেবাশিস সেন

বাদুড় সেদিন ভোরবেলা হাজির ভগবানের কাছে। ভগবান তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। ভালো করে মুখ হাতও ধোয়া হয়নি। বাদুড়কে দেখে বললেন, "কি ব্যাপার? এই সাত সকালে?"

বাদুড় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "প্রভু, কোন অপরাধে আমাকে এই কঠিন শাস্তি দিয়েছেন?"

ভগবান বেজায় অবাক হয়ে বললেন, "সেকি! তোমাকে আবার কবে শাস্তি দিলাম?"

"শাস্তি নয়তো কি?" করুণ মুখ করে বাদুড় বলল, "অন্য পাখিদের শরীর কি সুন্দর পালকে ঢাকা। ময়ূর কি দারুণ পেখম মেলে। ম্যাকাও এর শরীরে কত রং। মাছরাঙ্গারও কি বাহার। এক রঙ্গা পাখিদের রংটাও কি উজ্জ্বল। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ.....দুনিয়ার সব রং আপনি দিয়েছেন পাখিদের। আর আমার শরীরে আপনি কোন পালকই দেননি। এই অবিচার কেন প্রভু?"

"ওহ, এই ব্যাপার।" আশ্বস্ত হয়ে মুচকি হেসে ভগবান বললেন, "শোন বাপু। তুমি তো আর পাখি নও। উড়তে পারলেই তো আর পাখি হওয়া যায় না। তাহলে তো আরশোলাকেও সবাই পাখি বলবে!"

"কিন্তু প্রভু", বাদুড়ের স্বর এবার আরো করুণ, "পালক নেই বলে শীতকালে যে আমার কি কষ্ট হয় কি বলব। গত শীতটা কোনরকমে পার করেছি। আগামী শীতে আর বাঁচব বলে মনে হয় না।"

"ষাট, ষাট।" বিব্রত স্বরে বললেন ভগবান। দয়ার শরীর তাঁর। একটু ভেবে তিনি আশ্বাস দিলেন বাদুড়কে, "তুমি ফিরে যাও পৃথিবীতে। আমি দেখছি কি ব্যবস্থা করা যায়।"

সেদিনই পৃথিবীতে এসে সব পাখিদের ডেকে পাঠালেন ভগবান। সবাই হাজির হতে তিনি বললেন, "তোমাদের বন্ধু বাদুড়ের শরীরে আমি কোন পালক দিইনি। আমি ভেবেছিলাম ওর শরীরে যে চামড়াটা রয়েছে সেটাই শীতের কামড় আটকানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বাদুড় বলল গত শীতে নাকি ওর বেজায় কষ্ট হয়েছে। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট

অনুরোধ করছি। তোমরা যদি তোমাদের শরীর থেকে মাত্র একটা পালক ওকে দাও তাহলে বেচারা আগামী শীতে শরীরটা গরম রাখতে পারবে।"

"নিশ্চয় দেব।" এই বলে পৃথিবীর সব পাখি ওদের একটা পালক এনে দিল ভগবানকে। ভগবানও সেই পালক দিয়ে সাজিয়ে দিলেন বাদুড়কে।

বাদুড়কে সাজিয়ে দিয়ে ভগবান স্বর্গে ফিরে গেলেন। আর নতুন চেহারার বাদুড়কে দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর সব মানুষ, পশু, পাখি একবাক্যে স্বীকার করে নিল বাদুড়ের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই।

নানান রং-এর পালকে মোড়া বাদুড় যখন আকাশে উড়ে বেড়াত তখন মনে হত আকাশে যেন রামধনু দেখা দিয়েছে। নীল আকাশে যেন রামধনু উড়ে বেড়াচ্ছে। ওহ্, আসল কথাটাতো বলতে ভুলেই গিয়েছি। বাদুড় কিন্তু তখন নিশাচর ছিল না। ও তখন দিনের বেলাতেই আকাশে উড়ে বেড়াত।

নতুন চেহারা পেয়ে বাদুড় বেজায় খুশি। ও যেখানে যায় সবাই ওর চেহারার প্রশংসা করে। এতো প্রশংসা শুনতে শুনতে ও হয়ে উঠল বড্ড অহংকারী। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই শোনাতে বসে কে কবে ওর রূপের প্রশংসা করেছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে বাদুড় অন্য পাখিদেরও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করল। কাককে একদিন ডেকে বলল, "তুমি এতো কালো, তোমার দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।" ছাতারেরা সাত ভাই একটা বাগানে এসে সবে নেমেছে। বাদুড় বলল, "ইস্স্। তোদের চেহারাটা এমন ফ্যাকাশে কেন রে?" উটপাখিকে একদিন বলল, "শুকনো জায়গায় থাকেন ভালোই করেন। জলে নিজের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করবেন না। ভিরমি খেতে পারেন।"

যতো দিন যেতে লাগল বাদুড়ের আচরণে সব পাখিরা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল। শেষে বাধ্য হয়ে পাখিরা দল বেঁধে ভগবানের কাছে নালিশ করতে গেল। ভগবান সব শুনে বেজায় অবাক হলেন। তারপর পাখিদের বললেন যে তিনি আজই পৃথিবীতে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন।

পৃথিবীতে এসে ভগবান দেখলেন পাখিদের অভিযোগ সত্যি। খুব রাগ হল তাঁর। বাদুড়ের সামনে হাজির হয়ে বললেন, 'সব পাখিরা অভিযোগ করছে যে তুমি নাকি খুব অহংকারী হয়ে গেছ।"

চোখ কপালে তুলে বাদুড় বলল, "সব মিথ্যে কথা প্রভু। ওরা আসলে আমাকে হিংসে করে তাই ওসব আপনাকে বলেছে।"

মাথা নেড়ে ভগবান বলেলন, "হবে হয়তো। যাক তুমি কেমন ওড় সেটা দেখাওতো। শুনেছি তুমি উড়লে নাকি আকাশে রামধনু তৈরি হয়।"

বেজায় খুশি হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ল বাদুড়। কিন্তু কি আশ্চর্য! এক এক করে ওর সব পালক খসে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পালক পড়ে গিয়ে ও ফিরে গেল আবার আগের চেহারায়। নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় চোখ বন্ধ করল বাদুড়।

চারপাশে বিশাল হাসির আওয়াজে চোখ খুলে বাদুড় দেখল ওর চারপাশে উড়ছে রাজ্যের যত পাখি আর সবাই ওর চেহারা দেখে হাসছে।

লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে বাদুড় গিয়ে লুকলো এক অন্ধকার গুহায়। সেদিনের পর থেকে ও আর দিনের বেলায় গুহা থেকে বেরুতই না। সূর্য ডুবলে, অন্ধকার ঘনিয়ে এলে খাবারের সন্ধানে বেরুত। সেই সঙ্গে খুঁজতো সেই সব ঝলমলে পালকগুলিকে।

সেই পালক ও আজও খুঁজে পায়নি আর তার জন্যই বাদুড় আজও নিশাচর।

(মেক্সিকোর ওয়াক্সাকা প্রদেশের উপকথা অবলম্বনে)

ছবি ঃ সুদীপ্ত দত্ত

আগুনের গোলার মত লাল সূর্যটা ডুবে যেতেই খোকাচাঁদের খেয়াল হল সন্ধ্যে হয়েছে। এখন আলো চাই। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে পা ঝুলিয়ে বসল। তার পিছনে অন্ধকার, সামনের দিকে রূপোলী আলো। সেই আলোয় খোকা চাঁদ চারদিক দেখছিল। চাঁদের মা ঘরের মধ্যে নতুন ঘুমপাড়ানী গানে সুর দিচ্ছিল। খোকা চাঁদ চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, "মা দূরে ওটা গোলমত কি দেখা যাচ্ছে?"

চাঁদের মা বলল, "দূর বোকা! গোল মত ওটা তো পৃথিবী।" শুনে খোকা চাঁদ আবদার শুরু করল, "মা, আমি ওখানে যাব। ওখানে কি সব কিলবিল করছে দেখতে পাচ্ছি। কত রঙ, কত আলো ওখানে।"

চাঁদের মা বলল, "নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ওখানে যাবি কেন?"

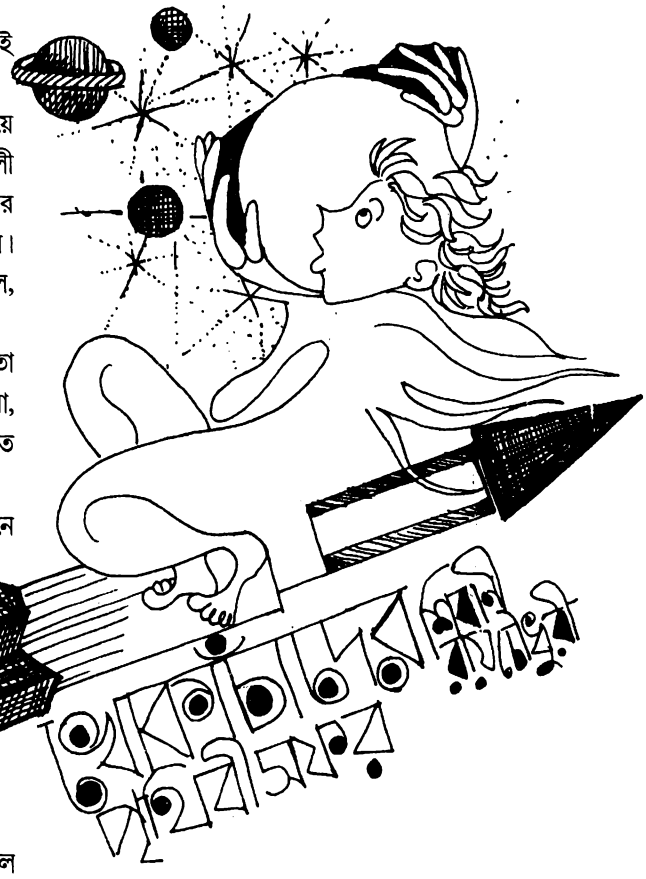

খোকা চাঁদ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিল, "আমাদের এখানে শুধু পাহাড় আর ধূলো। সব সাদা ফ্যাকাসে, সব কিছু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা! আমার এখানে একটুও ভাল লাগে না। আমি রঙ চাই। আলো চাই, জল চাই, রোদ্দর চাই।

চাঁদের মা খোকা চাঁদকে বোঝাতে লাগল, "তুই ছেলে মানুষ, অতদূরে একা একা যাবি কি করে? মহাশূন্যে হারিয়ে গেলে রাস্তা চিনে বাড়ি ফিরবি কি করে?"

খোকা চাঁদ কোন কথাই শুনছিল না। এবার চাঁদের মা ভয় দেখাল, "মহাশূন্যে একটা বদ্‌মেজাজি ধূমকেতু ঘুরপাক খাচ্ছে। তোকে ধরে নেবে।"

খোকা চাঁদ একটু ঘাবড়ালো না, বলল, "আমি স্পেস শাট্‌লে চড়ে বনবন করে পৃথিবীতে চলে যাব। ধূমকেতু আমাকে ধরতেই পারবে না।"

সেদিন রাত্তিরে খোকা চাঁদের চোখে ঘুম নেই। সে দেখছিল পৃথিবী থেকে কোন স্পেস শাট্‌ল আসছে কি না। একটা ছোট রকেট জানলার পাশ দিয়ে চলে গেল। খোকা চাঁদ তাকে পাত্তা দিল না। একটু অপেক্ষা করার পর একটা স্পেস শাট্‌ল দেখতে পেল। শাট্‌লটা খুব জোরে আসছিল। তাই আচমকা চাঁদের গায়ে ধাক্কা খেল। সেই সুযোগে খোকা চাঁদ তড়াক করে লাফ দিয়ে শাট্‌লে উঠে বসল।

স্পেস শাট্‌লটা পৃথিবীর দিকে ফিরে যাচ্ছিল। খোকা চাঁদ দূর থেকে দেখতে পেল সেই গোল জিনিষটার অনেকটাই নীল। খোকা চাঁদ জীবনে এই প্রথম জল দেখতে পেল। তারপর মহাশূন্যে লাফাতে লাফাতে একটা বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা এসে পড়ল পৃথিবীতে।

পৃথিবীতে তখন গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। খোচা চাঁদ, তার টিম্‌টিমে রূপোলী আলোয় দেখতে পেল যে সে একটা লম্বা গাছের মাথায় আটকে গেছে। নিচে মাটিতে পাতার খস্‌খসানি শুনতে পেল। লম্বা পেটমোটা একটা জন্তু লতাপাতার মধ্যে সরসর করে চলে গেল। বড় গাছের ডালে উল্টো হয়ে ডানাওয়ালা কিসব ঝুলছিল। তাদের ড্যাবা ড্যাবা চোখ যেন গগলস পরেছে। একটু দূরে গাছের পাতার মধ্যে গোল থ্যাব্‌ড়ামুখো একটা পাখি ডানা ঝটপট করছিল। অন্ধকারে তার চোখে সবুজ আলো! সে মাঝে মাঝে ডাকছিল "হুতুম! হুতুম!" নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ছুঁচোলো মুখওয়ালা একদল পাখি গুনগুন করে গান গাইছে। সব মিলিয়ে অন্ধকারে দারুণ হট্টগোল! এসব দেখেশুনে খোকা চাঁদের ভীষণ ভয় করছিল। ওর মার জন্যে মন কেমন করতে লাগল। ভাবছিল মার কথা না শুনে ভাল করেনি। ভয়ে ক্লান্তিতে খোকা চাঁদ গাছের ডালে দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের আলো ফোটারআগেই চি-চি, কা-কা, ভোঁ-ভোঁ, ফুট-ফাট্ শব্দে খোকা চাঁদের ঘুম ছুটে গেল। তাকিয়ে দেখে দূরে আকাশের গায়ে হলুদ আর কমলা রঙের বাহার—খোকা চাঁদ বুঝল পৃথিবীতে সকাল হয়েছে। চারদিকে সোনালী আলো আর হাল্কা রোদ। এর জন্যেই

সে এতদিন অপেক্ষা করেছিল। আলোটা আরো জোরালো হল, রোদের তেজ বাড়ল। খোকা চাঁদ নিজেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সে যেন আকাশে মিশে গেছে। এমন সময় শুনতে পেল সেই স্পেস শাটলটা যাতে করে ও এসেছিল সেটা বোঁ বোঁ করে মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর শুনতে পেল শাট্‌লটার ভেতর থেকে কে যেন বলছে,

"খোকন চাঁদ, এই গাছের ডালে ঝুলে থাকলে কি করে পৃথিবী দেখবে? চট্ করে এই হট-এয়ার বেলুনটাতে উঠে পড় দেখি। সব ঘুরে দেখিয়ে দেবে।"

খোকা চাঁদ যখন গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে বেলুনে উঠতে যাবে তখন দেখতে পেল গাছের নিচের ডালে একটা কমলা রঙের লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি। পাখিটা তার বিশাল ঠোঁট দিয়ে একটা বড় কাঁটাওয়ালা ফল ঠুকরে ঠুক্‌রে খাচ্ছে। ফলের গন্ধে চারদিক ম ম করছে। মৌমাছি নীল বোতল মাছি, বোলতা পাখিটাকে ঘিরে ভন্ ভন্ করছে। হট্-এয়ার বেলুনটার মধ্যে একটা রেকর্ড চলছিল। একটা রেকর্ড করা গলা বলে উঠল, "এই পাখিটার নাম টুকান। ওর ছোট বোন মাছরাঙা বাংলাদেশে থাকে।" তারপর খোকা চাঁদ শুনতে পেল, "আমরা এখন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে—আমাজনের জঙ্গলে।"

খোকা চাঁদ বলল, "কি ভ্যাপসা গরম! গরমে আমি গলে যাচ্ছি। আমার গা থেকে ঘাম ঝরছে।"

শুনে রেকর্ড করা গলাটা কিছুই বলল না। খোকা চাঁদ জিজ্ঞেস করল, "কখন বাড়ি ফিরব?" কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

একটু পরে রেকর্ডটা আবার বাজতে শুরু করল, "দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক দেখার জিনিষ আছে। দিন সাতেক লাগবে।"

শুনে খোকা চাঁদ প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, "সাতদিন! সে তো এক সপ্তাহ। আমার তো আজ রাত্তিরেই ফেরার কথা। আমি বাড়ি না ফিরলে মা খুব চিন্তা করবে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! হট-এয়ার বেলুন খোকা চাঁদকে নিয়ে উড়ে চলল। সেই রেকর্ড-করা গলাটা রোজ কোথায় কি দেখা যাচ্ছে বলে যাচ্ছিল। খোকাচাঁদ বেলুন থেকে সব দেখছিল।

আজ সোমবার

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ ছ-হাজার চারশো কিলোমিটার লম্বা আমাজন নদী। জলে পড়লে রক্ষে নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপ এ্যানাকুণ্ডা এই নদীতে দেখা যায়। এরা অনায়াসে একটা আস্ত হরিণ গিলে খেতে পারে। করাতের মত ধারাল দাঁতওয়ালা পিরানহা মাছও এখানে মনের সুখে সাঁতার কাটে। মাছগুলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা বড় জন্তুকে দাঁতে কেটে ছিঁড়ে খুঁড়ে তার হাড়-পাঁজর বের করে দিতে পারে। আর আছে ইলেকট্রিক ইল মাছ—এরা ইলেকট্রিকশক দিয়ে জীবজন্তু শিকার করে। বড় বড় কুমীরও আছে আমাজন নদীতে। কুমীরের ভয়ে কেউ নদীর ধারে যেতে সাহস পায় না। নদীর ধারে বিশাল বিশাল গাছের সারি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেন ফরেস্ট এখানে।

মঙ্গলবার

ভেনেজুয়েলায় পৌঁছে গেলাম। দেখ, দেখ, ন'শো উনআশি মিটার উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে জল ঝরচে। এঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত!

বুধবার

আমরা এখন গালপাগোস দ্বীপপুঞ্জে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডোরের এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিম। জায়গাটা অদ্ভুতসব জীবজন্তুর জন্যে বিখ্যাত। এদের পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। একটা দৈত্যের মত কচ্ছপ থপ থপ করে হাঁটছে। একপাল টিকটিকি পোকামাকড় ফেলে সমুদ্রের লতাপাতা খাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার

এখন আমরা এলাম পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা পর্বতমালা এ্যান্ডিসে। এ্যান্ডিস পর্বতমালা দেখতে দেখতে চল যাই টিটিকাকা হ্রদে। পৃথিবীর এত উঁচুতে আর কোন হ্রদ নেই। হ্রদে নলখাগরায় ভরা অনেক দ্বীপ। দ্বীপের লোকদের বলে উরু। এরা হ্রদে নৌকো বেয়ে দিন কাটায়।

শুক্রবার

আমরা দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছি। টিটিকাকা হ্রদ পিছনে ফেলে আমরা এখন আটাকামা মরুভূমিতে। মরুভূমিটা প্রশান্ত মহাসাগর আর চিলির পশ্চিমতীরের মধ্যে আটকে আছে। মরুভূমিটা মহাসাগরের গায়ে লেগে থাকলে কি হবে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো জায়গা। এখানে কয়েকশো বছর বৃষ্টি হয়নি। মরুভূমিটা দেখলে জল তেষ্টা পায়!

শনিবার

আমরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপে এসেছি। ইস্টার দ্বীপে পাহাড়ের মত বিশাল বিশাল আটশো-সাতাশিটা মূর্ত্তি ছড়িয়ে আছে। মূর্ত্তিগুলোর মাথা তাদের দেহের থেকে অনেক বড়। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে যখন লোক ইস্টার দ্বীপে বাস করতে এসেছিল, তখন তারা এক একটা বড় পাথর খোদাই করে মূর্ত্তিগুলো তৈরি করে। মূর্ত্তিগুলো তাদের

পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি। এ হল বারোশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো সালের কথা।

মূর্ত্তিগুলো দেখে খোকাচাঁদের ভয়ে গা ছম্ ছম্ করছিল। রেকর্ডের গলাটা এক নিশ্বাসে এত কথা বলে একটু দম নিল।

তারপর বলল ঃ

এবার আমরা যাব আরজেনটিনায়। যেখানে এ্যান্ডিস পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় একটা প্রাণহীন আগ্নেয়গিরি আছে। আমরা সেটা দেখব।

তুষার ঝড় আর কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে খোকা চাঁদ প্রাণহীন একনকাগুয়া আগ্নেয়গিরি দেখল।

রবিবার

আজ সকালে কি সুন্দর ঝলমলে রোদ উঠেছে। আমরা আরজেনটিনার দিগন্তজোড়া সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ পম্পাসে। এখানে গম, রাই আর বরবটির চাষ হচ্ছে। গরু, ভেড়া চড়ছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

এরপর চল দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে দক্ষিণ টিয়েরা দেল ফুয়েগোতে। টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর মানে হল আগুনের দেশ। আসলে এখানে আগুনের দেখা নেই। জায়গাটা খুব ভিজে স্যাঁতসেঁতে। বড় বড় বরফের চাঁই পাহাড় থেকে নেমে আসছে। এটাই দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্ত।

খোকা চাঁদ চুপ করে সব দেখছিল। হঠাৎ শুনতে পেল রের্কড করা গলাটা বলছে, "দক্ষিণ আমেরিকা দেখা এখানেই শেষ হল। পৃথিবীর অন্য সব জায়গা পরে দেখাব। এখন তোমার বাড়ি ফিরে যেতে হবে।"

খোকা চাঁদ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আর কিছু সে দেখতে চায় না। এবার সে শুনতে পেল : "সাতদিন ঘুরে ঘুরে বেলুনের হাওয়া ফুরিয়ে আসছে। আমারও ব্যাটারি শেষ হয়ে যেতে পারে। তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে আমাদের ছুটি।"

তারপর হট-এয়ার বেলুনকে বলল, "উত্তর দিকে উড়ে যাও। আমেরিকা থেকে অনেক স্পেস শাট্‌ল আর স্পেসশিপ যায়। তাদের একটাতে খোকাকে তুলে দিও।"

হট-এয়ার বেলুন ফড্‌ফড্ করে ওপরে উঠতে লাগল। খোকা চাঁদ ভয় পাচ্ছিল যদি বাড়ি ফিরতে না পারে। চাঁদের মা বলছিল মহাশূন্যে হারিয়ে গেলে সে বাড়ি চিনে আসতে পারবে না।

খোকা চাঁদের কপাল ভাল। হট-এয়ার বেলুন তাকে একটা স্পেস শাট্‌লে তুলে দিল।

সোমবার

খুব ভোরে সূর্য ওঠার অনেক আগেই খোকা চাঁদ বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসে নিজের দেশটা আর সাদা, ফ্যাকাসে আর ঠান্ডা মনে হল না।

সে চাঁদের মাকে বলল, "মা, কি সুন্দর শান্ত আমাদের বাড়ি! ঝিকিমিকি আলো। কোন হৈ-হট্টগোল নেই। কিচির-মিচির, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর আর হিস্-হিস্ নেই। সাপ-খোপ, কুমীর নেই।"

চাঁদের মা তো শুনে অবাক! এই তো ক'দিন আগে খোকা চাঁদের এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না। খোকা চাঁদকে জিজ্ঞেস করল, "সাতদিন কোথায় ছিলি? আমি তো ভেবে ভেবে অস্থির।"

খোকা চাঁদ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, "দক্ষিণ আমেরিকায়।"

চাঁদের মা জানতে চাইল, "সে আবার কোথায়?"

খোকা চাঁদ বলল, 'পৃথিবীতে।"

ছবি ঃ নীতিশ মুখোপাধ্যায়

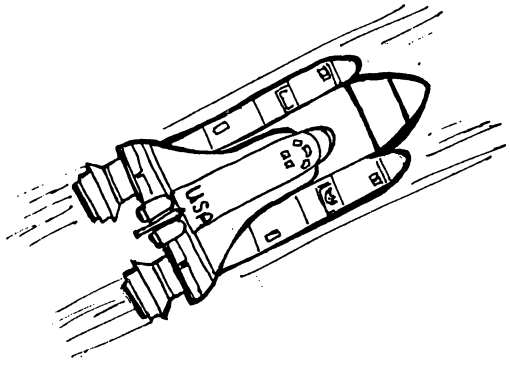

একালের রূপকথা

অরুণিমা রায়চৌধুরী

ডালিমকুমার, লালকমল, কি নীলকমলেরা
ঠাকুমার বলা গল্পের পথ ধরে ধরে আজ
শুনশান পথে আর ছোটায় না সে পক্ষিরাজ।
ডানা-টানা সব গিয়েছে চুলোয়,
আস্তাবলে সে শুধুই ঝিমোয়,
নাকে তেল দিয়ে মজাসে ঘুমোয় সব সহিসেরা।

বর দিতে টিতে জ্যোৎস্নাপরী কি ফুলপরীরাও
আসেনাতো কেউ! রকেটে চড়ে কি তারাও উধাও?
ডাইনী বুড়িকে ফুটপাথ-ঘেঁষা দেয়ালের গায়
মাঝে মাঝে দেখি সমানে ঘুঁটের চাপ্‌টি লাগায়।
মনে তো হয় না কস্মিন্‌কালে শাপ-টাপ দিতে
জানতো বলে ও, একমাথা শুধু শণের নুড়িতে
ডাইনীর সাজে সেজে আছে। আর নাপিত ভায়ারা
নয়া কায়দার ছাঁট দিতে দিতে সব দিশেহারা।

ডালিমকুমার, লালকমল, কি নীলকমলেরা
কচি কচি হাতে ইঁদুর ছানাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে
দারুণ ব্যস্ত কম্পিউটারে দুচোখ লাগিয়ে।
সমান তালেই ঘুমটুম ফেলে
উঃ কী কঠিন আঁক অবহেলে
কষে যায় দেখি কাঞ্চনমালা রাজকন্যেরা।
অফিসে কলেজে ইসকুলে নানা অকাজের ফাঁকে,
ঠাকুমারও দেখি মনেই পড়ে না শেয়াল ভায়াকে।
শুধু মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়ে যায়,
নির্জন পথে সে পক্ষিরাজ ডানা ঝাপটায়।

জলছবি

দেবাশিস্ বসু

এক যে ছিল দারুণ মানুষ
বিজ্ঞানী নন, ভাবুক তো
কথায় কথায় ছড়িয়ে দেন
খাঁটি সোনা বা মুক্তো!

মুক্তো না ঠিক, এক মুঠো রোদ
টাপুর-টুপুর ভোর যেন,
আঁকছি আকাশ জলছবি-রঙ
মিষ্টি মধুর ঘোর যেন!

পাচ্ছি সুবাস সন্ধ্যামণির
লাল দোপাটির ফুল কিনা,
হাতের মুঠোয় আলপনা-রঙ
রঙবাহারি উলকি না!

জল থই থই রূপসা নদী
রূপকথা-মন ভরায় যে,
ছবির দেশে মেঘের বেশে
মাতলো এ মন ছড়ায় যে!

পাতার বাঁশি

সুনির্মল চক্রবর্তী

নেই ছেলেটার পিসি মাসি,
আছে কেবল পাতার বাঁশি।

পাতার বাঁশি বাজছে সুরে,
সামনে-দূরে সামনে-দূরে।

উঠোনজুড়ে হাঁসের মেলা,
হাজার খেলা হাজার খেলা।

ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
বাজাও ছেলে পাতার বাঁশি।

পাতার বাঁশি গানের সুরে,
পাগল করে দিন দুপুরে।

নৌকোখানা যায় যে ভেসে,
চলল কারা নিরুদ্দেশে।

জমজমাটি মায়ের হাসি,
বাজাও সুরে পাতার বাঁশি।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

১৮৫৪ ব্যারাকপুরের 'গোরা' সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে বাঙালি এই খেলাকে আপন করে নিতে চেয়েছিল। ফলে কলকাতা ও শহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত হল ফুটবল খেলার অনেক ক্লাব। ইতিহাসে অনেককিছুই বাদ পড়ে বলে শুধু থেকে গেল ১৮৮৫ সালে কুমার দিবেন্দুকৃষ্ণ দেব'এর প্রতিষ্ঠিত 'শোভাবাজার ক্লাব' এর নাম।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে—শহরতলী কিংবা মফঃস্বলের অনেক ফুটবল ক্লাব ও তাদের খেলোয়াড়'দের কথা চিরদিনই আমাদের অজানা থেকে যাবে। ভারতের ফুটবলের সেই আদি যুগে হাওড়া জেলার বালিতে ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বালি ওয়েলিংটন ক্লাব (এখন বালি এ্যাথ্‌লেটিক ক্লাব)।

১৮৯২ সালে শোভাবাজার ক্লাব'এর ম্যালেরিয়া রোগে ভোগা ক্ষীণদেহের 'ভেতো' বাঙালিবাবুর দল ফুটবল খেলার যে দিন হারিয়ে দিল সেদিন থেকেই 'ফুটবল' হয়ে গেল বাঙালির খেলা। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগান দল ইস্ট ইয়র্ক' দলকে হারিয়ে শীল্ড জয়ের দিন থেকেই বাঙালির হৃদয়ে স্থান করে নিল সব খেলার সেরা ফুটবল। বিদেশি 'ফুটবল' খেলা হয়ে যায় স্বদেশি বাঙালির জাতীয়তাবোধ, স্বদেশিকতাও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্য এক রঙ্গমঞ্চ।

শীল্ড বিজয়ের ১৭১ দিন আগে অর্থাই ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১১' জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্রীড়ানুরাগী মন্মথনাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র। ডাক নামেই যিনি বাংলা ফুটবল জগতে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। স্বগ্রাম হুগলী জেলার 'দশঘড়া' থেকে তাঁদের পরিবার বালিতে চলে আসে। তখন শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্রের বয়স মাত্র দশ। কিন্তু ওই বয়সেই তাঁর ফুটবল খেলার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে বালির অতীত যুগের বিখ্যাত ক্রিড়াবিদ্ রাধানাথ (রাজা) বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বালি ওয়েলিংটন ক্লাবে নিয়ে আসেন। শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্রের ফুটবল জীবন শুরু হয় বালিরই অন্য এক বিশিষ্ট খেলোয়াড় প্রয়াত কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১৯৯৪) এর সাহচর্যে ও অনুশীলনে। কার্তিকচন্দ্রর শিক্ষাধীনে ল্যাংচা মিত্র ক্রমেই একজন পরিণত খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন।

বালি ওয়েলিংটন ক্লাব' এ নিজের ক্রীড়া দক্ষতার সুবাদে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি হাওড়া ইউনিয়ন দলে ইন-সাইড ফরোয়ার্ড হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে জুনিয়ার ইন্টার ন্যাশনাল ফুটবল খেলায় তিনি ভারতীয় দলে সুযোগ পান। ১৯৩৪ সালে ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে 'সিনিয়র' আন্তর্জাতিক ফুটবল দলের অন্যতম একজন খেলোয়াড়'এর ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য ফুটবলের দর্শক ও বোদ্ধাদের মুগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতীয় দলে একজন অপরিহার্য খেলোয়াড় রূপে বিবেচিত হতে থাকেন। ১৯৩৭ সালে বর্মা (এখন মায়নমার)'র ফুটবল একাদশ দলের বিরুদ্ধে ও ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত অপেশাদার দল ইজলিংটন কোরিন্থিয়ান এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ নেন। এই সময়ে (১৯৩৫-১৯৩৮) ভবানীপুর ক্লাবে তাঁর খেলার কথা লিখেছিলেন—'আরবি' (রাখাল ভট্টাচার্য) কলকাতার ফুটবল বইয়ে; তিনি লিখেছেন—"পুরানো যুগে ভবানীপুরের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন ফণী মিত্র, বুনো মিত্র ও থাকো মিত্র। তারপরেও যারা নাম করেন, তাদের মধ্যে ল্যাংচা মিত্র, নরেন ব্যানার্জী ও মানা গুঁই।"

হকির যাদু ধ্যানচাঁদের সঙ্গে

১৯৩৯-৪১ মোহনবাগানে যোগদানের পর উত্তরপাড়ার তাঁরই সতীর্থ বিমল মুখার্জীর সঙ্গে তিনি, মোহনবাগানের প্রথম লীগ জয়ের স্বাদ এনে দেন। ১৯৪১ সালে মোহনবাগানের হয়ে এরিয়ান্স দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় এক মারাত্মক আঘাতে শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র'র ফুটবল খেলা শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক সমর ব্যানার্জী (বদ্রু) তাঁর স্মৃতিচারণায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন—"তাঁর আঘাতের পরিণতির খবর শুনে সারা বালি শোকস্তব্ধ ও নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়"—আরও

গুরু কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

বলেছিলেন, অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক রূপে নির্বাচিত হয়ে সেই খবর নিয়ে বালি পৌঁছতে বেশ রাত্রি হয়ে যায়। তিনি নিজের বাড়ি না গিয়ে সোজা শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র'র বাড়ি গিয়ে তাঁকে খবর দিতে গিয়ে দেখেন, বদ্রু'র প্রতীক্ষায় তিনি তখন বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করছেন।

খেলোয়াড়ী জীবন শেষ হয়ে গেলেও শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র ফুটবল নিয়েই বেঁচে থাকতেন, ফুটবলই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। 'রাজকুমারী অমৃত কাউর স্কীমে' ফুটবলের প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি সারাভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তের বিভিন্ন রাজ্যদলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। স্ব-গ্রাম বালি প্রতিভা ছাড়াও তিনি ইস্টবেঙ্গল, ওয়াড়ি, জর্জ টেলিগ্রাফ, বাটা প্রভৃতি দলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর প্রশিক্ষক জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল ১৯৬৬ সালে ভারতীয় দলের তৃতীয় স্থান লাভ করা; এবং ১৯৭৫ সালে সন্তোষ ট্রফি তে বাংলা দলকে চ্যাম্পিয়ন করা। তাঁর ফুটবল শিক্ষায় কৃতী ফুটলারদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন—সর্বশ্রী সমর ব্যানার্জী (বদ্রু), সমর কুমার, সুব্রত ভট্টাচার্য, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুধীর কর্মকার, দিলীপ পাল প্রমুখ ও প্রয়াত নীলেশ সরকার। তাঁদের সকলের স্মৃতিতে 'ল্যাংচা' মিত্র-অমর হয়ে আছেন।

ফুটবল সংক্রান্ত আইন আধুনিকীকরণে তাঁর চিন্তাভাবনা ও লেখা ও বিভিন্ন প্রস্তাব—'ফিফা' যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন বলে তাঁকে জানিয়েও ছিলেন, ফুটবলে চিন্তা ভাবনার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা তাঁকে 'ফিফা' ব্যাচ ও স্মারক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় অলিম্পিয়ান তুলসীদাস বলরামন্ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তীব্র শারীরিক কষ্টের মধ্যেও নিজের শরীরের কথা বাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে শুধু ফুটবল নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন; বলরামন্ বলেছিলেন, ভারতীয় ফুটবল কর্তারা যদি তাঁকে সুযোগ দিতেন তবে তিনিও রহিমস্যারের মত ভারতীয় ফুটবলে তাঁর স্থায়ী অবদান রেখে যেতেন। সেই সুযোগ তাঁকে না দেওয়াটা ভারতীয় ফুটবলকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে। প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক শ্রীঅমল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তিনি শুধুমাত্র 'ল্যাংচাদা'র কথাতেই উৎসাহিত হয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণে এসেছিলেন।

শীল্ড জয়ের ঘটনার মত তাঁর জন্মশতবর্ষেও কলকাতা ফুটবল লীগের চতুর্থ ডিভিশনে নেমে যাওয়া বালি প্রতিভা ক্লাব বিগত তিন বছরে একাধিক্রমে তিন বছরেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ক্লাব বালি এ্যাথ্‌লেটিক ক্লাব, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার, বালি নবীন সংঘ, বালি দেশবন্ধু ক্লাব, বালি দক্ষিণপাড়া সম্মিলনী, অনিলসামন্ত ফুটবল কোচিং সেন্টার এঁরা প্রত্যেকেই এগিয়ে এসেছেন ফুটবলের এক শিল্পী শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র'র জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপনে। আমাদের আশা এঁদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ—শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্রের জন্মশতবর্ষ পালন ফুটবলের প্রতি বাঙালির নিখাদ ভালবাসা আবার ফিরিয়ে আনবে।

বন্ধু রেবতীভূষণ ঘোষের তুলিতে

ছোটরাজার পোষ্য

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ফোয়ারাপুকুরের পাশের ছোট ঘরটাকে সবাই জলটুঙ্গিই বলত। পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও ওই মার্বেলের ফোয়ারার মুখ থেকে দুধের ফেনার মতন জল উথলে উঠতে দেখেছেন ছোটরাজা জিতসুন্দর মহাবল। পাথরের লতাপাতার গা বেয়ে সেই জল এসে পড়ত ফোয়ারাপুকুরে।

জলটুঙ্গির শীতল ছায়ায় বসে জিতসুন্দরের বাবা মহারাজা শ্যামসুন্দর মহাবল আর মহারানী করুণাময়ী গ্রীষ্মের বিকেল কাটাতেন। তবে সে আরো আগের ঘটনা। তখন মোহনপুরের রাজা ছিলেন সত্যিকারের মহারাজা। তারপর তো ভারত স্বাধীন হল। মোহনপুরের মতন ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলো ভারতের সঙ্গে মিশে গেল। ব্যস, রাজাগিরি শেষ। রাজা বা রানী কেউই তারপর আর বেশিদিন বাঁছেননি।

জিতসুন্দর ওই জলটুঙ্গিতে একা একা বসে দেখতেন ফোয়ারা থেকে কেমন জল ঝরে যাচ্ছে। ততদিনে দুধসাদা মার্বেল হলুদ হয়ে এসেছে। ফোয়ারা পুকুরের স্বচ্ছ জলে গুঁড়ি গুঁড়ি কচুরিপানার সবুজ আস্তরণ।

তারপর একদিন ফোয়ারা থেকে জল পড়াও বন্ধ হয়ে গেল।

তবে পাথরের তৈরি জলটুঙ্গি, পাথরের টালি দিয়ে বাঁধানো ফোয়ারাপুকুর আর পাথরের লতাপাতার মোড়া ফোয়ারা,- এগুলো সব রয়ে গেল। রয়ে গেলেন মোহনপুরের বিশাল রাজবাড়িতে একা যুবরাজ জিতসুন্দর। রাজত্ব নেই বলে যার আর কোনোদিনই বড়রাজা হওয়া হল না; চিরকাল ছোটরাজা হয়েই রয়ে গেলেন। আজ এই আশি বছর বয়সেও তিনি মোহনপুরের মানুষের কাছে ছোটরাজা।

অবশ্য মাঝের এই বছরগুলোতে জিতসুন্দর একা ছিলেন বলাটা বড় ভুল। মানুষ সঙ্গী ছিল না ঠিকই, কিন্তু সঙ্গী ছিল তার পোষ্যবা। অনেকদিন অবধি তারা ছিল। যতদিন কেনবার সামর্থ্য ছিল তাদের কিনেছেন, যতদিন তাদের খাওয়ানোর সামর্থ্য ছিল খাইয়েছেন। সেই কোন ছোটবেলার নেশা, - জংলি জীব পোষা। সহজে ছাড়া যায় কি?

এখনো আছে কয়েকজন,তবে তারা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। দেখাশোনাও বিশেষ করতে হয় না। তারা অনেক স্বাবলম্বী।

* * *

আজকেও তো, ওই লোকদুটো তাকে ধাক্কা মেরে জলটুঙ্গির মধ্যে ঢুকিয়ে যখন দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল তখন ওদের মধ্যে একজন বেশ ব্যঙ্গের সুরেই জিজ্ঞেস করছিল, 'কি ছোটরাজা, এখন আর কিছু পষছ টুষছ না? সাপ? কাঁকড়া বিছে চিতাবাঘ?'

আরেকজন তাই শুনে বলল,' বাপস্! ছোটবেলায় কি ভয়ই না পেতাম এদিকটায় আসতে। রাতের বেলায় আমাদের বস্তি থেকেও শোনা যেত নানারকম জন্তুজানোয়ারের চীৎকার। আজব নেশা ছিল বটে ছোটরাজার। 'তারপর লোকটা মিছিমিছি চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,' সাচ সাচ বাতাইয়ে ছোটা সরকার, কুছ হ্যায় ইয়া নেহি।'

তারপর দুজনেই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। জলটুঙ্গির দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে গেল ভাঙা রাজবাড়ির কোথায় কি লুঠ করার মতন সামগ্রী এখনও অবশিষ্ট আছে তাই খুঁজতে, আর জিতসুন্দর মহাবল মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'যদি কিছু থাকেই, তাহলেও তোদের তা বলতে যাব কেনরে? ছ্যাঁচড়া ডাকু যত। বুড়ো মানুষের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না?'

* * *

আশি বছব বয়সে বোধহয় কোনো অনুভূতিই বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না এমনকি রাগও নয়। তাই একটু বাদেই জিতসুন্দর একটা থামে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। ডাকাত দুটো তার হাত পা মুখ কিছুই বাঁধেনি। প্রয়োজন নেই বলেই বাঁধেনি। এই দেড়শো বছরের

পুরনো ভাঙাচোরা রাজপ্রাসাদের বাইরে দশ বিঘের বাগান, দু মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ছোটারাজা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচালেও ওই বাগান পেরিয়ে লোকালয়ে তার গলার আওয়াজ পৌঁছবে না, সেটা ওই ডাকুদুটো ভালো করেই জানে।

ওরা এটাও জানে যে ছোটরাজার একমাত্র সহায় বুড়ো চাকর ভানুদেও আজ দুমকা গেছে নাতনির ছেলের ভুজনোয়। সে ছাড়া আর কারুর বয়েই গিয়েছে ছোটরাজার খোজ নিতে আসার।

এ সব কথা জিতসুন্দরও জানেন। জানেন যে চেঁচামেচি করলে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে না। তা ছাড়া ডাকু দুটো নেবেই বা কী? হয়তো দুটো লোহার রেলিং খুলে নেবে, বা একটা সেগুন কাঠের দরজা। সোনাদানা, দামি দামি মূর্তি, ফুলদানি, পুরনো আমলের পেইন্টিং-সে সব তো তিনি নিজেই এতবছর ধরে বেচে খেয়েছেন। নিজে খেয়েছেন। যতদিন পারেন তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় পোষ্যদেরও খাইয়েছেন। এখন এই বাড়ি আর বাগান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটাই বাঁচোয়া যে এই পৃথিবীতে তিনি একদম একলা। আর কারুর পেট ভরাবার চিন্তা তাকে করতে হয় না। ভানুদেও বাগানে সব্জির চাষ করে। সেই সব্জি বাজারে বিক্রি করে। তার বদলে ছোটরাজাকে দুবেলা রান্না করে খাইয়ে যায়। দরকার মতন ডাক্তার ওষুধেরও ব্যবস্থা করে। ঠিকই আছেন, বেশ আছেন ছোটরাজা। কোনো অসুবিধে নেই তার।

সময় কাটে কেমন করে?

কেন, সেই কৈশোর থেকে শুরু করে যত পোষ্যকে তিনি কোলে পিঠে করে বড় করেছেন, তাদের কথা ভাবেন বসে বসে। সে সব স্মৃতি একটুও নষ্ট হয়নি তার। বরং যত দিন যাচ্ছে ততই আরো যেন উজ্জ্বল হচ্ছে তাদের ছবি।

জলটুঙ্গির পাথরের থামে হেলান দিয়ে বসে আবার সেরকমই স্মৃতির পুকুরে ডুব দিলেন ছোটরাজা জিতসুন্দর মহাবল।

* * *

প্রথম এসেছিল রোরো, - চিতাবাঘ। তখন ছোটরাজার বয়েস বোধহয় বছর পনেরো হবে। মায়ের সঙ্গে দলমা পাহাড়ের কোলে মুক্তকেশী কালির মন্দিরে গেছেন। পঁয়ষট্টি বছর আগে সেই মন্দিরের চারপাশে ছিল ঘন জঙ্গল। মা দাসদাসীদের নিয়ে মন্দিরের ভেতরে পুজোর জোগাড় করছেন, আর জিতসুন্দর মন্দিরের বাইরের শালগাছে ছাওয়া লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে পায়চারি করতে করতে পৌঁছে গেছেন মন্দিরের পেছনের আদিবাসী বস্তিতে। হঠাৎই দেখেন কটা আদিবাসী ছেলে একটা চিতাবাঘের ছানাকে গলায় দাড় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করতে জানালো, ওরা বাচ্চাটাকে পেয়েছে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে একটা পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির খোঁদলে।

বাচ্চাটার বয়েস বোধহয় মাস দুয়েক হবে। তখনই কি তেজ। সারাক্ষণ রাগি বেড়ালের মতন মুখে ফ্যাঁসস-ফ্যাঁসস আওয়াজ করছে, আর ছোট ছোট থাবা তুলে হাওয়ায় ঝাপট মারছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জিতসুন্দর তার সামনে বসে মুখে হালকা একটা শিস দিতেই সেই বুনো বাচ্চা এক্কেবারে শান্ত। জিতসুন্দর নিজের আঙুলটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই করখরে গোলাপি জিভ দিয়ে তার আঙুলটা চেটে দিল চিতাবাঘের ছা।

জিতসুন্দর মায়ের কাছে তুমুল বায়না করে সেই বাচ্চাকে মোহনপুর রাজবাড়িতে নিয়ে এল। রাজা শ্যামসুন্দর একটু অবাক হলেও ব্যাপারটা মেনে নিলেন। মোহনপুর রাজবাড়ির তখন জমজমাট চেহারা। সেখানে একটা পোষা বাঘ থাকলে ভালোই মানিয়ে যাবে, - এমনটাই হয়তো ভেবেছিলেন মহরাজ শ্যামসুন্দর। বাড়ির মধ্যে অবশ্য নয়, রোরোর থাকার জায়গা হল বাগানের সবচেয়ে দূরের কোণাটাকে উচু লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে।

বনের জানোয়ারকে যেমন ঘরে নিয়ে এলেন, তেমনি ছোটরাজা নিজেও তারপর থেকে যখন চলে যেতে লাগলেন বনে। মোহনপুর আর দলমার জঙ্গলের মধ্যে তখন তেমন দূরত্ব তৈরি হয়নি। রাজবাড়ির পনেরোটা বিদেশি গাড়ির মধ্যে থেকে ছোটরাজা নিজের জন্যে একটা উইলি জীপ বেছে নিয়েছিলেন। সেইটা চালিয়ে যতটা পারতেন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেতেন। যেখানে গিয়ে উইলিও অচল হয়ে যেত, সেখান থেকে শুরু করতেন পায়ে হাঁটা। কখনো আদিবাসী মানুষ তার সঙ্গী হত। কখনো একদম একা।

এইরকমই এক যাত্রায় পেয়েছিলেন কালোমানিককে। শঙ্খচূড়ের বাচ্চা। বেঁজির পাল্লায় পড়েছিল। ছোট বলেই বেঁজি সাহস পেয়েছিল কাছে ঘেঁষতে। পূর্ণবয়স্ক শঙ্খচূড়কে দেখলে হাতি বা বাঘও রাস্তা ছেড়ে দেয়, - এমনই বিশাল, বিষাক্ত আর ক্রোধী সেই নাগরাজ। লোকে বলে শঙ্খচূড় সাপ নাকি এমনই রাগী যে মাটির ওপর উড়ন্ত পাখির ছায়াকেও তেড়ে গিয়ে কামড়াতে চায়। তা, জিতসুন্দরের যত্ন আত্তিতে কালোমানিকও হয়েছিল ঠিক তেমনি। দশফুট লম্বা। হিসস হিসস গর্জন ঠিক যেন

কানাডিয়ান রেল ইঞ্জিনের স্টিম ছাড়ার শব্দ। কালোমানিককে বাড়ির কেউই মেনে পারেনি রানী করুণাময়ী ছেলের অপঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কাতেই বোধহয়, নিজেই অসুখ বাঁধিয়ে বসলেন দুরারোগ্য কোনো অসুখ। তিনি যখন মারা গেলেন তখন ছোটরাজার বয়েস ষোলো পেরিয়ে সতেরোর দিকে চলেছে।

তার পর পরই ভারতের স্বাধীনতালাভ, দেশীয় রাজাদের রাজত্বের অবলুপ্তি আর হৃদরোগে রাজা শ্যামসুন্দর মহাবলের মৃত্যু, সবই খুব দ্রুত ঘটে গেল।

ততদিনে হিংস্র, বিষক্ত, ধূর্ত পশুপাখি আর পোকামাকড় পোষার নেশাটা জিতসুন্দরের রক্তের গভীরে বাসা বেঁধেছে। উপরন্তু রাজা শ্যামসুন্দরের বিপুল সম্পত্তির তিনি ছাড়া আর কোনো দাবীদার ছিল না । ফলে সেই নেশার পেছনে জলের মত পয়সা ঢালতে লাগলেন ছোটরাজা।

আঃ,কি সব দিন গেছে তখন। সারা পৃথিবীর বন্য পশু সংগ্রাহকদের কাছে মোহনপুরের ছোটরাজার নাম পরিচিত ছিল। তার বিচিত্র পছন্দের কথাও জানত সবাই। যত হিংস্র যত নিষ্ঠুর, যত বেশি বিষাক্ত হবে কোনো পশু বা পাখি বা পোকা, ততই তার জন্যে দাম দেবেন মোহনপুরের ছোটরাজা।

আরে বাবা, ময়ুর পায়রা কুকুর ঘোড়া, - এরা তো জন্ম থেকেই মানুষের ন্যাওটা। এদের পোষার মধ্যে কি যে মজা আছে তা তো এখনো ভেবে পান না ছোটরাজা। কিন্তু একটা গলিয়াথ মাকড়শা তার রোমশ বাদামী আটটা ঠ্যাঙ আর তীক্ষ্ম চোয়াল নিয়ে যখন হাতের পাতার ওপর শান্ত ভাবে বসে থাকে, তখন একইসঙ্গে গা শিরশিরানো আর খুশি মেশানো যে অনুভূতিটা, তা কি ওই ময়ুর হরিণ পুষে কখনো পাওয় যায়?

আফ্রিকা থেকে একটা বেবুন এসেছিল একবার, সে ব্যাটা মরা পশুপাখির মাংস দিলে খেত না। তার জ্যান্ত প্রাণী চাই। নিজের হাতে মেরে তারপর খাবে। এমন মাংসভুক বেবুনের কথা শোনেনই নি তার আগে জিতসুন্দর।

তার সেই সব পোষ্যরা তাকে যে আনন্দ এককালে দিয়েছে তার কথা ভেবে এখনো ঠোঁটের কোণে একটা সুখের হাসি ফুটে উঠল জিতসুন্দরের,—যদিও ডাকাতদুটো তার হাত মুচড়ে ধরায় তার ডানহতের কব্জিটা ফুলে গেছে,যদিও আজ এই বেলা তিনটে অবধি তার পেটে একটা দানাও পড়েনি, তেষ্টাতেও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তিনি সব ভুলে আবার স্মৃতিচারণায ডুবে গেলেন।

ব্ল্যাক মাম্বাও পুষেছিলেন তিনি,- আফ্রিকায় যাকে যমের দোসর ভাবা হয়,সেই ব্ল্যাক মাম্বা সাপ। তাকে তার এজেন্ট যেটা এনে দিয়েছিল সেটা ছিল আট ফুট লম্বা। সেটাকে দেখার আগে অবধি ছোটরাজা ভাবতেন ব্ল্যাক মাম্বার গায়ের রঙ বোধহয় কালো, তাই এরকম নাম। দেখলেন মোটেই তা নয়। তার পোষা সাপটার রঙ যেমন ছিল হালকা সবুজ। শুনলেন ছাই কিম্বা খাকি রঙের মাম্বাও পাওয়া যায়। ওদের নামের সঙ্গে 'ব্ল্যাক কথাটা জুড়ে গেছে ওদের মুখের ভেতরের কুচকুচে কালো রঙটার জন্যে। ব্ল্যাক মাম্বা কাউকে যখন ছোবল মারার জন্যে হাঁ করে তখন ওই কালো রঙটাকে মৃত্যুর রঙ বলেই মনে হয় নিশ্চয়। ছোটরাজা তার জন্তু জানোয়ারদের দেখাশোনা করার জন্যে এক প্রাক্তন সার্কাস -কর্মচারীকে মাইনে দিয়ে রেখেছিলেন। নাম ছিল সওদাগর। ব্ল্যাক মাম্বা আসার পর সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল । কিছুতেই তাকে আটকানো যায়নি। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার হল সেই সাপটাকেও তিনি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মুর্গি খাওয়াতেন। কই, কোনোদিন তো তাকে তেড়ে আসে নি।

তার পোষ্যদের কাছ থেকে ছোটরাজা এই শিক্ষাটা পেয়েছেন, যে জন্তুরা ওরকম অকারণে কাউকে মারে না। খিদে পেলে,কিম্বা ভয় পেলে তবেই ওরা আক্রমণ করে।

কিন্তু মানুষরা কী করে? ওই তো দোতলায় দুজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বোধহয় মার্বেলের কোনো টালি শাবল দিয়ে খুঁড়ে তোলার চেষ্টা করছে। আওয়াজ হচ্ছে দুমদাম করে। ওই মানুষদুটো তো তো দিব্যি আরেকটা অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে বসল। যাগগে, ওদের কথা যত কম ভাবা যায়।

* * *

ছোটারাজা নিজেও কত জায়গায় গেছেন জন্তুর খোঁজ পেয়ে। এই তো, মাত্র বছর দশেক আগে। বিক্রি করতে করতে তখন পুরনো সোনাদানা সব শেষ। জমিজমাও আর বেশি বাকি নেই। তবু কে যেন কানে তুলে দিল, আর্জেন্টিনায় সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ার ব্যাট পাওয়া যায়। রক্তচোষা বাদুড়। ব্যস চলে গেলেন আর্জেন্টিনা। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নিয়েও এলেন দুটো রক্তচোষা বাদুড়। প্রথম তাদের দেখে অবশ্য একটু হতাশই হয়েছিন, - আকারে খুবই ছোট , চামচিকের থেকে হয়তো সামান্য বড় হবে। দেখতেও মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, বরং কোনো কার্টুন চরিত্রের মতন মিষ্টি। বোঁচা নাক, জ্বলজ্বল পুঁতির মতন চোখ। কিন্তু যে লোকটা ওদের ধরে নিয়ে এসেছিল,সে রাত গভীর হতেই ওদের আস্তাবলে ছেড়ে

দিল, আর ওরাও ইদুরের মতন মাটির ওপর দিয়ে খুরখুর করে হেঁটে গিয়ে একটা ঘোড়ার পেছনের পায়ে নিজেদের ধারালো দাঁত দিয়ে গর্ত করে চেটে চেটে রক্ত খেতে লাগল। তাই দেখে তো ছোটরাজা একেবারে মুগ্ধ।

অনেকদিন সেই দুই পোষ্য,সেই টম আর জেরী, তার কাছে ছিল। তবে ওরা তো এমনিতেই বেশিদিন বাঁচে না।

সেইবারেই, সেই আর্জেন্টিনা সফরেই,তার শেষ জমিটুকু বিক্রি হয়ে গেল। যাকে বলে সত্যিকারের কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন ছোটরাজা। এখনো মাঝেমাঝে ভাবেন,অমন করে কি তিনি ভুল করেছিলেন? পরক্ষণেই নিজের বুকের মধ্যেই প্রতিবাদ শুনতে পান,-কীসের ভুল ? টম আর জেরীকে জানোয়ারের চামড়ায় দাঁত বসিয়ে দিতে দেখার সেই আনন্দ ..... তার কোনো দাম হয় না কি?

* * *

দাম হয় না বলেই, তারপরেও একবার একঝাঁক পোষ্যকে নিয়ে এসেছিলেন এই বাড়িতে। সেই শেষ। ওরাই তার শেষ পোষ্য। কিন্তু বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল তার জন্য।

একটা বিদেশী জার্নালে পড়েছিলেন তাদের কথা,তাদের হিংস্রতার গল্প। ওই ম্যাগাজিনেই লিখেছিল যে,এখানেও, মানে ভারতে ঠিক নয়, বাংলাদেশের কাপ্তাইয়ে ওরা নাকি দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে, বংশবৃদ্ধি করছে। সঙ্গে সঙ্গে জিতসুন্দরের মাথার পুরনো পোকা আবার নড়ে উঠল। এজেন্টকে ফোন করলেন, আমার ওই জিনিস চাই।

পুরনো এজেন্ট। সে জিতসুন্দরের আর্থিক অবস্থা জানত। আমতা আমতা করে বলল, অনেক খরচার ব্যাপার ছোট সরকার তারপরে! তারপরে কাজটা বেআইনিও বটে। পুলিশে জানতে পারলে আমি আপনি দুজনেই হাজতে চলে যাব.....। '

'খরচ নিয়ে ভেব না।' ফোনটা কানে ধরে রেখেই জিতসুন্দর তাকিয়েছিলেন রাজবাড়ির দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা সারি সারি পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির দিকে। খাঁটি সোনার পাতে মোড়া আঠেরোটা অয়েল পেন্টিং-এর আঠেরোটা বিশাল বিশাল ফ্রেম। তার মধ্যে একটা প্রতিকৃতি তার বাবার ..... শ্যামসুন্দর মহাবলের। আর একটা রানী করুণাময়ীর। তা হোক। এইসব মানসিক দুর্বলতার মানে হয় না। তিনি দ্বিগুন তেজে বললেন, খরচের ব্যাপারটা নিয়ে ভেবনা। আর ওদের রাখব আমার বাড়ির ভেতরে । কাকপক্ষিও টের পাবে না, তো পুলিশ।

সেই শেষ এ প্রাসাদে কোনো পোষ্য ঢুকেছিল। অবশ্য খালি দেয়ালগুলোর দিকে তাকালে এখনো বড় অস্বস্তি হয়।

* * *

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে কখন যেন চোখ দুটো জুড়ে এসেছিল ছোটরাজার। হঠাৎই সেই লোকদুটোর চীৎকারে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল তার। কী বলছে ওরা?

বাপবাপান্ত করছে ছোটরাজার। তাদের এত পরিশ্রম না কি বৃথাই গেছে। কিছুই নেবার মতন পায়নি! শুধু এইটা ছাড়া। ওকে রেখে দাও। ছোঁবে না! ছোঁবে না বলছি ওকে!'- ক্ষিপ্ত মাম্বার মতনই জিতসুন্দরের বসে থাকা শীর্ণ শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল জলটুঙ্গির ভেতরে। দরজায় শেকল তোলা না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওই দুই ডাকাতের ওপর ঝাপিয়ে পড়তেন।

'রেখে দিয়ে যাও ওকে এ এ এ.....' আবার - ও চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

না করেই বা করেন কী? ওরা যে রোরোকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, রোরোকে ..... তার প্রিয় বন্ধু, তার প্রথম পোষ্য রোরোর মাউন্ট করা শরীরটাকে নিয়ে ওরা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

রোরোর মৃত্যু পর তার শরীরটা তিনি লন্ডনের এক বিখ্যাত ট্যাক্সিডার্মিস্টকে দিয়ে মাউন্ট করিয়ে এনেছিলেন। রোরো গুঁড়ি মেরে বসে আছে, যেন ছোটরাজা একবার 'রোরো ও ও'বলে ডাক দিলেই সে লাফিয়ে তার কাছে চলে আসবে। আবার আগের মতন তার দুই কাঁধে থাবার ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার গাল চেটে দেবে।

বেঁচে থাকার জন্যে, পোষ্যদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছেন জিতসুন্দর,কিন্তু রোরোর এই মাউন্ট করা শরীরটা কিছুতেই প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারেননি, যদিও বহু টাকার প্রস্তাব এসেছে ওটা কিনবার জন্য।

আর আজ ওরা ওই স্ট্যাচুটাকেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে!

ছোটরাজা চীৎকার শুনে ডাকাতদুটো একমুহূর্ত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপরেই ব্যাপারটা ওদের মাথায় ঢুকলো। খুব নিষ্ঠুর একটা হাসি হাসতে হাসতে ওরা এগিয়ে এল জলটুঙ্গির পাথরের জাফরি ঘেরা দেয়ালের সামনে। বেড়াল যখন ইদুরকে মুঠোর মধ্যে পায়, তখন মেরে ফেলার আগে তাকে নিয়ে যেমন কিছুক্ষণ খেলা করে,সেইভাবেই তারা জিতসুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বুড়ো? পোষ্যর জন্যে কষ্ট হচ্ছে না কি?'। বলেই একটা শাবল তুলে একজন রোরোর স্ট্যাচুটার পিঠে বাড়ি মারল।

'না, না। তোমাদের পায়ে পড়ি ....'। নিজের কথাটা নিজের কানে যেতেই চমকে থেমে গেলেন জিতসুন্দর।

কী বললেন তিনি! তিনি মোহনপুরের ছোট রাজা,—ওই সামান্য দুটো লুঠেরাকে বলনে , 'পায়ে পড়ি'! কিন্তু আর কীই বা করতে পারেন তিনি? এরা করুণা না করলে কে বাঁচাবে রোরোকে? তাকেই বা কে বাঁচাবে?

'কেন, তোমার পোষ্যরা? তুমি তাদের জন্যে জীবন দিয়ে দিয়েছ, আর বিপদের সময় তারা তোমায় দেখবে না?' কে যেন ছোটরাজার মাথায় ভেতর ফিসফিস করে বলে উঠল।

'তাই তো। তাই তো।' হঠাৎই ছোটরাজার চোখের ঘোলাটে মণিদুটোর ভেতরে নীল আগুনের আভা নেচে উঠল। ক্ষীণ একটা হাসিও যেন তার শুকনো ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। সে সবের কিছুই অবশ্য ওই ডাকাতদুটোর চোখে পড়ল না। তারা খেলার ছলেই আবার রোরোর শরীরটাকে আছাড় মারার জন্যে মাথার ওপর তুলে ধরল।

'ওকে ছেড়ে দাও! তার বদলে এটা নাও..... এটা .....।' কথা বলতে বলতেই ছোট রাজা তার জামাটা খুলে ফেললেন । তার বুকের ওপর পড়ন্ত দুপুরের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা হিরে,- মোহনপুরের মহবল রাজবংশের সৌভাগ্যমণি। সোনার হারের মাঝখানে গাঁথা সেই হিরেটাকে দ্রুত গলা থেকে খুলে নিয়ে,জাফরি দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে দিলেন ছোটরাজা।

হা হা করে উঠল ডাকাতদুটো।' কী করেন কী করেন?'। কিন্তু তার আগেই বাতাসে একটা গোলাপি বিদ্যুতের রেখা এঁকে, সেই কমলহিরের মালা উড়ে গিয়ে পড়ল পানার আস্তরণে ঢাকা ফোয়ারাপুকুরের মাঝখানে। পড়েই টুপ করে ডুবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই লোকদুটো সব কিছু ফেলে ঝাঁপ দিল পুকুরের জলে।

এর পরের দৃশ্যটা জিতসুন্দর দেখতে চাইছিলেন না। কিন্তু কি যেন এক অদৃশ্য সম্মোহন তার চোখ দুটোতে ওই দিকেই আটাকে রাখল । লোকদুটো কিছুদূর সাঁতরে যাওয়ার পরেই ফোয়ারাপুকুরের জল তোলপাড় হয়ে উঠল, যেন পুকুরের নীচে হঠাৎই কেউ আগুনে জ্বেলে দিয়েছে, আর তার আঁচে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে পুকুরের জল। ডাকাতদুটোর আর্তচীৎকারে ফালাফালা হয়ে গেল দেহাতি দুপুরের নৈঃশব্দ।

আস্তে আস্তে ওদের উৎক্ষিপ্ত দুজোড়া হাত জলের নীচে তলিয়ে গেল। সবুজকে ছাপিয়ে এখন সেই জলে ভেসে উঠেছে দলা দলা রং। রক্তের লাল।

ছোটরাজা খুশি হলেন, ওরা সংখ্যায় এত বেড়েছে দেখে। ওরা এখন তৃপ্তিতে জলের ওপর লাফালাফি জুড়েছে। ঝিকিয়ে উঠছে তাদের রুপোলি দাঁতের সারি আর পেটের কমলা আঁশ।

আহা, খুশি হবে না? কতদিন বাদে ওরা আজ পেট ভরে মাংস খেতে পেল। কলম্বিয়া থেকে চোরাপথে নিয়ে আসা তার শেষ পোষ্য,-ওই পিরানহা মাছেরা।

ছবি ঃ নীতিশ মুখোপাধ্যায়

কাকেদের সঙ্গে কথা

বরুণ মজুমদার

কাকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, ভাব বিনিময় করেন। কাকেরা তার কথা শোনে, কিন্তু মন্ত্রী, আমলারা তার কথা শোনে না। এতেই তিনি রীতিমত ক্ষুব্ধ। তাই দেশের সরকারকে তিনি রীতিমত হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর কথা না শুনলে হাজার হাজার কাককে তিনি ত্রিভূবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডেকে আনবেন। বন্ধ করে দেবেন যাবতীয় বিমান চলাচল।

তা তিনি করতে পারেন। কেননা ২৭ বছর বয়েসী এই গৌতম সারপোদার রয়েছে কাকের ভাষায় কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনি কাকেদের ভাষা বোঝেন। আর তাঁর ডাকে কাকেরাও সাড়া দেয়। তাঁর এক ডাকেই কয়েকশো কাক নিমেষেই তাঁর কাছে এসে হাজির হয়। তিনি বললে কাকেরা উড়েও চলে যায়। গৌতম মনে করেন যে, তাঁর এই অসামান্য ক্ষমতার জন্য তিনি গিনেস বুকে নামও তুলতে পারেন। অবশ্য এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। তার জন্য টাকার প্রয়োজন। নিজের কাছে টাকা নেই। তাই তিনি হাজির হয়েছিলেন নেপালের কিছু মন্ত্রী আর আমলার কাছে। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় তেমন আমল দেননি। তার জন্যই তাঁর এই হুমকি। এর আগে তিনি কাঠমান্ডুতে এক খোলা ময়দানে শয়ে শয়ে কাকেদের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এখন তাঁর আশা, এবার সরকার যদি তাঁর জন্য কিছু করে।

স্মৃতির অন্তরালে

অশোক বেরা

আশির দশকের গোড়ায় ৮২-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সন্দেশে যোগ দিই। তখন কাজ ছিল প্রেসে লেখা পৌঁছে দেওয়া, প্রুফ আনা-নেওয়া বা বাইরে কোনও কাজ থাকলে করা। প্রতি মাসের সংখ্যা বের হলে পোস্টাল এজেন্ট-গ্রাহক দের সাধারণ সংখ্যার বই প্যাকেট করতাম আমি, মাসের শেষের দু'দিন লাগত অমার ওই কাজ করতে। প্যাকিং করতে বসলেই আমাদের এক প্রাক্তন সহ-কর্মীর বছর-তিন চারের ছেলে ভোলা (তখন এ বাড়িতেই থাকত ওরা) কিভাবে যে টের পেত গুটিগুটি পায়ে এসে আমার সামনে বসে আমার হাতে একটার পর একটা বই ধরিয়ে দিত আর বক্‌বক্‌ করত। সেদিন নতুন সংখ্যা প্যাক করছি সামনে ভোলা। এমন সময় এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে দো-তলায় উঠে জিগ্যেস করলে, 'নলিনী দা কী আছেন?' আমি কাজের খেয়ালে নলিনী কথাটা শুনলেও 'দা' বলল না 'দি' বলল তা শুনিনি। ছেলেটিকে বসতে বলে 'দিদিমণি' (নলিনীদিকে আমরা দিদিমণি বলেই ডাকতাম) বলে ডাক দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলে উঠল, 'না না, আমি নলিনীদার সঙ্গে দেখা করব একটা লেখার ব্যাপারে।'

কথাটা শুনেই ভোলা ফিক্‌ করে হেসে ফেলেছে, আর ছেলেটি কি বুঝল কে জানে মুখটা কাচামাচু করে আস্তে আস্তে বসার ঘরে সোফায় বসল। ইতিমধ্যে দিদিমণিও ঘরে ঢুকেছেন। বললাম, 'ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।' বলে আমি বারান্দায় এসে বসে বই প্যাক করতে শুরু করলাম। ভোলাও বসে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তাকাতেই বলল, 'আসলে আমি ভেবেছিলাম, নলিনী দাশ নিশ্চয়ই ভদ্রলোক হবেন, এই প্রথম এলাম তো—তাই ভুল করে বলে ফেলেছি। উনি শোনেননি তো?'

'না না, ভুল তো হতেই পারে। এতে ভাবার কী আছে?' বলার পর আরও দু-একটা কথা বলে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। ভোলা গিয়ে যথারীতি দিদিমণিকে গিয়ে বলেছে। উনি এসে আমার কাছে এসে সব জেনে মুচকি হেসে বললেন, 'এর আগেও এ ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে।' বলে ঘরে চলে গেলেন।

সামনে আসছে পুজো। লিখতে বসে আগেই মনে পড়ে পুজো সংখ্যাকে নিয়ে বেশ ক'টা মজার ঘটনা। তার আগে বলে নিই প্রথম যে দিন সন্দেশে যোগ দিলাম, সেদিন সকালে আসতেই দিদিমণি একটা পুজোর সংখ্যা সন্দেশ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভক্ত এখনও আসেনি ভরতও নেই এখন, তুমি বরং এটা দেখ আর কেউ বই নিতে এলে খাতায় সই করিয়ে দিও।' পুজোর সংখ্যা দিয়েই আমার সন্দেশে যাত্রা শুরু।

এবার দু'একটা পুজোর সংখ্যাকে নিয়ে মজার ঘটনার কথা বলব। এখানে যোগ দেওয়ার বছরখানেক পর দিদিমণি আমায় কাজের ফাঁকে বিজ্ঞাপনের কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। বললেন, 'আমাদের তো বিজ্ঞাপণ সেরকম আসে না। এবার পুজো সংখ্যার জন্য তুমি যদি কিছু আনতে পার কমিশনের ব্যবস্থা করব—এখানে মাইনে তো অল্প, বাড়তি রোজগার কিছু করতে পারবে। মাণিকের সই করা চিঠি নিয়ে তুমি বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ কর, প্রয়োজনে আমি ফোনে তাদের সঙ্গে কথা বলব।

তখন সন্দেশের গ্রাহক বা বাজারে বিক্রি যথেষ্ট ভালো, কিন্তু বিজ্ঞাপন খুবই কম থাকত। আনন্দ ঘোষ নামে আরও একজন দিদিমণির পরিচিত ভদ্রলোককেও কমিশনের ভিত্তিতে পুজো সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের কাজে লাগালেন। এবং আমায় প্রথম দিকে ওঁর সঙ্গে বেরোতে বললেন। সাধারণতঃ ভক্তদা এলে বা ভরতদা থাকলে আমরা বেরিয়ে পড়তাম, বিভিন্ন অফিসে চিঠি দিতাম কথা বলতাম। আনন্দদা কিন্তু বিজ্ঞাপনের কাজ জানা লোক, লিন্ডসে স্ট্রিটে একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কয়েক বছর ধরে যুক্ত। সেদিন কাজ কর্ম সেরে সেই এজেন্সিতে এলাম। তবে ওঁর যে কাজে আসা তার জন্য মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অপেক্ষা করতে হবে। তাই উনি বললেন, 'চল একটু টিফিন করে আসি।' বলে নিচে নেমে গ্লোব সিনেমার পাশে একটা দোকানে গিয়ে বসলাম। উনি রুটি-তরকা অর্ডার দিলেন দু'জনের জন্য দু-প্লেট। কিন্তু দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কিছুক্ষণ দেরি হবে বলল। বসে আছি দু'জনে। ইতিমধ্যে মিনিট পনের-কুড়ি কেটে গেল। দেরি দেখে উনি আমায় বসিয়ে রেখে চলে গেলেন, আর বলে গেলেন দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবেন। কিন্তু মিনিট কুড়ি পার হয়ে গেল—ইতিমধ্যে বেয়ারা দু' প্লেট রুটি-তরকা দিয়ে গেছে। ভাবছি—কী রে বাবা, আমায় এখানে বসিয়ে রেখে চলে গেল নাকি! এদিকে তো আমার কাছে বেশি টাকাও নেই যে দাম মেটাব। বাইরে

বেরিয়ে যাবার রাস্তাও নেই। চোখ-মুখ শুকিয়ে কাঠ, দরদর করে ঘামছি, পেটে খিদে, সামনে খাবার কিন্তু খেতে পারছি না। সে যে কি অবস্থায় পড়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। যে বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেছিল সে আমার দিকে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল, বোধহয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। কাছে এসে বলল, 'আপনার সঙ্গের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?' আমি ব্যাপারটা বললাম। শুনে বললে, 'ওনাকে চিনি, উনি মাঝে মাঝেই এখানে টিফিন করেন, চলে আসবেন নিশ্চয়ই, আপনি খেতে থাকুন।' ইতিমধ্যে ওঁকে ফিরতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অফিসে ফিরে দিদিমণির কাছে গল্পটা বলার পর উনি আনন্দদাকে খানিকটা বকা-ঝকা করলেন। তবে পরের দিকে আরও দু-চার বার কাজে বেরিয়ে দু'জন এক সঙ্গে টিফিন করলেও ওই পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি।

সে সময় প্রতি বছর পুজোর সংখ্যা মহালয়ার অন্তত আট-দশ দিন আগেই বেরিয়ে যেত। প্রথমে অফিসে কিছু বই বাজারে বই ছাড়ার আগের দিনই চলে আসত। সারা দিন রাত আমি আর ভক্তদা দু'জনে মিলে দেড়-দু'শ ভিপি প্যাকেট বেঁধে রেডি করতাম। সে দিন রাতে দু'জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন দিদিমণি। পরের দিন সকালে তিন-চার খানা টানা রিক্সা ভাড়া করে ভক্তদা যেত পোস্ট করতে আর ভরতদা চলে যেত নিউ স্ক্রিপ্ট-এর দোকানে ওখান থেকে এজেন্টরা সব বই নিয়ে যেত। এখনকার মতো আমাদের গিয়ে পৌঁছে দিতে হ'ত না। তো ১৯৮৬-তে রজত জয়ন্তীর জন্য সন্দেশের প্রচার ভালো হয়েছিল। সেবার গ্রাহকও যেমন বেড়েছিল, কোলকাতার বাইরের এজেন্টদের অর্ডারও ভালো পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম দিন তো দিনে রাতে যথারীতি আমরা এজেন্টদের প্যাকেট গুলো তৈরি করলাম।

পরের দিন যথাসময়ে ভক্তদা প্যাকেটগুলো পোস্ট করার জন্য বেরোল। মেঘলা আকাশ দু'এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আমি আর ভরতদা বের হলাম। নিউ স্ক্রিপ্ট-এর বাজারে বই ছাড়া হবে আজ। দোকানে পৌঁছে দেখি প্রায় হাজার সাতেক বই ইতিমধ্যে পৌঁছেও গেছে। আরও বই আসছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় দু'জন মুটে ঝাঁকায় ভরে পলিথিন চাপা দিয়ে বই আনছে। সময় একটু বেশি লাগছে। বাঁধাইখানা দূরে নয়, মার্কেটের উল্টোদিকে ইস্ট অ্যাণ্ড ট্রেডার্সে। এদিকে আস্তে আস্তে এক এক করে এজেন্টরা বই নিতে আসছে। সেবার কলেজ স্ট্রিটের তিন এজেন্টই প্রথম দফায় হাজার ছয়েক বই তুলে নিল। হাতে আছে মাত্র এক হাজারের মতো আরও দু'হাজার আসতে ঘণ্টা দুই বাকি ধর্মতলা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, হাওড়া এবং দমদমের এজেন্টদের বই দিতে হবে। পৌঁছলেন বাবু (অশোকানন্দ দাশ)। ওঁকে সব ব্যাপারটা জানালাম, এবং বললাম, 'আপনি একটু বসুন। এজেন্টরা এলে আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন পরিস্থিতির কথা।' কিছুক্ষণ পর এজেন্টরা এলে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অপেক্ষা করিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় বইয়ের ব্যবস্থা করছি। তখনও দু-তিন জন এজেন্ট বই

আগন্তুক ছবির শুটিং-এ সন্দেশ অফিসের সামনে নলিনীদির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়

নিতে বাকি, যা আসছে সবই দিয়ে দিচ্ছি ওদের। ইতিমধ্যে কলেজ স্ট্রিটের এজেন্টরা দ্বিতীয় দফার বইয়ের জন্য হাজির—দাবী যা বই আসছে সব ওদের দিতে হবে। কিন্তু যারা আগের থেকে দাঁড়িয়ে প্রথম খেপের বইয়ের জন্য তারা ছাড়বে কেন! ভরদার সঙ্গে তো হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়। তার সঙ্গে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও প্রতিবাদ শুরু করেছে। বাবু তাদের বুঝিয়েও পারছেন না। ওই সময়ে হাজির বাইণ্ডার্স সলিল সাহা। সলিলবাবু এসে কলেজস্ট্রিটের এজেন্টদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত্র করলেন। এবং বিকেল তিনটে-সাড়া তিনটে নাগাদ ওদের যতটা সম্ভব বই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা করলেন।

এদিকে বৃষ্টি ক্রমশঃ বাড়ছে। সন্ধের দিকে রাহুলদা, ও শিশিরবাবু (সাহিত্যিক শিশিরকুমার মজুমদার) এলেন। সন্ধের দিকে বাড়ির জন্য আরও কিছু বই এল। ওখানকার পাট চুকিয়ে বেরোলাম তিনজনে, রাত প্রায় আটটা। বাইরে বেরিয়ে দেখি মুষলধারে বৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট সব ফাঁকা, জল জমেছে রাস্তায়। দক্ষিণে আসার জন্য কোনও ট্যাক্সি পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা যদিও পেলাম বইয়ের বাণ্ডিল কিছুতেই তুলবে না। অনেক বুঝিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই রাজি করানো গেল। আমরা আসছি শিয়ালদা হয়ে এ. জে. সি. বোস রোড দিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে—রাস্তা জনমানব শূণ্য, মাঝে-মাঝে দু-একটা বাস লরি জল ছিটিয়ে যাচ্ছে আমাদের গাড়িতে। কথায় কথায় জানা গেল ট্যাক্সিটা মনোহর পুকুরের। সার্কুলার রোড ছাড়িয়ে রিচি রোডের মাঝামাঝি এসে গাড়িটা বন্ধ হল। স্টার্ট আর নিচ্ছে না। 'বোধহয় সাইলেন্সারে জল ঢুকেছে।' বলল ড্রাইভার। এদিকে বাইরে আবার তুমুল বৃষ্টি, রাস্তাও এখানে অন্ধকার। এদিকটায় রাস্তার ওপর হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। নেমে আসারও উপায় নেই। ড্রাইভার বলল, এইটুকু ঠেলে হাজরা রোডে উঠে তবেই স্টার্ট করা যেতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে অগত্যা আমরা তিনজন ও ড্রাইভার, চারজনে মিলে ঠেলে ঠেলে গাড়ি নিয়ে চলেছি। আর বৃষ্টিরও বিরাম নেই। হঠাৎ পা পিছ্‌লে পড়লাম নোংরা জলে। অম্‌নি শিশিরবাবু আমায় জাপ্‌টে ধরে তোলার চেষ্টা করছেন। বাঁ পা-টা ঢুকেছে ম্যানহোলের গর্তে, কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম, চোখে-মুখে নোংরা জল ঢুকেছে। তাকাতে পারছি না। টের পেলাম পায়ে এক পাটি জুতো হাওয়া। সদ্য কেনা বাটা কোম্পানির বর্ষা চপ্পল। কোথায় যে গেল খুঁজে আর পেলাম না। এদিকে পায়ে অহস্য যন্ত্রণা। কোনওরকম করে হেঁটে ওইটুকু পথ পার হয়ে হাজরা রোডে উঠলাম। এখানে জল দাঁড়ায়নি। ড্রাইভার তার জলের বোতল বার করে আমায় দিতে ভালো করে চোখে মুখে দিলাম। পায়ে একজায়গায় কেটে রক্ত বার হচ্ছে। গাড়িতে রাখা ব্যাগ থেকে আমার রুমাল বের করে ভালো করে বাঁধলাম। এক পাটি পায়ের জুতো ফেলে দিলাম মনের দুঃখে। এদিকে ট্যাক্সিটা ঠেলতে ঠেলতে স্টার্ট হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমি উঠব কি উঠব না ভাবছি। দেখি ৩৩নং ডবল ডেকার বাস আসছে বন্দেল রোড দিয়ে যাবে পাইকপাড়া। ভরতদা-শিশিরবাবু দু'জনেই আমায় ওই বাসে উঠে যেতে বলল। খালি পায়ে বন্দেল গেটে নেমে একটা ঔষধ দোকান থেকে ব্যাথার ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ-তুলো ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত দশটায়।

সন্দেশের কথা বলব আর তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের কথা থাকবে না তা কি হয়?

তখন মাঝে মাঝে বিভিন্ন জনের কাছে আমাদের জবাব দিহি করতে হ'ত মানিকবাবু সন্দেশের সঙ্গে কতখানি যুক্ত। বিশেষত বিজ্ঞাপনের জন্য যখন যেতাম। কারণ বিজ্ঞাপনের চিঠি একমাত্র উনিই সই করতেন। মানুষের প্রশ্নটা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানতাম কতটা উনি সন্দেশ অন্ত প্রাণ ছিলেন। আমার স্মৃতি থেকে আজ তার দু-চারটে ঘটনা বলব।

সন্দেশের রজত জয়ন্তী বর্ষে নন্দন হলে তিন দিনের অনুষ্ঠান। তিন দিন ধরে দু'টো করে শোতে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখানো হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানের কিছুটা খরচের বন্দোবস্ত হয়ে ছিল টাটা স্টিল থেকে। তার জন্য আমি আর আনন্দ ঘোষ একদিন গেলাম সকালে মানিকবাবুর কাছে যাতে উনি টাটাকে একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চিঠি করে দেন। অবশ্য দিদিমণি তার আগেই ওঁর সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন চিঠির ব্যাপারে। আমরা যথাসময়ে ওঁর কাছে গেলাম। যেতেই আমাদের বসতে বললেন। এবং পাশে রাখা কিছু কাগজ পত্রের মধ্যে রেখেছিলেন তা বার করতে করতে বললেন, 'আমার চিঠিতে কি কোনও কাজ হবে?'

উত্তরে আনন্দদা বলল, 'আমি কথা বলেছিলাম, এম. ডি. মিঃ মোদির সঙ্গে (ওই সময় টাটা স্টিলের ম্যানেজিং ডিরেকটর ছিলেন রুশি মোদি) তাতে উনি বললেন—আপনার চিঠি পেলে তবেই ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'ও, তাই। তাহলে দেখ এতে যদি কাজ হয় তো খুবই ভালো।' বুঝলাম আগের দিন দিদিমণি বলার পরেই উনি চিঠিটা টাইপ করে রেখেছিলেন। আমাদের ঘুরতে হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে একটা খামে ভরে দিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, সেদিন কিন্তু ওঁর চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা

দুজনে গিয়েছিলাম, এবং এম. ডি.-পিএ-র কাছে চিঠিটা দিয়ে এসেছিলাম, মোদিসাহেবকে দেওয়ার জন্য। পরে টাটা থেকে দশ হাজার টাকার চেক সন্দেশের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য আমরা পেয়েছিলাম।

ছোটদের কাছে সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয়তা এই অনুষ্ঠানের সময় দেখেছিলাম। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন দুপুরে প্রচণ্ড রোদের তাপ বাইরে তার মধ্যেই উনি এসে যেই হলে ঢুকলেন—বাইরের ভিড় অমনি ফাঁকা। অনেকে হলে এসেও টিকিট পায়নি ওইদিন। বাইরে দাঁড়িয়ে ওদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। আমি আর সন্দেশী দুজনে নন্দন হলের বাইরে একটা কাউন্টার করা হয়েছে সন্দেশ বিক্রির, সেখানে বসেছি বিক্রি করতে। এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁর বছর সাত-আটেকের ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে এলেন নববর্ষ সংখ্যা কিনবেন। ছেলেটার দিকে তাকাতেই দেখি তার চোখে জল—কি ব্যাপার জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'দেখ না ভাই, গত মাসের সন্দেশে পড়েছে এখানে আজ অনুষ্ঠান। ক'দিন ধরেই বায়না করছে এখানে আসার। সন্দেশ থেকেই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের গল্প পড়ছে। এরপর ওঁর লেখা বেশির ভাগ গল্পের বই আমায় কিনে দিতে হয়েছে। সন্দেশও ওকে কিনে পড়াই। ভেবেছিলাম হলে টিকিট পাব। এ অবস্থা হবে ভাবিনি, আসলে থাকি তো দূরে উত্তরপাড়ায়। এই রোদে এতটা এসে নিরাশ হতে হল, তাই ছেলেটা কাঁদছে ওঁকে দেখতে পেল না বলে।'

আমার কাছে একটা টিকিট ছিল আমার নিজের। ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ পর কেউ এলে বসিয়ে ঢুকব। কিন্তু বাচ্চাছেলেটার কথা ভেবে খারাপ লাগল। এতদূর থেকে এসেছে। ভদ্রলোককে বললাম, 'এক কাজ করুন-আমার সঙ্গে আসুন।' আমার বুকে ব্যাজ লাগানো, কেউ আটকাল না, ভদ্রলোককে নিয়ে হলে ঢুকে লাইটম্যানকে বললাম, 'ইনি আমার বাড়ির লোক, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসবেন, আপনারা আটকাবেন না।' প্রথম শো শেষ হওয়ার পর ভদ্রলোক ছেলে নিয়ে হাসিমুখে আমায় এসে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন, 'ছেলেকে উনি অটোগ্রাফ দিয়েছেন।' ছেলে খুব খুশি। টিকিটের দাম দিতে চেয়েছিলেন, আমি না নেওয়ায় সেদিনই ছেলেকে সন্দেশের গ্রাহক করে দিলেন।

সেদিন মানিকবাবু মূল অনুষ্ঠানের আগেই উদ্বোধন করে কিছু বক্তৃতা দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, 'আমার শরীরটা ভালো নেই, ইচ্ছে থাকলেও বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে কিন্তু মনটা পড়ে থাকবে এখানে, সন্দেশীদের সঙ্গে,' বলে ফিরে গেলেন।

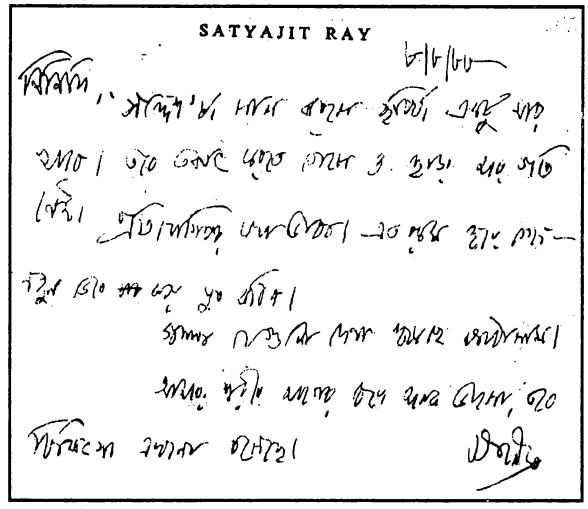

নলিনীদিকে লেখা সম্পাদক সত্যজিতের নোট

সেদিন না থাকলেও পরের বছর অবন মহলে সন্দেশীদের অভিনয় করা ঝালাপালা নাটক কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হলে বসে দেখেছেন। এবং সবার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। সেই প্রশংসার এক অংশীদার স্বয়ং এই অধম। সন্দেশের গ্রাহকদের সাথে শত ব্যস্ততার ফাঁকে কখনও-সখনও দেখা করেছেন বা তাদের চিঠি-পত্রের উত্তরও দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই গোছা গোছা গ্রাহক কার্ড ওঁর সইয়ের জন্য নিয়ে গিয়েছি। খুব কম সময়ই আমায় রেখে আসতে হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই উনি সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিয়েছেন।

সন্দেশী বা সন্দেশ প্রেমীদের বহু আবদার রেখেছেন। এর একটা প্রমাণ লিখতে গিয়ে মনে পড়ল—হাওড়ার দাশনগরে একটা স্কুল-বাক্স তৈরি করে একটা কোম্পানি আমাদের বছরে দুটো করে বিজ্ঞাপন দিত। একটা বৈশাখ সংখ্যায় ও একটা পুজোর সংখ্যায়। প্রতি বছরই ওরা কুইজ-আবৃত্তি ও ছোটদের নিয়ে নানান ধরণের অনুষ্ঠান করত এবং তাদের পুরস্কারও দিত। এক বছর পুজোর বিজ্ঞাপনের বিল-বই জামা দেওয়ার জন্য ওদের অফিসে যেতে আমায় ধরল যে ওদের ওই অনুষ্ঠানে সন্দেশের তিন সম্পাদককে আমন্ত্রণ জানাবে আসার জন্য এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওরা একটা স্যুভেনির বার করবে তাতে তিন জনে একটা করে শুভেচ্ছা বাণী যাতে দেন তার একটু ব্যবস্থা করতে। আমি ওদের সন্দেশ দপ্তরে এসে যোগাযোগ করতে বলি। তাতে ওরা সেদিনই আমার সঙ্গে সন্দেশে এসে দিদিমণির সঙ্গে দেখা করে তিন সম্পাদককে তিনটে চিঠি দেয়। দিদিমণি তাদের বলে দিলেন, 'লীলুমাসির শরীর ভালো নয় মনে হয় না উনি যেতে পারবেন, তবে অন্য একদিন ওঁর বাড়িতে গিয়ে

আপনারা দেখা করুন। মানিক কোথাও যায় না। তবে আমি শরীর ভালো থাকলে অবশ্যই যাব। আর লেখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' পরের দিন আমায় দিদিমণি মানিকবাবুর বাড়ি পাঠালেন ওদের চিঠি দিয়ে। চিঠিটা পড়ে উনি জিগ্যেস করলেন, 'এরা আমাদের বিজ্ঞাপন দেয়?'

আমার ব্যাগে ছিল সেবারের শারদীয়া সংখ্যা। বিজ্ঞাপনটা বার করে দেখাতেই উনি বললেন, 'ও-আচ্ছা। ঠিক আছে দাঁড়াও।' বলে চিঠি লেখার প্যাডটা টেনে লিখে দিলেন একটা শুভেচ্ছা বাণী।

আবার একবার এক প্রতিষ্ঠান অনুরোধ করল ওঁকে চিঠি লিখে যে তাদের একটা বিজ্ঞাপন উনি নিজে পছন্দমতো তৈরি করে সন্দেশে ছেপে দিতে। তা সন্দেশের লেখক-শিল্পীকে দিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। এবং ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে চিঠি লিখে উত্তরও দিয়েছিলেন—উনি বিজ্ঞাপনটা নিজের হাতে না করলেও সন্দেশের লেখক-শিল্পীদের দিয়ে করিয়ে ছেপে দিচ্ছেন সন্দেশের পাতায়। চিঠি পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার খুবই খুশি হয়েছিলেন। এবং তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন শত অসুবিধাতেও সন্দেশকে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করে গেছেন। তবে সম্প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভালো না হওয়ায় আমরা আর বিজ্ঞাপন পাচ্ছি না ওই প্রতিষ্ঠান থেকে।

নামা-দামী বেশ কিছু লেখক শিল্পীরা কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই সন্দেশে লিখেছেন, এঁকেছেন কেবলমাত্র সত্যজিৎ রায়ের মতো ব্যক্তির জন্য।

সেবার এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক অভিযোগ করলেন স্বয়ং সত্যজিতের কাছে—আমার ছোটদের জন্য লেখা গল্প সব পত্রিকায় ছাপা হয়। তারা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়ে ছাপে, আমি কি লেখক হিসাবে সন্দেশের অনুপযুক্ত তাই আমায় আপনি লিখতে বলেন না সন্দেশের জন্য?'

প্রত্যুত্তরে উনি বলেছিলেন, 'তা নয়, আপনার মতো লেখকের লেখা পেলে 'সন্দেশ' ধন্য হবে। তবে কি জানেন! আপনার মতো লেখকের লেখার পারিশ্রমিকের কথা চিন্তা করে আপনাকে লিখতে বলিনি।'

'সে কি, সন্দেশের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক! আমার লেখায় আপনি ছবি আঁকবেন এটাই তো বড় পাওয়া।' সেবার প্রথম তিনি লেখা দিয়েছিলেন শারদীয়ায় আর সেই লেখার ইলাসট্রেশন্ করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। আর সেই লেখা এবং তার সঙ্গে দুই বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা ও তার ইলাসট্রেশন্ আমায় মানিকবাবুর বাড়ি থেকে আনতে হয়েছিল! সেদিন কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে ওঁর ছবি আঁকা দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। যে গল্পের ছবি আঁকছিলেন তা হল 'টাক ও ছড়ি রহস্য।' উনি কাজটা শেষ করছেন আর আমি চুপচাপ ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছি। কখনও কখনও জরুরি লেখা দেখানোর জন্য দিদিমণি মানিকবাবুর কাছে হয়তো আমায় পাঠিয়েছেন, তা আমার হাত থেকে নিয়ে দেখছেন, আমি ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। বেশিরভাগ সময় দেখেছি-আমায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। তবে একবার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা সেই প্রথম আর সেই শেষ। অভিজ্ঞতাটা হল সেদিন সকালে ওঁর বাড়িতে গিয়েছি কিছু লেখা দেখতে দেওয়া ছিল আনতে। ঘরে গিয়ে দেখি একা পিয়ানোর সামনে বসে সুর করছেন, আমি চুপচাপ ওর পিছনে দাঁড়িয়ে কোনও ডিস্টার্ব করিনি, আর উনিও খেয়াল করেননি। সুরটা সেদিন আমার অজানা কিন্তু সুরটা অমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে ছিল। তারপর কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ওঁর খেয়াল হয়েছে আমি দাঁড়িয়ে। দেখে বললেন, ও তুমি এসে গেছ, বলে উঠে গিয়ে ওঁর টেবিলের ওপর রাখা লেখার প্যাকেটটা আমার হাতে দিলেন, 'আসছি' বলে চলে এলাম। তবে সুরটা কিন্তু সেদিন থেকে মনের মধ্যে গেঁথে গেল।

পরের বছর হলে "গুপী বাঘা ফিরে এল" ছবিটা দেখতে গেলাম। সেদিনের সেই মনমাতানো সুরটা আবার শুনলাম গানের মধ্যে "কেমন বাঁশি বাজায় দেখ মাঠেতে রাখাল।"

ইচ্ছেগাড়ি

চন্দ্রাবলী ধর

খিড়কীর পুকুরের ঘাটে বসে ভুচু একমনে জলে মাছেদের বুড়বুড়ি কাটা দেখছিল। —'কি, মন খারাপ নাকি?' একটা মোটা গলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে সামনে একজন গোলগাল ফর্সামতন ভদ্রলোক। মনখারাপ তো বটেই, গরমের ছুটিতে লাদাক যাওয়ার কথা, তার বদলে কিনা আসতে হল চুঁচড়ো। কি সব নাকি সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা আছে। তাই মা বাবার সঙ্গে ভুচুকেও চুঁচড়ো আসতে হয়েছে। ভুচু জবাব দিচ্ছে না দেখে লোকটা বলল, 'মন খারাপ তো লাদাক গেলেই হয়।'—যাঃ বাব্বা, লোকটা জানল কি করে—ভুচু অবাক।

—'অবাক হচ্ছ! তবে ইচ্ছে-গড়ি' দেখলে আরও অবাক হবে।'

চুঁচড়োর বাড়ির পেছনের বাগানে বেশি কেউ আসে না। ভুচু একাই ঘুরে বেড়ায়, আজকে লোকটাকে পেয়ে ভুচুর খারাপ লাগল না। লোকটা পাশে বসে বেশ মজলিসি ভঙ্গীতে বলল, 'অধমের নাম বুধেশ্বর শর্মা। আমি একজন বৈজ্ঞানিক। 'ইচ্ছে-গাড়িটা' আমার নবতম অবিষ্কার—এখনও পেটেন্ট নেওয়া হয়নি।' ভুচুকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি সহজ করে। ধর ছুটির দুপুরে অঙ্ক করতে বসলেই তোমার মনে হয় দুপুরটা বেজায় লম্বা, অথচ যখন বিল্টুর সঙ্গে নীচের গ্যারেজে ক্রিকেট খেল তখন দুপুরটা নিমেষে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ মনের সঙ্গে সময়ের একটা সম্পর্ক আছে। মন চাইলে একই সময়কে ছোট বড় করা যায়। ঠিক এরকমই ইচ্ছে দিয়ে দূরত্বকেও আমরা প্রয়োজন মত সংক্ষেপ করে নিতে পারি। এখনও পর্যন্ত এক ইউনিট ইচ্ছেতে সময়কে বাড়ানো গেছে পঞ্চাশ ইউনিট, আর দূরত্ব কমেছে একশো ইউনিট। অবশ্য তার জন্য আমার এই যন্ত্রটার সাহায্য দরকার।'

লোকটা এবার ঝোলা থেকে একটা ল্যাপটপের মত জিনিস বার করে খুলে ধরল। ভুচু দেখল ভেতরে রয়েছে একটা লাল নীল বোতাম লাগানো কী বোর্ড—আর একটা স্পীডোমিটার জাতীয় গোল চাকতি। যন্ত্রটা ভুচুর সামনে রেখে বুধেশ্বর বলল, 'এর নাম ইচ্ছে-গাড়ি। এটাকে যে কোন গাড়িতে ফিট করলেই তুমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারবে। তবে এই যন্ত্রটা চালাতে মনঃসংযোগের একটা বিশেষ কৌশল দরকার। সেটা শিখতে হবে।'

ভুচু এবার লাফিয়ে উঠে বলল—'তবে দেরী কেন, ঘুরে আসি লাদাক—কিন্তু যাবে কিসে।'

—'সে ব্যবস্থা আছে। রতনের ভ্যান রিক্সাটা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।'

—'আমি রেডি—কিন্তু মাকে তো বলা হয়নি।'

—'দরকার নেই—ইচ্ছে গাড়ি দূরত্বটাকে কমানোর সঙ্গে সময়টাকেও বাড়িয়ে দিতে পারে। আমি এখনও পর্যন্ত ইচ্ছেটাকে যতটা চার্জ করতে পারি তাতে তিন ঘন্টাকে সাতদিন মত করে ফেলা যায়। সুতরাং তুমি সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।'

ভ্যান রিক্সায় বসার পর বুধেশ্বর বলল, 'ভুচুবাবু চোখ বুঁজে এবার ইচ্ছেটাতে পুরো জোর লাগাও। আমার সঙ্গে তোমার ইচ্ছের ভাইব্রেশনটাও দরকার, তবেই যন্ত্র

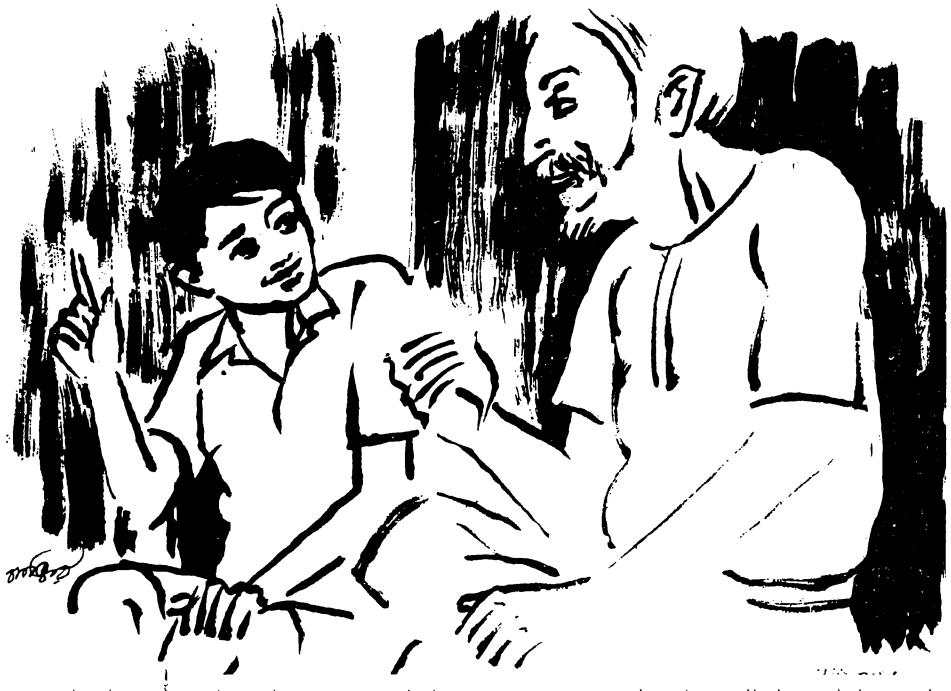

কাজ করবে। আমরা এবার যাব লাহুল হয়ে সোজা লাদাকের রাস্তায়।' বুধেশ্বরের ডাকে ভুচু চোখ খুলে অবাক। ওদের ভ্যান রিক্সা তরতর করে চলেছে পাথুরে গিরিপথ দিয়ে, গাছের কোন চিহ্নই নেই। অদ্ভুত সব নাম তাদের—বারলাচালা—তাংলালা-লাংচুলা। হুহু করে হাওয়া বইছে, কুয়াশা ঢাকা পথের দুপাশে কিম্ভূত কিমাকার পাহাড়ের সারি। বুধেশ্বর বলল হাওয়ার ধাক্কায় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনি চেহারা হয়েছে ওদের। এই ঊষর পাহাড়ী পথের বাঁকে হঠাৎ কখনো সামনে এসে পড়ে স্বচ্ছ নীল কোন এক হ্রদ।

লাদাকের রাজধানী লে শহরে ঢুকে ভুচু তো অবাক—দুর্গম পাহাড়ের বুকে বিশাল সাততলা রাজপ্রাসাদ, বিরাট বিরাট হোটেল আর দোকান, ঝাঁ চকচকে রাস্তায় মিনিটে মিনিটে মিলিটারি গাড়ি। ভুচু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ওদের ভ্যান রিক্সার দিকে কেউ কিন্তু দেখছে না। ওরা শহর পার হয়ে চলল আরো দূরে। পাহাড়ের চূড়োয় একটা হ্রদের পাশে ওরা থামল—তাতে নীল টলটলে জল। একটা ছোট্ট খয়েরী হাঁস হ্রদের বুক থেকে উড়ে এসে প্যাঁক প্যাঁক করে ওদের সঙ্গে আলাপ করে গেল। পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল একপাল বুনো গাধা। পাশে তাকিয়ে ভুচু আবারও অবাক। বিশাল ভেড়া আর ইয়াকের পাল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছে একদল যাযাবর। ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওদের পোষা কুকুর। ওদের মধ্যে থেকেই একজন যাযাবর এগিয়ে এল। চামড়ার পোষাক, বড় বড় চুল, নখ, লাল পোড়া চেহারা, দেখে ভয় পেল ভুচু। লোকটা কিন্তু হাসল। কি যেন বলল বুধেশ্বরকে। ভুচু জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল যাযাবর।'

—বলল সামনে আছে আরও বিশাল এক হ্রদ। তার জল কোথাও নীলকান্ত মণির রং, কোথাও মরকত মণির মত সবুজ। সেখানে আছে হাঁসের দল—যারা মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বাহন। সেই হ্রদের ওপারের পাহাড়ের পিছনেই তিব্বত।'

ভুচু লাফিয়ে উঠল—'চল তাহলে যাই।'

এবার মাথা নাড়ল বুধেশ্বর—'স্যরি ভুচুবাবু। ইচ্ছে-গাড়ির চার্জ কমে আসছে। এবার ফিরতে হবে। তাছাড়া এতক্ষণে তোমার বাড়িতেও খোঁজ পড়েছে।'

ভুচু বাড়ি ঢুকল একেবারে সন্ধ্যে করে। মা তো খুব বকাবকি শুরু করলেন। তরলাদিও বলল, 'সারা দুপুর দেখেছি বুদো পাগলার সঙ্গে ঘুরছিলে—তারপর গেলে কোথায়? 'বুদো পাগলা' শুনে ভুচুর রাগ হল খুব। কিন্তু ও চুপ করেই রইল। পেটেন্ট নেওয়ার আগে জানাজানি হওয়া ঠিক নয়—বারণ আছে বুধেশ্বরের। মা তখনও বকছেন—ভুচুর অবশ্য কিছু গায়েই লাগল না। কাল আবার যেতে হবে—এখনও দেখা হয়নি সেই নীল সবুজ হ্রদ যেখানে মা সরস্বতীর বাহন হাঁসেরা খেলা করে—যার ওপারেই তিব্বত। এখন এসব ছোটখাট বকুনিতে কান দিলে ওর চলবেই না। ভুচু কোন কথা না বলে তরলাদির হাত থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে ওপরে চলে গেল।

ছবি ঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

একা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ বেলাকার রাঙা রোদটুকু ছুঁয়ে থাকে হিম বাড়ি
ধুয়ে মুছে গেছে কবেকার রঙ, ময়লা ইটের সারি।
জংলা উঠোনে লাউয়ের মাচায়
কনকনে ডাঁটা কে তায় বাঁচায়
কবেকার কোন বাস্তু সাপের একলা দখলদারি
তক্ষক ডাকে, তবু কি মায়ায় চেয়ে থাকে একা বাড়ি।

সেই কবে এক ছোট নদী ছিল, গতি তার গেছে ঘুরে
শুকনো সোঁতায় একা ডিঙিখানা পড়ে আছে ভেঙ্গেচুরে।
দিগন্ত ছুঁয়ে ছুটে আসে হাওয়া
পুরনো সে কথা পিছু করে ধাওয়া
সন্ধ্যা ঘনায়, নেমে আসে রাতে ঝিঁঝি ডাকে এক সুরে
তবু কি মায়ায় পড়ে থাকা ডিঙি পাড়ি দেয় যেন দূরে।

ছিল ভরা দিঘি টলটলে জল, আজকে পানায় ভরা
ভাঙ্গা ঘাটলায় সাপের খোলশ পড়ে আছে মনমরা
দিন কবে শেষ অবগাহনের
নির্জনে দিঘি পায় বুঝি টের
শ্যাওলা জমেছে চাতালের বুকে, সারা দেহে আজ জরা
তবু কি মায়ায় ফোটে খই ফুল, মনকে আকুল করা।

তিতি

রাখাল বিশ্বাস

তিতি ফুলের সুবাস মাখা
তিতি আকাশ নীলের পাখি,
তিতি ঝরনা ঝোরায় থাকা
তিতি পাহাড় চুড়োয় আঁকি।

তিতি নবীন মেঘের গান
তিতি উড়ে চলে জ্যোৎস্নায়,
তিতি কুসুম ঝরানো স্নান।
তিতি কাল-পুরুষের গায়।

তিতি সূর্য তারার আলো
তিতি একলা নদীর বাঁকে
তিতি আলোকে পালক ভালো
তিতি সুশীতল ছায়া ঢাকে।

তিতি জোনাকির ডানা মেলে
তিতি বৃষ্টি মুখর বেলা
তিতি প্রিয় রঙে দাও জেলে
তিতি খেলা ভাঙা সেই খেলা....

হাঁসুলী বাঁক

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

দিন পেরিয়ে ক্ষণ পেরিয়ে
মাঠ পেরিয়ে বন পেরিয়ে
সেই যে কথাশিল্পীকে কে দিচ্ছে ডাক?
দুইদিকে দুই নদীর চলা
দুইটি নদীই জলোচ্ছলা
বেঁকিয়ে শরীর, বইছে ওরা
বইতে থাক।

লাভপুর। তার পশ্চিমে কি?
একপা-দুপা বাড়িয়ে দেখি
ঢেউ-এর তালে ঢেউ নেচে যায়
তাকুর তাক।
হাঁসের মত ঠোঁট বেঁকিয়ে
ঢেউয়ের চালে চলতে গিয়ে
আঁকন-বাঁকন পাক খাচ্ছে
হাঁসুলী বাঁক।

ফুল চুরির রহস্য

চন্দন চক্রবর্তী

ঋজু ফিরছিল ইস্কুল থেকে। ওর বাড়ি থেকে ইস্কুল বেশি দূরে নয়। তাই বাস-টাসে চড়তে হয় না। ওর সঙ্গে দু'একজন বন্ধু ছিল। পাড়ারই। হঠাৎ দত্ত-ঠাম্মার গলা। 'ও ঋজু, এদিকে আয় না বাবা। তোর সাথে একটু কথা আছে।'

ঋজুর পেটে তখন ক্ষিদে কুঁই কুঁই করছে। কিন্তু দত্ত-ঠাম্মা ডেকেছে। হয়তো নতুন কোনও কেস সমাধান করতে হবে। দুধ চুরির রহস্যের সমাধান ব্যাপারটা সব্বাই জেনে গেছে। আর তারপর থেকে ওর হেভি ডিমান্ড। বন্ধুরা ক্ষিদে পেয়েছে বলে চলে গেল। ও এগিয়ে গেল ঠাম্মার বাড়ির দিকে।

যা ভেবেছিল ঋজু, ঠিক তাই। ঠাম্মাতো প্রায় কেঁদেই ফেলে, 'আমার মন আনচান করছে বাবা। বড় বিপদে পড়েছি।'

ঋজু গম্ভীরসে বলে, 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমার পেট যে আরও আনচান করছে। দু'চারটে নাড়ু সাপ্লাই কর, তারপর শুনছি তোমার কথা।'

ঠাম্মা গদগদ হয়ে বেশ কয়েকটা নারকেল নাড়ু আর তিলের নাড়ু প্লেটে সাজিয়ে ঋজুকে খেতে দিয়ে বলল, 'আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর বাবা....।'

ঋজু নাড়ুতে কামড় মেরে বলে, 'সমস্যাটা কী শুনি।'

'বাগান থেকে রোজ ফুল চুরি হচ্ছে রে। কে করছে, কখন করছে, কিছুই ধরতে পারছি না।'

'হুম। ক'দিন ধরে হচ্ছে?'

'বেশ কিছুদিন ধরে। জানিস, তোর দত্ত দাদাইকে থানায় পাঠিয়েছিলাম। ফুলচোর ধরার জন্য। ব্যাজার মুখে ফিরে এসে তোর দাদাই বলল, থানায় নাকি দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বলেছে, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? পুলিশ যদি ফুলচোর ধরবে তবে ডাকাত ধরবে কে?' এখন কি যে ফ্যাসাদে পড়েছি....তোকে কি বলব? পুলিশ যদি নাকচ করে যাবো কোথায়?'

'কিসসু ভাববেন না। ঋজু গোয়েন্দা যখন এসে পড়েছে কুছ পরোয়া নেহি।'

দত্ত-ঠাম্মা চোখ গোল গোল করে। 'কিরে হঠাৎ 'আপনি' বলতে শুরু করলি কেন?'

'উঁহু তুই-তোকারি নয়। সম্মান দিয়ে কথা বলুন। ঋজু গোয়েন্দা এখন ইনভেসটিগেশনে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে। বাগানটা একটু চক্কর মারতে হবে।'

দত্ত-ঠাম্মা তখন হাঁ। 'ঠিক আছে চলুন।'

ঋজু পিঠ থেকে বইয়ের ঝোলা নামিয়ে তার থেকে একটা খাতা আর পেন নিয়ে বাগানে ঢুকল। বাগানে ঢুকে ফটাফট স্কেচ করল। টুকিটাকি ডিটেলস নোট করল। পেছনে ঠাম্মা। বেশ কিছুক্ষণ চক্কর মারার পর ঠাম্মা বলে, 'কিরে বুঝলি কিছু?'

'উঁহু, তুই না আপনি।'

'ওই হল, তা বুঝলেন কিছু?'

'আচ্ছা আপনার বাগানে কী কী ধরনের ফুল ফোটে আর কী কী ধরনের ফুল চুরি হয়?'

'হরেক কিসিমের জবা, গন্ধরাজ, টগর, স্থলপদ্ম, সব ধরণের ফুল আছে এবং সব ধরণের ফুলই বেশ কিছু চুরি হচ্ছে রোজ।'

'তা আপনি যে ফুল দিয়ে পুজো করেন, সেটা আসছে কোত্থেকে?'

'নিজের বাগানের ফুল আমি ছিঁড়ি না গোয়েন্দাবাবু। সে ফুল আসে বাজার থেকে। তোর, থুড়ি আপনার দাদাই বাজার থেকে এনে দেয়।'

ঋজু এবারে বাগানের মাঝে একটা কলমিফুল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। গাছে অনেক হলুদ ফুল, বেশ মিঠে গন্ধ ছেড়েছে। জবা গাছগুলোতে অনেক ফুল হয়েছে। লঙ্কাজবা, ঝুমকোজবা থেকে পঞ্চজবা, কতরকমের জবা। স্থলপদ্মর দিকে তাকিয়ে ঋজু বলল, 'বাহ্ ভারি সুন্দর তো!'

'একি দেখছেন ঋজুবাবু, সকালে এর রঙ সাদা থাকে বেলা বাড়লে হাল্কা গোলাপী হয়ে যায়। কত সাধের ফুল আমার....।'

'দেখুন, চারদিকে কত উঁচু পাঁচিল দিয়েছেন। ডিঙিয়ে আসা শক্ত কাজ। তবে ডানদিকে কোণার দিকে একটু ভাঙা গর্তমতো করা আছে। ওইখান থেকে কুকুর বেড়ালের সাথে ছোট্ট রোগা-ঝোগা ছেলের ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং কমবয়সী চোর হতে পারে। আবার এটাও ঠিক ফুল সাধারণত বয়স্ক লোকেরাই চুরি করে বেশি। হুম! ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো।' ঋজু ভাবতে বসে।

ঠাম্মা বলে, 'আচ্ছা আঁকশি দিয়েও তো চুরি করতে পারে?'

ঋজু ঠোঁট উল্টে চোখ বড় করে, 'কথাটা মন্দ বলেননি। সেক্ষেত্রে গাছতলায় কিছু টাটকা ফুল পড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি সেরকম ফুল দেখতে পান? অথবা খেয়াল করে দেখেছেন কি পাঁচিলের ধারের ফুলগাছগুলোতে ফুল কমে গেছে? মানে ওইগাছগুলো থেকে চুরি হয়েছে।'

এবারে ঠাম্মা বাঁধানো দাঁতে ফকফকে হাসি। 'না বাবা, থুড়ি বাবু। বাগানের মাঝখানের গাছগুলোতেও ফুল থাকছে না। আর গাছের গোড়াতেও তাজা ফুল থাকে না।'

ঋজু স্বগতোক্তির মতো করে বলে, 'মিসটিরিয়াস কেস!....আচ্ছা, আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ তো সব্বাইকে হয়। যত্ত বুড়োবুড়ি ভোরবেলায় বেড়ায় সবার হাতে দেখি প্লাস্টিকের প্যাকেট আর তাতে ফুল। কিছু বিচ্ছু বাচ্চাও ঘুরঘুর করে। কিন্তু আমি তো ভোর থেকে বাগান পাহারা দিই। কারোকে তো চুরি করতে দেখিনি। দেখলে তো--' বলেই দুইপাটি বাঁধানো দাঁত দিয়ে খট্‌খট্ শব্দ করে আর বলে, 'ঠ্যাং ভেঙে দিতাম।'

ঋজু গলাটা ভারি করে বলে, 'কেসটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা নয়। দেখি কী করা যায়।'

ঋজু বেরিয়ে গেল।

ঋজু চলে গেল বটে কিন্তু মাথায় সবসময়ে ঘুরতে শুরু করল ফুলচুরি সমস্যাটা। অদ্ভুত। চাদ্দিকে উঁচু পাঁচিল দেওয়া। মাঝে ছোট গর্ত। সামনের গেটে রাতে তালা মারা। অথচ ফুল চুরি হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? ভূতে এসে ফুলচুরি করছে? নাহ্ পৃথিবীতে এখনও কোনও ফুলচোর-ভূতের গল্প শোনেনি ঋজু।

সেদিন শনিবার। ঋজুদের ইস্কুল ছুটি। ছুটির দিন সকালে কচিরামের দোকানে গরম জিলিপি ওদের বাড়িতে মাস্ট। রসাল জিলিপি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। ও সক্কাল সক্কাল কচিরামের দোকানের দিকে এগোল। রোজকার মতো চৌমাথার একপাশে এক ফুলওয়ালি অনেক ফুল নিয়ে বসেছে। ফুল দেখে ঋজুর চোখ ফুলুরির মতো ড্যাবড্যাব করে উঠল। মনে মনে ভাবে, 'আচ্ছা, এই ফুলগুলো দত্ত-ঠাম্মার বাগানের নয় তো? দূর তা কখনও হয়। ওরা তো হওড়ার ফুলবাজার থেকে ফুল কিনে এনে বিক্রি করে। ফুলবাজারে সেদিনে আগুন লেগেছিল।

সেদিন ওর বাবাই খুব আফশোস করছিল, 'আহারে, গরিব ফুলওয়ালি খুব বিপদে পড়ল।' সেদিন থেকে ঋজু সব জানে। এখন তো নতুন ফুলবাজার হয়েছে। ওখান থেকেই তো ফুলওয়ালারা ফুল কিনে আনে।

ওর থমকে দাঁড়ানো দেখে ফুলওয়ালি বলে, 'খোকা, ফুল নেবে? সব তাজা ফুল।'

ঋজুর রাগ হয়। ও যে খোকা নয়, এখন খুদে ফেলুদা, সেটা এরা বোঝে না। ঋজু ঠোঁট ওল্টায়। বলে, 'না, লাগবে না।'

কচিরামের জিলিপির বেশ সুনাম আছে। বেশ ভিড়ও হয়েছে। একটা বড় পাত্রে ডাঁই করা রসে ভেজা জিলিপি। শো-কেসের ওপরে বসানো। দু'চারটে মাছি ভনভন করে উড়ছে। জিলিপি উধাও হয়ে যাচ্ছে। অনেকে দোকানে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে।

হঠাৎ ঋজুর চোখ ছানাবড়া। আরে একি! দত্ত-দাদাই জিলিপি খাচ্ছে। ঠোঁটের কষ বেয়ে রস গড়াচ্ছে। হাতের আঙুলেও রস লেগে। দাদাই সেই রস চাটছে। ঠিক বিড়ালের মতো। ওর হাসি পেল। ঋজুকে দেখেই দাদাই ডাকল।

'ও ঋজুবাবু এদিকে এসো। জিলিপি খাবে নাকি?'

ঋজু ঘাড় নাড়ে। নাহ্। বলে, 'আমি তো জিলিপি কিনতে এসেছি। তুমি কি রোজ জিলিপি খেতে আসো নাকি?'

'আর বোলো না ভায়া। তোমার ঠাম্মার জ্বালায় মিষ্টি খাওয়ার উপায় আছে? সুগার-টুগার কিস্যু নেই অথচ মিষ্টি খেতে দেবে না। কে ওকে বলেছে, বুড়ো বয়সে মিষ্টি খেলে সুগার হয়। ব্যস, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ। রোজ করলা সেদ্ধ খেয়ে জিভ হেজে গেল।'

'বুঝলাম। তা রোজ কটা জিলিপি খাও?'

'ওই চার-পাঁচটা। বেশি নয়। তা তুমি একটা খাও না।'

ঋজুর যে লোভ হচ্ছিল না তা নয়। তবু বলল, 'কিন্তু তোমার যে ভাগে কম পড়ে যাবে।'

'একদিন একটা কম হলে এমন কিছু হবে না। নাও।'

ঋজু হাত বাড়িয়ে একটা জিলিপি নিয়ে কামড় দেয়। দত্ত-দাদাই আঙুল চাটতে চাটতে বলল, 'তোমার ফুলচুরির রহস্যের কিনারা হল?'

ঋজুর মুখে মুচকি হাসি। 'হয়নি' দেখা যাক কী হয়!

'তবে ভায়া একটা কথা বলি। ওসব ফুল চুরি-টুরি বাজে কথা। তোমার ঠাম্মা চোখে কম দেখে, কানে কম শোনে। বকেও বাজে। সেই কারণে ওর সবসময় মনে হয় বোধ হয় রোজ রাতে ফুল চুরি হয়ে যাচ্ছে।'

'জেনেশুনে তবে থানায় কী করতে গিয়েছিলে?'

'আরে, ওটা বানিয়ে বলেছি, না হলে তোমার ঠাম্মাকে শান্ত করাই যেত না। ফুল চুরি কেস নিয়ে থানায় গেলে আমাকেই পাগল বলে গারদে পুরে দিত।'

কথাগুলো বলে দত্ত-দাদাই হাসে হা হা। ঋজুও বিজ্ঞের মতো হাসে।

ঋজু বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে আর ভাবে 'সত্যি তো কি অন্যায়। সুগার নেই অথচ জিলিপি খেতে দেবে না।'

সেদিনই বিকেলে ঋজু হাজির হল দত্ত-ঠাম্মার বাড়ি। ঠাম্মা অবাক। 'কিরে, এই অবেলায় চোর ধরা পড়েছে?'

'না গো ঠাম্মা, চোর ধরা পড়েনি। তবে পড়বে। দাদাই কোথায়?'

'তোর দাদাই তো বিকেলে পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানেই গেছে মনে হয়।'

'ঠিক আছে। ভালোই হল। তুমি বস। আমি একটু বাগান থেকে ঘুরে আসছি।'

'এত বেলায় বাগানে কি করবি?'

'দরকার আছে।'

ঋজু কোমরে হাত দিয়ে বাগানে বিজ্ঞের মতো গাছ নিরীক্ষণ করতে শুরু করল। একটা বেঁটে কিন্তু ঝাঁকড়া টগর গাছের তলায় দাঁড়াল। এই গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক সাদা ফুল পাড়া যায়। এবং একমাত্র টগরফুলই আছে যা পুজোতে বেশি ব্যবহার করা যায়। গন্ধহীন কিন্তু বেশ কাজের। কিন্তু একি! ফুলগুলো তো পুরো ফোটেনি। সবই আধফোটা। তাহলে কি করা যায়? এবারে গোয়েন্দা ঋজু ভাবল—ওকে, কুছ পরোয়া নেহি।

যাবার সময় ঋজু ঠাম্মাকে বলে গেল, 'ও যে এসে বাগানে ঢুকেছিল কাউকে যেন না বলা হয়। এমন কি দাদাইকেও নয়। পেট পাতলা মানুষ কাউকে গল্প করলে চোর সাবধান হয়ে যাবে। আগামীকাল রবিবার। আমি বিকেলে আসব। দাদাইকেও থাকতে বলবে। একদিন পার্কে না গেলে কিছু হবে না।'

ঠাম্মা বলে, 'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুই এতক্ষণ মশার কামড় খেয়ে বাগানে কি করছিলিস?'

ঋজু হে হে করে হাসে। বলে, 'চোরফুঁক দিচ্ছিলাম যাতে ফুলচোর ধরা পড়ে।'

ঠাম্মা হাঁ। 'চোরফুঁক আবার কিরে?'

'কেন ঠাম্মা? ভূত তাড়াতে যদি ঝাড়ফুঁক দেয় তবে চোর তাড়াতে চোর ফুঁকতো দিতেই হবে। কি বল?' ঋজু হাসে হা হা করে।

ঠাম্মা ঘাড় নাড়ে, 'নাহ্ এটা তুই ঠিক বলেছিস।'

রবিবার সকাল থেকেই ঋজুর মনে চাপা উত্তেজনা। ও সঠিক ভাবছে তো? নাকি কোথাও ভুল হচ্ছে? ভুল হলে তখন দেখা যাবে। নতুন করে ভাবা যাবে। এখন তো যাওয়া যাক। বিকেল চারটে। ঋজু গিয়ে হাজির হল দত্ত-ঠাম্মার বাড়ি।

দাদাই গেট খুলতে খুলতেই বলল, 'কি গোয়েন্দাবাবু, ঠাম্মার পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হচ্ছো তো?'

ঋজু একঝলক তাকাল। 'তাতো একটু হচ্ছি। চলুন দত্তবাবু ভেতরে চলুন।'

'তুমি থেকে আপনি কেন? আবার দাদাই থেকে দত্তবাবু?'

'হা হা আমি এখন শুধু ঋজু নই। গোয়েন্দা ঋজু। ক্লায়েন্টের বাড়ি এসে তো আপনিও বলতে হয়। বাবুও বলতে হয়।'

ঘরে ঢুকেই পাখা ফুলস্পীডে চালিয়ে দিল ঋজু নিজে। বলল, দত্তবাবু আপনি বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।' ঠাম্মাকে বলে, 'চলুন তো ঠাকুরঘরে।'

দত্ত-ঠাম্মা হাঁ হয়ে যায়। 'কিরে, আবার আপনি বলছিস? ওকে দত্তবাবু বলছিস?'

'উঁহু, নো 'কিরে'। নো তুই তোকারি। গোয়েন্দাকে সম্মান করুন। বিশেষ করে ফাইনাল মোমেন্টে।'

ঠাম্মা ঠোঁট উল্টে বলে, 'হুঁ গোয়েন্দা! এখনও ফুলচোরের কিনারা হল না।'

'এবারে হবে। আপনি আসুন তো।'

ঠাকুরঘরে ঢুকে খপাৎ করে একমুঠো টগর আর লঙ্কাজবা ফুল তুলে পরখ করে দেখল ঋজু। মুখে হাসি। 'হুঁ বাবা যা ভেবেছি তাই।'

'কি ভেবেছেন আপনি? বাসি কাপড়ে রাধামাধবকে ছুঁয়ে ফেললেন?'

একটা ঠোঙার মধ্যে ফুলগুলো পুরতে পুরতে ও বলল, 'রাধামাধব পরে হবে'খন। শিগ্রি ঘরে চলুন। চোর ধরা পড়েছে।'

ঠাম্মার বাঁধানো দাঁতে খিলখিল হাসি। 'বলিস কিরে....থুড়ি.....।'

ঘরে ঢুকেই উল্লাসে ফেটে পড়ল ঋজু। 'এই যে ফুলচোর আপনার সামনেই বসে আছে। দত্তবাবুই হচ্ছে গে.....।'

দত্ত-দাদাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। 'ব্যাটা বুদ্ধু, নিজের বাড়িতে কেউ চুরি করে?'

'করে দত্তবাবু। না হলে কচিরামের দোকানে গরম জিলিপি যে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'পাজি ছোঁড়া। তোর দত্তবাবু ছোটাচ্ছি....। প্রমাণ কী বল ছুঁচো?'

'প্রমাণ করছি। কিন্তু একি ইনসাল্টিং কথাবার্তা! পাজি ছোঁড়া....ছুঁচো.... আপনি গোয়েন্দাকে সম্মান করুন। অবশ্য আপনার কোনও দোষ নেই। পৃথিবীতে সব দোষীরাই ধরা পড়ে গেলে এইসব মিসবিহেব করেন।'

'হয়েছে হয়েছে, ঠিক আছে আপনি প্রমাণ করুন।'

ঠাম্মার চোখ গোলগাপ্পা। 'বলেন কী গোয়েন্দাবাবু। আপনার দাদাইয়ের কম্ম?'

ঋজু বলে, 'অবশ্য উনি ধরা পড়তেন না। প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ওনার রোজ জিলিপি খাওয়ার কথা শুনে। এদিকে বাড়িতে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ। তাই বাজার থেকে ফুল কিনে আনার পয়সাটা বাঁচিয়েই উনি জিলিপি খান। তাহলে ফুল? সেটা বাড়ির বাগান থেকে চুরি করে বেশ সামলে দিচ্ছিলেন। ব্যাপারটা সত্যি কিনা বুঝতে কাল আমি বাগানে ঢুকে মশার কামড় খেতে খেতে একটা মার্কার পেন দিয়ে টগর আর লঙ্কাজবার বোঁটাতে কালো দাগ মেরে দিয়েছিলাম।'

এই বলে ঋজু এক পকেট থেকে একটি মার্কার পেন আর অন্য পকেট থেকে ফুলের ঠোঙা বার করে ফুলগুলো মেলে ধরল।

'কিছু বুঝলেন? দেখুন বেশিরভাগ ফুলের বোঁটাতে সেই কালো দাগ।'

এবার দত্ত-দাদাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঋজু বলল, 'কি দত্তবাবু! বলি ফুলের তো পাখা গজায়নি যে বাগান থেকে উড়ে এসে রাধামাধবের পায়ে পড়ে যাবে?'

মুহূর্তে ঠাম্মা-দাদাইয়ের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ লেগে গেল। বেগতিক দেখে ঋজু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'ঠাম্মা তবে উঠি। আজ রবিবার, আমার মাঠে ফুটবল খেলার দিন।'

ও তখন রাস্তায়। হঠাৎ ঠাম্মার গলা শুনতে পেল, 'বুড়ো বয়সে মিষ্টি খাওয়া? কাল থেকে তোমার পাঁচটাকা বন্ধ। আমি নিজেই এবার বাগান থেকে ফুল তুলবো।'

ঋজুর দাদাইয়ের জন্য মন খারাপ হয়ে গেল।

'ইস, কেন যে কেসটা হাতে নিলাম!'

ছবি ঃ সুদীপ্ত দত্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর ছোটোদের লেখা

অনির্বাণ রায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে একবার জানিয়েছিলেন, 'আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল। কথিকা ধরণের লেখা। পরিচিত মহলে তা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।' মিত্র ইনস্টিটিউশনের ম্যাগাজিন মৈত্রী। সেখানে বেরিয়েছিল (১৯৩৬)।

ভাবাই যায় না, এ লেখা ক্লাস টেনের এক ছাত্রের। এই বুঝি ভবিষ্যতের পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা ছোটোদের জন্য। ওই 'মৈত্রী'তেই প্রকাশিত হল (১৯৩৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আর একটি লেখা 'ভবন ছাড়ায়ে ভুবনে।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই তখনও জানতেন না একদিন গালিভারের দলের সদস্য হয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়াবেন দেশবিদেশে, লিখবেন আমার বাংলার মতো বই, কিশোরদের উপযোগী করে সংক্ষিপ্তায়ন করবেন নীহাররঞ্জন রায়ের অসাধারণ বই 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।' কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তার আগেকার কথাগুলো সেরে নিই।

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি লিঃ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৬২/১৯৫৫) 'পাতাবাহার'। এখানে ছাপা হয়েছিল সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখের সঙ্গে তাপস চৌধুরীর গল্প 'এক জাহাজওলার গল্প'। সন্ধানীজন বলেন, তাপস চৌধুরী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লুকনো নাম। নৌ-বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা এই ছোটো গল্পটা অসাধারণ।

'ইহুদীদের গির্জার কাছে রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে পাজামা পরা রোগা একটা লোক ফুটপাথে বসে টিনের জাহাজ বেচে।' ইস্কুল থেকে যেতে আসতে দুলু রোজ দেখে। তার ইচ্ছে করে জাহাজ কেনে। পয়সা পাবে কোথায়। বাবা তার রেলগাড়িতে হকারি করে। লোকটাকে সে টিনের জাহাজ বেচতে দেখে আর মনে মনে কল্পনা করে বড়ো হয়ে সেও গোলদিঘির মতো মস্ত গামলা কিনে তাতে বড়ো বড়ো টিনের জাহাজ ভাসিয়ে দেবে। জাহাজগুলোর নাম দেবে সে 'চমক', 'তলোয়ার' 'হিন্দুস্থান' 'কাথিয়াবাড়', 'আকবর', 'হামলা', 'নর্মদা'।

এক ছুটির দিনে দুপুরে দুলু বেরিয়েছিল রাস্তায় 'যদি কোথাও ভালুক নাচ কিম্বা বাঁদর খেলা দেখতে পায়। সেইদিনও গির্জার কাছে টিনের জাহাজ বেচছিল সেই পাজামা-পরা লোকটা। অন্যদিনের মতো সেদিন ভিড় ছিল না। দুলুকে ডেকে লোকটা নিজে থেকে আলাপ পরিচয় করে। দুলুকে একটা জাহাজ উপহার দেয়। আর শোনায় তার জীবনের গল্প। তার ছেলেবেলার কথা। বাপ-মাকে হারিয়ে মামার কাছে মানুষ। পল্টনে নাম লিখিয়েছিল। ইংরেজ-জার্মানে যুদ্ধের সময় তাকে দেওয়া হয় নৌবহরের কাজে। জাহাজের খোলের মধ্যে কাজ। প্রাণ হাতে করে ঘোরা। খাটিয়ে খাটিয়ে জান বার করে দিত তবু ভালো লাগত কাজটা। সমুদ্রে কেমন যেন একটা নেশা আছে।' তারপর একদিন যুদ্ধ শেষ হল। ভাবা গেল এবার মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কোথায় কী। একদিন খবর এল 'বোম্বাইতে নৌবহরের একদল লোক বেঁকে বসেছে।' কাজ বন্ধ 'তলোয়ার' জাহাজে। ক্রমে ক্রমে সেই কাজ-বন্ধর হাওয়া পৌঁছে গেল অন্য অন্য জাহাজে। লেগে গেল নৌবহরের লোকের সঙ্গে গোরা সৈন্যদের যুদ্ধ। বেশ কিছুজন প্রাণ হারাল। জখম হল আরও কিছু বেশি জন। লোকটা গল্প শেষ করে দুলুকে উপহার দেয় 'তলোয়ার' জাহাজ টিনের তৈরি। তারপর লোকটা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় বগলের নীচে দুটো লম্বা লাঠি লাগিয়ে। দুলু দেখে লোকটা এক পায়ে জুতো পরে নিল। 'তোমার আরেক পাটি জুতো?' দুলু জিজ্ঞেস করে। লোকটা বলে, 'লাগবে না।' লোকটা পাজামার একটা পা তুলে দেখায়। দুলু দেখে 'হাঁটুর কাছ থেকে তার একটা পা কাটা'। কোথায় গেল পা-টা? জানতে চায় দুলু। লোকটা বলে, 'ওই পা-টা দিয়েই সেদিন আমি ইংরেজেদের লাথি মেরেছিলাম।'

গল্প শেষ হয় আর কথকের বুকের ভেতরকার প্রতিবাদের আগুন, শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতবর্ষের একজন মানুষের তীব্র জ্বালাযন্ত্রনা ছড়িয়ে পড়ে দুলুর মতো হাজার কিশোর-মনে।

'দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করা—এর চেয়ে গভীরতর জীবন-উৎসের কথা

আমি জানিনে। সুভাষ সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং তার সন্ধান আমাদের দিয়েছেন।' 'আমার বাংলা'র মুখবন্ধে লিখেছিলেন নীহারঞ্জন রায়। 'রংমশাল' পত্রিকার জন্য জোর করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কী লেখালেন? 'সেই এক যে ছিল বাংলাদেশে যা দেখেছি যা শুনেছি' তার কথা। শিল্পী চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি নিয়ে এ বই 'আমার বাংলা' বেরিয়েছিল (১৯৫১) ঈগল পাবলিশার্স থেকে। আছে দশটা অধ্যায় : গারো পাহাড়ের নীচে, ছাতির বদলে হাতি, দীপঙ্করের দেশে, বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ, শালমহুয়ার ছায়ায়, পাতালপুরীর রাজ্যে, বলের কলকাতা, জগদ্দল পাথর, চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা, মেঘের গায়ে জেলখানা, হাত বাড়াও। লেখা তো নয়, যেন ছবির পর ছবি তুলেছেন কলম-ক্যামেরায়। মনে ভরে যায়।

আমার বাংলা'র টানেই, বোধহয় এসে পড়েছিল নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'-কে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে সহজে সংক্ষেপে বলার পরিকল্পনা। স্পষ্ট করে বলা নেই বলেই 'বোধহয়' কথাটা ব্যবহার করতে হল। 'বাঙালীর ইতিহাস : সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। 'গ্রন্থকারের ভূমিকা'য় নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন : 'আমার কনিষ্ঠ সোদরোপম সুহৃদ, কবি, লেখক ও দেশব্রতী শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেদিন নিজের হাতে কিশোর সংস্করণ রচনার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন সাগ্রহ সম্মতিদানে আমার এতটুকু দ্বিধা ছিল না,.....

কঠিন লেখা সহজ। সহজ লেখাই কঠিন। সহজ করে লেখায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সিদ্ধকলম। 'কথার কথা' 'অক্ষরে অক্ষরে' এমন দুখানা বই যেখানে ছড়িয়ে আছে সহজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাজার উদাহরণ। প্রথম বইতে বলা হয়েছে ভাষার কথা, শব্দের কথা। একটা বিষয়কে ক-ত সহজভাবে তুলে ধরা যায়, এ বই তার প্রমাণ। পড়তে পড়তে মনে হবে কোথায় লাগে গোয়েন্দা গল্প, ডিটেকটিভ উপন্যাস। সব ফেল এর কাছে।

'অক্ষরে অক্ষরে' হল 'কথার কথা'র দোসর। এ বইতে ভাষার কথা তিনি অতি সহজ করে কিশোর মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বইয়ের শুরুতে আছে ছোট্ট ভূমিকা যদিও কথাটা ছেপে দেওয়া নেই। পড়লে মনে হবে না 'ভূমিকা' পড়ছি। একটা ছোটো গল্প, না না, পড়ছি একটা কবিতা : 'তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে চিৎকার করলেও তোমার কানে যাবে না।'

তাহলে উপায়? উপায় আমার হাতেই আছে। মুখের ভাষাটাকে যদি কোনো কিছুতে ধরে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলেই আর কোনো মুশকিল থাকে না। ভাষা পৌঁছে দেবার এই উপায়টার নামই লেখা।'

শিল্প-সাহিত্য আকাশ থেকে পড়েনি। সমাজ থেকেই উঠেছে। তার প্রমাণ? এ বইতে পাওয়া যাবে অজস্র প্রমাণ।

'সমাজের ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে। জলে যেমন গাছের ছায়া পড়ে, ঠিক তেমনি? শিল্প-সাহিত্যে সমাজের অকর্মণ্য ছায়া নয়।'

'অক্ষরে অক্ষরে' বিজব্বিজ করছে মাথা খেলাবার, ভাববার, মশগুল হয়ে থাকবার হাজারটা সূত্র। একটা সূত্রের কথা বলি। '....লেখার মধ্যে সমস্ত আটঘাট বেঁধে দিতে হয়। পড়ে কেউ যেন পারতপক্ষে ভুল না বোঝে।'

শুনে সহজ মনে হয়। কিন্তু হাতে কলম নিলে দেখা যায় কাজটা শক্ত। পড়ে পড়ে আর লিখে লিখে মক্‌শো করতে হবে। তবে লেখার হাত পাকা হয়।'

লেখার হাত পাকা করতে এবার বরং পড়ে নিই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্য তিনরকমের লেখা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, ছড়া। গানের ভাষায় উদারা-মুদারা-তারা।

ভ্রমণকাহিনী 'টো টো কোম্পানি' ছেপেছিল শ্যামলী প্রকাশনী, ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে। বইয়ের গোড়াতেই আছে ছন্দে বাঁধা মজার ছড়া 'একটু আধটু'। ছড়া কিন্তু আসলে ভূমিকা। একটু শোনাই, 'খড়খড়িয়ে/ খড়খড়িয়ে। ঘুরে বেড়াই/গাব্‌দা-গোব্‌দা/রং-চটা এক/ কাঠের লাট্টু। /এই রয়েছি, পরক্ষনেই চলে গেলাম/ কোথায় গেলাম? কোথায় গেলাম?/কী যেন নাম?/দাঁড়ান ভাবি/টিম্‌বাকটু।'

এ বইতে আছে নানা দেশ যাওয়ার কথা। উত্তর ভিয়েৎনাম, জার্মানির পটস্‌ডাম, বিলেত, হাঙ্গেরি, কায়রো, মস্কো আর নতুন ফুল। 'নতুন ফুল' ব্যাপারটা বোঝা গেল না তো! বলছি। 'আদিস আবাবা'। আদিস = নতুন; আবাবা = ফুল। বেড়াবার কথা লিখতে বসেও কলমের ঘাড় থেকে নামে না ভাষার ভূত। আসলে নতুন নতুন দেশ মানেই তো নতুন নতুন শব্দ, ভাষা। ভূতের কি আর নামার জো আছে ছাই! 'যদি হয় দূরের দেশ, মিথ্যে বলা যায় বেশ'—ইথিওপিয়ার একটা প্রবাদ উপহার দিয়েছেন পায়ের নীচে সর্ষে দিয়ে ঘোরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ওঁর সম্পর্কে সেই গল্পটা মনে পড়ল : কোথায় চললেন, সুভাষদা! এই একটু মস্কো যাচ্ছি! মস্কো নিয়ে মস্করা তোলা থাক। ঘুরে আসি নতুন ফুলে। অর্থাৎ আদিস আবাবায় যার পুরনো নাম ছিল ফিনফিনি (কী সুন্দর নাম) । চারদিকে পাহাড় ঘেরা উঁচু মালভূমি। জায়গাটা মনে ধরাতে ইথিওপিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিক সেখানে রাজধানী পত্তন করেন। ইথিওপিয়া হল আফ্রিকায় ঢোকার দরজা। সেখানকার লোকজন, রাস্তাঘাট, দোকান-পাট, লেক কত কিছুর বর্ণনায় ঝলমল করছে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত। মন বলে, লাফ মেরে চলে যাই ওখানে। চোখ বলে, যাওয়ার দরকার কী। এই তো সব দেখতে পাচ্ছ, দিনের আলোর মতো। সত্যি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কলম-ক্যামেরায় কী সুন্দর করে সব তুলে এনেছেন সকলের জন্য ওই দেশের ছবি।

'টো টো কোম্পানি'তে আছে চমৎকার একটা ভ্রমণকাহিনী। আমাদের এই কলকাতা শহরটাকে নিয়ে। ইয়াসিন নামে এক কিশোরের চোখ দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চিনিয়ে দিয়েছেন কলকাতার নানান এলাকা, মানুষজন। পড়তে পড়তে কখন অজান্তে ইয়াসিনের সঙ্গী হয়ে যাই মনে থাকে না। ইয়াসিনের আসল নাম ছিল ফটিক কিংবা ঝড়ু। গ্রামে প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ে সৎমার অত্যাচারে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। ফুটপাথে থাকত। প্রাণ বাঁচাতে জল খেয়েছে নানা ঘাটে। জেলে গেছে। মিশেছে ভিখিরিদের সঙ্গে। খিদিরপুর এলাকায় কাজ করেছে মিষ্টির দোকানে। চায়ের দোকানে। আলাপ হয়েছিল মাস্টারদাদুর সঙ্গে। তিনি ইয়াসিনকে একটা ছোটো নোট খাতা আর ডট-কলম দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন যা দেখবি লিখে রাখবি।' ইয়াসিন অন্যের চোখের আড়ালে তার সেই খাতায় কত কী টুকে রাখে। তার চোখে পড়ে যেসব জায়গায় আকাশছোঁয়া বাড়ি, বড়োলোকের বাস, সেখানে কম দেখা যায় কুকুর বেড়াল। কেন? না বড়োলোকেরা নাকি বাড়তি ভাত-তরকারি ফেলে না। বরফের আলমারিতে রেখে দেয়। কলকাতা শহরকে ইয়াসিন কেবল চোখ দিয়ে নয়, চেনে শব্দ গন্ধ দিয়েও। এক একটা এলাকায় আছে বিশেষ গন্ধ যেমন বৌবাজার। এখানে অব্যর্থ মিলবে 'ঠুকঠুক শব্দ, সোহাগার গন্ধ, ঢং ঢং আওয়াজ, বাঁকে ক'রে বওয়া ছানার গন্ধ, ঝাঁকার ক্যাঁচকোঁচ আর মুটেদের ভারি পায়ের থপথপ, ফলের গন্ধ, ব্যাপারীদের হাঁকডাক, মাছ ধরার চারের গন্ধ।'

রাত্তিরে ফুটপাথে সুয়ে ইয়াসিন স্বপ্ন দেখে। মিছিলের। কলকাতার ফুটপাথ আর বস্তির মানুষ সব চলেছে দল বেঁধে। প্রত্যেকের পরনে ধবধবে পোশাক। তাদের মুখে নেই আতঙ্কের ছায়া। হাতে পতাকা। তাতে লেখা ঃ কাজের, বাসস্থানের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের।

'আর সেই মিছিলে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে ইয়াসিন সকলের আগে আগে যেন ড্রাম বাজাতে বাজাতে চলেছে।'

কিশোরদের কথা মাথায় রেখে বন্ধু সুভাষকে দিয়ে জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞানী-রবীন্দ্র সুহৃদ্‌-এর জীবনী লিখিয়ে নিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শুরুতে সুভাষ একটা জরুরি কথা বলে দিয়েছেন জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে : 'জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের একটা বড় লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা করা। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞান কারো নিজের সম্পত্তি নয়—সব মানুষই এর মালিক। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন।' জগদীশচন্দ্রের এই মনোভাব সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে বুকের ভেতর চিরকালের জন্য রয়ে যায়। ভাবি, এখনকার দিনে এমন করে আর কেউ কি ভেবেছেন! ভাবতে পারেন।

একটা সত্যিকার জীবনী কী করে। চোখের সামনে নেই যে মানুষটা, তাকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠকের সামনে। বলে, দেখো, দেখে নাও। বুঝে নাও। চিনে নাও। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জগদীশচন্দ্র' এমনই এক জীবনী। খুব সহজ নয় এই কাজ।

গল্প-ভ্রমণকাহিনী-জীবনী ছাড়াও ছোটোদের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন অজস্র ছড়া। ছন্দমিলে ভরা সেইসব ছড়াদের দেখা যাবে কিছু কিছু কবিতার বইতে—চিরকুট, ফুলফুটুক, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, একটু পা চালিয়ে, ভাই—আর এইসব ছড়ার বইতে : মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো, সাত সকালের ছড়া, বকবকম, হরেকরকমবা। 'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো'তে তিনি দেখিয়ে দিলেন ছড়া লেখা কী সহজ। সবাই লিখতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই। লৌকিক ছড়ার সঙ্গে বসালেও বসানো যেতে পারে এদের। বিষয়ভিত্তিক

ছড়াগুলো এগিয়েছে দু-পা দু-পা করেঃ চা কফি কোকো।/এই বাস, রেখো।।/ঘোল শরবত লেবুপানি।/দাদু এলেন কাটিয়ে ছানি।।/...সিরাপ লস্যি কুলফি।/রাগলে স্যার টানেন জুলফি।। মিলের কথা বলা হয়েছিল। মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে কথাটা এই ছড়া দিয়ে : সব শেয়ালের এক রা। /ঘটি নিল, বাটি নিল/সুদখোর ঐ ড্যাক্‌রা।/কড়িগাছে ও গজায় কি লো/নিত্যি নতুন ফ্যাক্‌ড়া? দুয়ের ছন্দে দুলিয়ে দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দুই দিয়ে দুয়ে-মুষে নিয়েছেন তিনি। এরই পাশাপাশি অতি ছোটো ছোটো ছড়ায়। অল্প কথায়, সামান্য ছবিতে এক অসাধারণ জগৎ গড়ে দেন তিনি যেমন এই ছড়াটা : মাঘের শীত/পাখির গায়/থামল গীত। জীবন যায়।। ছড়া নয়, ছড়ার আড়ালে এক টুকরো জীবনের গান। মন্ত্রপ্রতিম। আবার ছড়ায় আছে গল্প যেমন 'হুপের মা-র গল্প'। কিংবা 'হুপের নয়, 'এক যে ছিল'। শেষেরটি পাওয়া যাবে 'ফুলফুটুক' নামের কাব্যগ্রন্থে।

ছোটোদের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সহজ পাঠ'। তার সঙ্গে ছবি এঁকে ছিলেন নন্দলাল বসু। 'সহজ পাঠ' দুখন্ড বাংলা সাহিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওই 'সহজ পাঠ'-এর ধাঁচে, 'জীবনের শেষ কয়েকটা বছর জুড়ে,....তাঁর অন্যান্য লেখার পাশাপাশি সাজিয়ে চলছিলেন প্রাথমিক শিক্ষার' এক বই। সে বই বেরিয়েছে এই দুহাজার দশে ক্যামেরায় তোলা ছবিকে সঙ্গী করে। এ বইয়ের মুখবন্ধ করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'আমাদের সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সহজেই যিনি বুঝতে পারতেন সাধারণ মানুষের মন, ছুঁতেও পারতেন তাকে সহজে। গ্রামবাংলার জগৎ বা ছোটোদের জগৎটাকে যেন নখদর্পণে দেখতে পেতেন তিনি। সেই দৃষ্টিশক্তিতে তিনি বুঝেছিলেন যে ছোটোদের ভাষা পরিচয়ের জন্য চলতি পথের বাইরে আরো কিছু চাই।' সেই 'আরো কিছু' নিয়েই এই বই 'শুনি দেখি পড়ি লিখি'। কী করে গড়ে ওঠে একটা শব্দ সেই নজিরের টানে ছড়িয়ে দেওয়া আছে আরও কিছু কথা যার এখানে ওখানে মিলেমিশে আছে কত না ছবি, দরকারি কত সব কথা, শঙ্খ ঘোষের কথা ধার করে বলা যায়, 'গোটা এক জীবনের ছবি, ঘরের জীবন আর বাইরের জীবন। প্রকৃতিলোক জীবলোক শিল্পলোক যন্ত্রলোক থেকে তুলে আনা নানারকমের শব্দ এখানে ছড়িয়ে থাকে স্তরে স্তরে, নানা জাতি নানা সম্প্রদায় তাদের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে জড়িয়ে থাকে এখানে। প্রত্যেক দিনের সংসার-সমাজ ভরে থাকে এখানে।' আসলে ছোটোদের দেখার চোখ, বোঝার মন ছোটোবেলা থেকে ঠিকঠাক তৈরি করে দিলে, আখেরে লাভ বড়োদের, আর সেই লাভ জুড়ে জুড়ে আমাদের এই দেশটা হয়ে উঠতে পারে সত্যিকার একটা দেশ, গোটা দুনিয়ার আদর্শ। সেই কথা মনে ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। ছোটোদের সব লেখায়, প্রায় সব ধরনের লেখায় ছড়িয়ে আছে সেই প্রচেষ্টা। শেষের এই বইতেও ধরা আছে এমন প্রয়াস। কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করি—

আজ ঈদ। এরপর রথ। আর চড়ক।
দুধ খুব গরম। এখুনি চুমুক দিও না। ফুঁ দাও। জুড়িয়ে যাক। তারপর চুকচুক করে খাও।
তুমি কি গাছপালা ভালোবাসো?
শুধু গাছ নয়, এমনকী পশুপাখিও।
বৃক্ষ রোপণ/বন সৃজন/নেয় দৃঢ় পণ/যারা সুজন।
যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, ততক্ষণ দিনমান।
সাঁজ অবধি এবেলা। সাঁজের পর ওবেলা।

দিব্যি গেলে সত্যি কথা
বলত যদি প্রত্যেকে
মানুষ হত সভ্য ভব্য
ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে।

পুনশ্চ ঃ

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেই উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের 'সন্দেশ'এর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, ১৯৬১ সালে। সেইদিন থেকে আজকে 'সন্দেশ' ৫০ বছরে পৌঁছেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে ছিলেন প্রথম মাত্র কয়েক বছর, তবু তাঁর 'সন্দেশ'এর প্রতি অবদান তুচ্ছ নয়। মনে পড়ে তাঁর বিখ্যাত ছড়াটি? ('সেরা সন্দেশ' দেখে নিও)

"মাথার ওপর খাটানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু
নীচে সবুজ গালচে পাতা
খেলা দেখে যান, বাবু।".....ইত্যাদি।

এইভাবে তাঁকে 'সন্দেশ'এর জন্য কলম ধরতে হয়েছিল। লিখতে হয়েছিল প্রবন্ধ (যেমন, 'জেনি মেমসাহেব নয়'), এবং সর্বোপরি লিখতেন অনবদ্য সব সম্পাদকীয়, নিজের নাম না দিয়ে। তাঁর সেই সব লেখাগুলি আমাদের কৈশোরকে নতুন এক রুচি আর রসে ভরিয়ে দিত। সেই যুগে গল্পচ্ছলে ২০০০ সালের মোবাইল ফোনের কল্পনা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। তাঁর লেখা 'মাটির নীচে রেলগাড়ী', প্রবন্ধে মস্কোর পাতাল রেলের যে বর্ণনা করেছেন তা আজও আমরা ভুলতে পারিনি।

সম্পাদকীয়র মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাদেশিকতায়।

সস্ত্রীক সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তিনি কত বড় মাপের শিশুমনের রূপকার তা ঐ সামান্য কয়েকটি লেখার মধ্যেই প্রতিভাত হয়। পারলে পুরনো 'সন্দেশ' থেকে সে সব পড়ে নিও। 'হাত পাকাবার আসর', 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' এসব নাম তাঁরই দেওয়া। তাঁর রুচিশীলতা ও কর্মোদ্যম 'সন্দেশ'কে প্রতিষ্ঠা দিতে অনেক সাহায্য করেছে।

সঃ সঃ

সুসিপ্রিয় মহাকাশচারী

বরুণ মজুমদার

জাপানের নাগরিক পৈচি ওয়াকাতা মহাকাশে হেঁটে আসার ঘোর কাটতে না কাটতেই মাছের স্তূপে ঝাঁপ মারলেন। না, এই মহাকাশচারী মহাশূন্য থেকে মহাসাগরে ঝাঁপ দেননি। আসলে এই জাপানী মহাকাশচারী 'সুসি' খেতে খুব ভালবাসেন। এই সুসি হল কাঁচা মাছের বেণু। জাপানের খাদ্যরসিকদের এটা খুবই প্রিয় বস্তু।

আরো ৬ জন মহাকাশচারীর সঙ্গে সাড়ে চার মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে কাটিয়ে মহাকাশযান এনডেভারে চড়ে ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে পৈচি পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন। সেই দিনটা ছিল আবার তাঁর জন্মদিন। সাড়ে চার মাস পর বার্থডে বয় পৃথিবীর মাটি ছুঁচ্ছেন, এটা কি চারটিখানি কথা? কেপ ক্যানাভেরালের টারম্যাকে প্রায় ৫০ জন জাপানী জড়ো হয়েছিলেন। চারপাশে জন্মদিনের অঢেল খাবার। অফুরন্ত সুসি। কিন্তু তা খাবে কে? মহাকাশে ভারহীন অবস্থায় ভেসে ভেসে পৈচির এমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর মাটিতে আর ভাল করে পা-ই ফেলতে পারছেন না পৈচি। খাওয়া তো দূরের কথা।

মহাকাশযান এনডেভার থেকে নামতেই তাঁকে মোটামুটি পাঁজাকোলা করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন মেডিকেল কর্মীরা। তখনই পৈচির নজর পড়ে সুসির দিকে অর্থাৎ সেই মাছের মেনুর দিকে। এরপর পৈচি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। দে ছুট সেই মাছের দিকে। অবশ্য ঠিক তখনই নয়, একটু পরেই তাঁর জিভ লক্ লক্ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত মেডিকেল কর্মীরা আপত্তি করায় তখনকার মত মাছের স্বাদ নেওয়াটা সম্ভব হয়নি, বেশ কিছু পরে তাঁকে সেই সুসি খেতে দেওয়া হল। দীর্ঘদিন পরে তা খেয়ে পৈচি বেজায় খুশি

বাবার কথা

সুনৃতাবরী সেন

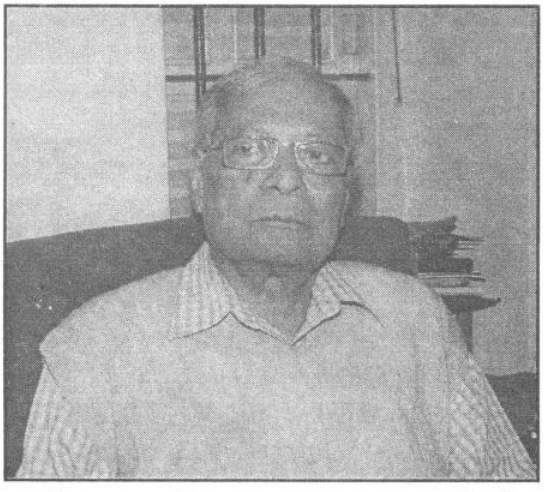

বাবার কথা লিখতে বসে মনে অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে। বাবা-মা সম্পর্কে কিছু লেখা খুব কঠিন কাজ। সে লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় পরিণত হতে বাধ্য। সন্তান হিসেবে এই ব্যক্তিগত জায়গাটা অতিক্রম করা নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু সন্দেশ পত্রিকা থেকে যখন অনুরোধ এলো তখন আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। প্রথমতঃ পিতৃস্মৃতি রোমন্থনের প্রতি একান্ত আগ্রহ আর দ্বিতীয়তঃ আমি সন্দেশের গ্রাহক ছিলাম দীর্ঘকাল। লেখা বেরিয়েছে। ধাঁধার উত্তর পাঠিয়েছি, ফলে যোগাযোগটা নিবিড়। বাবাই আমাকে গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ এবং সত্যজিৎ রায়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে, সেই সময় সন্দেশের একটি দোকান ছিল। প্রতি মাসে নতুন সংখ্যা বেরোলে বাবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে নিয়ে আসতেন। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম। রঙীন মলাট, নানা স্বাদের লেখা, হাত পাকাবার আসরে লেখা পাঠিয়ে ছাপার অক্ষরে দেখার উৎসাহ— এখনও মনে আনন্দ দেয়।

আমি চেষ্টা করবো আমার লেখাটা যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার থেকে দূরে রাখতে। ভাষাতত্ত্বে সুপন্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাবা (সুভদ্রকুমার সেন) কেমন ছিলেন, অনেকেই জানেন। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বাবা কেমন ছিলেন সেটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। অবশ্য বাবা হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সে কথাও এসে পড়বে।

শৈশবে যাদের মুখ আমার কাছে খুব স্পষ্ট তার মধ্যে দুজন হলেন আমার বাবা আর ঠাকুমা। আসলে খুব ছোটবেলা থেকে এঁরা দুজন আমার খেলার সাথী ছিলেন। বাবা ছোটদের সঙ্গে খুব ভালো মিশতে পারতেন। যেমন ধৈর্য্য সহকারে খেলতে পারতেন, তেমনি তাদের মতো হয়ে গিয়ে গল্পও করতে পারতেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা যখন বর্ধমানে যেতুম তখন বাবা দেখতুম দিব্যি আমার পিসতুতো দাদার সঙ্গে ক্রিকেট খেলছেন। অসম্ভব হৈ হৈ করে বাবা, কাকা, জেঠু, দাদারা মিলে ক্যারাম খেলছেন। তখন বাবার বয়স আন্দাজ করা কঠিন হতো। আমাদের পাশের বাড়িতে দুটি ছোট ছেলে মেয়ে থাকতো। তারা এখন বড় হয়ে গেছে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে তাদের ভীষণ ভাব ছিল। তারা এলে বাবা নিজের লেখাপড়া ছেড়ে গল্প করতেন এবং খুব গম্ভীরভাবে ওদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন যেন কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। বাবা বলতেন, 'সবাইকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়। ছোটদেরও তুচ্ছ করতে নেই।'

বাবা সকলের সঙ্গে তাদের মতো হয়ে মিশে যেতে পারতেন। বাজারের বিক্রেতা, রিক্সা চালক, মালবাহক, বাড়ির দারোয়ান থেকে পরিবারের সদস্য, বন্ধু থেকে সহকর্মী, বড় থেকে ছোট, ছাত্র-ছাত্রী থেকে বিদেশী পন্ডিত এবং পরিচিত সকলের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। কত সময় দেখতাম অনেকে বাবার কাছে এসে কত আবোল তাবোল কথা বলে যেতেন। আমরা বিরক্ত হতাম। বাবা ধৈর্য্য সহকারে শুনতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধের কথা বাবা মন দিয়ে শুনতেন। বাবা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি প্রায়ই বাপের বাড়ি গিয়ে শুনতাম বাবার আজ এখানে মিটিং কাল ওখানে মিটিং। আমি রাগ করতাম। বাবা বলতেন 'আসলে অমুক বলল তাই না বলতে পারলুম না।'

বাবার রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বাবা জন্মেছিলেন ব্রিটিশ জমানার শেষে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা এবং রুচিশীলতায় বাবা ছিলেন ভিক্টোরিয়া মনোভাবাপন্ন। বাবা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা এবং আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন আমার পিতামহের কাছ থেকে। ছেলেবেলায় বাবা যা দেখেছেন, যে বই পড়েছেন, যেখানে যেখানে দাদার (আমার পিতামহ সুকুমার সেন) সঙ্গে গেছেন তিনি সেই সেই জিনিসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাতে চাইতেন। তাঁর প্রথম ভ্রমণ বাবার সঙ্গে দিল্লি-আগ্রা। সেই স্মৃতি বাবার মনে খুব সজীব ছিল। শৈশবে আরো অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন, তবে সেগুলির স্মৃতি ছিল অস্পষ্ট। সেই দিল্লী ভ্রমণে কুতুব মিনার দেখবার কথা বার বার বলতেন। নতুন দিল্লী থেকে মেহেরৌলীর পথ তখন ছিল নির্জন। টাঙ্গা করে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ

মুসলমান টাঙ্গাওয়ালা বলেছিল, "খোকাবাবু যখন বড় হয়ে বউ নিয়ে আসবে, আমি ঘুরিয়ে দোব।" বাবা বলতেন ভারতবর্ষ দেখতে হলে প্রথম দিল্লী-আগ্রা দেখা উচিত।

বাবা আমাকে প্রথম ট্রামে এবং ডবল ডেকার বাসে চাপিয়ে ছিলেন। গঙ্গার ধারে অধুনালুপ্ত গে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছিলেন। খুব শৈশবে বাবার সঙ্গে কোয়ালিটি রেস্টুরান্টে গিয়ে প্রথম সুগার কিউব খাবার আনন্দ এখনও মনে অম্লান। বাবা যখনই পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গী-নিউ মার্কেট অঞ্চলে যেতেন তাঁর শৈশবে সে জায়গাগুলি কেমন ছিল তার বর্ণনা দিতেন। Firpos-এ বসে খাওয়ার কথা প্রায়ই বলতেন। আমি Firpos দেখিনি, আগেই উঠে গিয়েছিল। অনেক বড় বয়স অবধি দাদা বাবাকে চৌরঙ্গীর রাস্তা হাত ধরে পার করে দিতেন। বাবা বলতেন খুব লজ্জা করতো। কিন্তু শেষ যেদিন বাবার সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট গিয়েছিলুম সেই বাবা-ই আমার হাত ধরে রাস্তা পার করে দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই অধ্যাপিকা কন্যাকে বাবা কোনদিনই ভাবতে পারতেন না, বড় হয়েছে।

বাবার জন্ম হয়েছিল বর্ধমানে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি সবই ছিল কলকাতায়। এই শহরকে তিনি চিনতেন যেমন ভালো, ভালোবাসতেন তেমনি। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে শহর কি সুন্দর ছিল, সে কথা প্রায়ই বলতেন। বাবা ছিলেন খেলায় ভীষণ আগ্রহী। স্কুলে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি খেলেছেন এবং বয়েজ স্কাউট্সের রীতি মতো উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯ সালে প্রথম বাবা ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। ধারবাহিকভাবে বিশ্বকাপের ফাইনাল (১৯৮৭) পর্যন্ত বাবা ইডেন গার্ডেনের কোন খেলা বাদ দেননি। নব্বইয়ের দশকের গোড়া অবধি বাবা যেতেন। পরে ভাই যখন বড় হল তখন ভাই যেতো। বাবা CAB-র বার্ষিক সদস্য ছিলেন। গোড়ার দিকের ইডেন গার্ডেনের কথা, বিশেষ করে কি সুন্দর সবুজে ঘেরা ছিল সে কথাও বাবা খুব বলতেন। এই মাঠে পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্রিকেটার আসিফ ইকবাল তাঁর অবসর ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আউট হয়ে যাবার পর ৮০ হাজার দর্শক standing ovation দিয়েছিল। বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে খুব গৌরবান্বিত বোধ করতেন।

বাবা ছিলেন মোহনবাগানের সদস্য। ফুটবল খেলা হলে বাবা মাঠে যাবেনই। মোহনবাগানকে জেতানোর ব্যাপারে বাবার নানারকম বিশ্বাস ছিল। ডিমভাজা খেয়ে মাঠে যেতেন। কারণ এটা বাবার তুকের মতো ছিল। মোহনবাগান হেরে গেলে বাবা ভীষণ গম্ভীর হয়ে যেতেন। কিছু বলতে গেলে অযথা বকুনি খেয়ে যেতাম। তাতে অবশ্য ঠাকুমা (দাদি) বাবাকে আরো বকতেন। ৮০ সালে মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তারপর বাবা আর কোনদিন ফুটবল মাঠে যাননি। চুণী গোস্বামীর সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল। পেলে কলকাতায় এলে বাবা মাঠে গিয়েছিলেন খেলা দেখতে। মোহনবাগানের প্রতি বাবার যে প্রবল অনুরাগ তার খানিকটা বোধহয় দাদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ১৯১১ সালে খালি পায়ে মোহনবাগান 'গোরাদের' হারিয়েছিল, এ গৌরব যেন মনে হতো দাদার একান্ত ব্যক্তিগত গৌরব।

বাবা নিজে ক্রিকেট, ফুটবল খেলেছেন বলে খুব ভালো বুঝতেন। বিশেষ করে ক্রিকেটে ভারত হারলে বা কোন প্লেয়ার খারাপ খেললে মিডিয়ায় যে সমালোচনার ঝড় উঠতো আমরা সেভাবেই ভাবতাম। বাবা কিন্তু সুন্দর বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন একজন প্লেয়ার কেন খেলতে পারলো না বা দল কেন জিতলো না। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে বুঝে তারপর কোন বিষয় মতামত প্রকাশ করতে বলতেন। শচীন তেন্ডুলকর কেন ভাল প্লেয়ার, তার কি লক্ষণ বাবা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতেন। বাবা খেলা যেমন ভালোবাসতেন তেমনি ভালো বুঝতেন। খেলা থেকে লেখাপড়া সব বিষয় ওপর বাবা ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন।

বাবার বিশ্বাস এবং মতামত ছিল খুব দৃঢ়। কতকগুলো বিষয় তিনি কোন আপোষ করতেন না। চীনে খাবার খেতে ভালোবাসতেন। পিপিং চাইনিজ রেস্টুরান্টের খোদ চীনে কর্তা যখন ছিলেন বাবা সেখানে খেতেন। ভদ্রলোক ব্যবসা বিক্রি করে দেশে চলে যাবার পর আর যাননি। তাঁর সঙ্গে বাবার বেশ খাতির ছিল। তারপর চীনে খাবার খেলে Waldorf-এ যেতেন। তিনি বরাবর কেক্ খেতেন Flury's থেকে। শেষ যেদিন Flury's গিয়েছিলেন একটি ছোট্ট বাক্সে করে আমার জন্য ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক এনেছিলেন। বরাবর চা খেতেন সুবোধ ব্রাদার্সের, মিষ্টি খেতেন গিরিশচন্দ্র দে এবং নকুড় চন্দ্র নন্দী অথবা গাঙ্গুরাম থেকে, মাছ আনতেন মানিকতলা বাজার থেকে। বাবার স্বাদ এবং পছন্দ মানিকতলা বাজারের মাছ বিক্রেতারা জানতেন। সেরা মাছটি সব সময় 'মাস্টার মশাই'-এর জন্যে রেখে দিতেন। বাগবাজার বা কোলাঘাটের ছাড়া বাবা ইলিশ মাছ খেতেন না। কিন্তু ভালো জিনিস ভালোবেসে খেতেন। সব থেকে ভালোবাসতেন পোস্ত আর দুধ দিয়ে আলুভাতে দিয়ে ভাত খেতে। মাছ-মাংসের মধ্যে শেষেরটিই বেশি পছন্দ করতেন।

দাদার জন্য বাবা জীবনে অনেক বড় মাপের মানুষের সঙ্গলাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রভাব বাবার জীবনে কিভাবে পড়েছিল, বাবা আমাদের তা বারবার বলতেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দাদা এবং বাবা দুজনেরই শিক্ষা গুরু। কোন কথায় তিনি বাবাকে একবার বলেছিলেন

জীবনে সুখী হওয়াটাই বড় কথা। এ কথা বাবা খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এবং আমাদেরও বার বার বলতেন। নিজের মাস্টার মশাইদের সম্পর্কে বাবার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ভালো ভালো শিক্ষকদের কাছে শিক্ষালাভ করার যে গৌরব তা তিনি অনুভব করতেন।

বাবার স্কটিশচার্চ কলেজে ছাত্র জীবনের গল্প খুব বলতেন। বিশেষ করে এই সময় সব দিক থেকেই বাঙালি জীবনে ছিল উত্তরণের জোয়ার। ভালো শিক্ষক, ভালো ছাত্র, ভালো সাহিত্যিক, সবই তখন বাঙালি জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিল। বাবারা কয়েকজন মিলে 'যাত্রী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সাহিত্যিক সেখানে লিখতেন। তখনকার বাঙালির মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে বাবা আজীবন বিশ্বাস করতেন। এই বাঙালিয়ানার প্রভাব তখন বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষভাবে পড়েছিল। বাঙালির icon উত্তমকুমার সেই মধ্যবিত্ত নায়কের চরিত্রে তখন প্রতিষ্ঠিত। বাবার ফেভারিট অভিনেতা ছিলেন। তবে অভিনেত্রী হিসেবে বাবার সব থেকে ফেভারিট ছিলেন মেরিলিন মনরো। বাবা নিজেও অভিনয় করেছেন। আমাদের বর্ধমানের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হত। আত্মীয়-স্বজনরাই অংশ নিতেন। বাবাও অভিনয় করতেন। তবে এ সব যখন হত তখন আমি খুব ছোট। একবার বাড়িতে বিজয় নাটক অভিনয় হয়েছিল। বাবা নরেনের পাঠ করেছিলেন। সেটা কিছু কিছু মনে আছে। বাবার সব থেকে পছন্দের গায়ক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর পোশাক, চাল-চলনে যে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ধরা পড়তো তা বাবাকে খুব আকৃষ্ট করতো। তখন খুব জলসা হত। বাবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর গান শোনবার সুযোগ হারাতেন না। বাবার জন্যই আমিও একবার হলে বসে ওঁর গান শুনেছিলাম। আমারও ওঁর গান খুব ভালো লাগে। আমার ছয়-মাসের মেয়ে যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর গান শুনতে শুনতে নির্বিবাদে খেয়ে নিত, বাবা তখন গর্ব করে বলতেন এই হচ্ছে কালজয়ী শিল্পীর গুণ। একবার বাবাদের কলেজের কোন অনুষ্ঠানে উনি গান গাইতে এসেছিলেন। একজন ছাত্র একটি ১০০ টাকার নোট দিয়ে autograph করে দিতে বলেছিল। উনি রাজি হননি। টাকা নষ্ট করতে ওঁর আপত্তি ছিল।

বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় 'ঈশান স্কলার' হয়েছিলেন। অধ্যাপক হিসেবেও বাবার বিশেষ সুনাম ছিল। আমার যে কোন বিষয় চট করে কিছু জানতে হলে আগেই বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম। আমাকে ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যের জগতে বাবাই প্রবেশ করিয়েছিলেন। শেক্সপীয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ বাবাই চিনিয়ে ছিলেন। তবে বাবার একটা স্বভাব আমি পাইনি। বাবা খুব কবিতা পড়তেন। আমার রবীন্দ্রনাথেই শেষ। তবে উচ্চমানের সাহিত্য মনকে কতখানি প্রসারিত করে এবং হৃদয়বৃত্তি উদার করে তোলে তা বাবার সঙ্গে আলোচনা করে এবং বাবার জীবনদর্শন থেকেই জেনেছি। সত্যজিৎ রায়ের ''ক্লাসফ্রেন্ড'' গল্পটি বাবা খুব উল্লেখ করতেন। ওঁর লেখাতেও যে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি ফিরে ফিরে আসতো সেগুলি বাবাকে খুব আকর্ষণ করতো।

বাবা নিজেকে শেক্সপীয়রের tragic hero-দের সঙ্গে তুলনা করতেন কারণ সবসময় 'to be or not to be' এই দোলাচল সাংসারিক ক্ষেত্রে বাবাকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন 'one who is born to be hanged will never be drowned'* ধর্ম বিশ্বাসে কোন বাড়াবাড়ি ছিল না তবে ঈশ্বরে গভীর আস্থা ছিল, যদিও কোনদিন কোন মন্দিরে বা মূর্তিতে বাবাকে প্রণাম করতে দেখিনি। নিজে ক্রীশ্চান স্কুলের ছাত্র ছিলেন বলে বাইবেল সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিপদে বাবার কাছে উপদেশ চাইলে যে কথাগুলি বলতেন সেগুলি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন। মনে হত তখনই যেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

এহেন বাবার sense of humour ছিল খুব গভীর। যে কোন পরিবেশকে বাবা আনন্দময় করে তুলতে পারতেন। নানারকম সরস কথা বলে হাস্য-পরিহাস করতে পারতেন। তখন বাবাকে বন্ধু বলে মনে হত। বাবা বরাবর আমার বইতে নানা রকম মজার মজার কথা লিখে দিতেন। বিশেষ করে একটি এখন মনে পড়ছে ঃ

'নূপুর নূপুর ডাক পাড়ি
নূপুর গেছে কার বাড়ি
নূপুর এখন পড়ছে শাড়ি;
শাড়ি পরে কি করবেন?
ব্লু লোটাসে পাড়ি দেবেন।
ছিষ্টি কাজ বাকি, কেবল ফাঁকি
দেখছো মেয়ের কি আক্কেল
লক্ষ কোটি বার্ণাকেল!

(এটি বাবা Tintin and the Blue Lotus-এ লিখে দিয়েছিলেন)। যে সব বইতে বাবা এগুলি লিখে দিতেন আমি সেই বইগুলিই বন্ধুদের বেশি করে দিতাম, যাতে তারা অবাক হয় আর আমারও তাতে বাবার সম্পর্কে খুব গর্ববোধ হতো। বড় বয়সেও বাবা কোন বই দিলে বলতাম কিছু লিখে দিলে না? বাবা বলতেন, বড় হয়েছো আর কি ওসব লেখা উচিত?

** বাবা এটা শেক্সপীয়রের* The Tempest *নাটকে গঞ্জালোর মুখের কথার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাল্লাকে দেখে গঞ্জালো বলেছিলেন,* 'He'll be hanged yet'... *অর্থাৎ এর কপালে ফাঁসি আছে, তাই জলে এর মৃত্যু হবে না। তাই জাহাজটিও নিশ্চয় বেঁচে যাবে, আমরা বাঁচব।*

পিকু

মধুশ্রী গুপ্ত

পিকুকে আর এ পাড়ায় দেখা যায় না। পিকু চলে গেছে। কোথায় যে পিকু গেছে তা রুম্‌নি জানেই না। কবে যে পিকু শেষ এপাড়ায় এসেছিল তাও ঠিক মনে পড়ে না রুম্‌নির। হয়তো বা গত বছর। না! না! গত বছর তো উমেশ দাদুদের নতুন বাড়ীটা তৈরি হয়েই গেছিল। তাহলে পিকু বোধয় শেষ এসে ছিল গতবছরের আগের বছর।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। এবার ঠিক মনে পড়েছে রুম্‌নির। সেই— সেই তখনই শেষ বারের মত পিকু এসেছিল এপাড়ায়।

সত্যি কথা বলতে কি পিকুকে রুম্‌নি কোনোদিন চোখেই দেখেনি। তবু—তবু কেন যে পিকুকে রুম্‌নির এত আপন মনে হয় তা রুম্‌নি নিজেও জানে না। পিকুকে রুম্‌নি যদিও দেখেনি কখনো, তবু ওই পিকু নামটা কিন্তু রুম্‌নিরই দেওয়া।

সেবার এ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে জিন্‌জুদিদি এসেছিল কলকাতায়। জিন্‌জু দিদি প্রায়ই আসত রুম্‌নিদের বাড়ীতে ঠাম্‌মা জিন্‌জু দিদিকে বলতেন, "একটা গান গা তো শুনি।"

জিন্‌জু দিদি ঠাম্‌মাকে গান শোনাতো। রবি ঠাকুরের সব গান। সে সব গান রুম্‌নির কোনোটা চেনা। কোনোটা আধচেনা। আর কোনোটা রুম্‌নির একেবারেই অচেনা। তবে এই সব গানের মধ্যে রুম্‌নির যে গানটি সব থেকে ভালো লাগত সে গানটার কথার কোনো মানেই বুঝত না রুম্‌নি। কিন্তু গানটার সুরটা রুম্‌নির সমস্ত মনটা ছেয়ে থাকত। ভরে রাখত একটা দারুণ ভালোলাগায়। গানটার কেবল একটা লাইনই রুম্‌নি গাইতে পারত। আর সেই একটা মাত্র লাইন সারাক্ষণ রুম্‌নির মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করে গুঞ্জরিত হতে থাকত—গাহে পিকু কুহু কুহু।" কিন্তু পিকুটা যে কে সেটা রুম্‌নি বুঝতে পারত না।

একদিন রুম্‌নি ঠাম্‌মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "পিকুটা কে গো ঠাম্‌মা?"

প্রথমে ঠাম্‌মা ভালো বুঝতে পারেননি। তাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "পিকু? কোন পিকুর কথা বলছিস তুই?" রুম্‌নি মাথা দুলিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে বলল, "ওই যে জিনজু দিদি রোজ গান করে না—গাহে পিকু কুহু কুহু। এইবার ঠাম্‌মা হেসে ফেললেন ফিক্ করে, "ওরে বোকা মেয়ে ওটা 'পিকু' কেন হবে? ওটা 'পিকো'। তুমি জানো না বুঝি পিকো কে? পিকো হল কোকিল পাখি। কোকিলের গান তুমি শোনো নি বুঝি কখনো? ঠিক আছে এবার বসন্তকালে এলেই আমি তোমাকে পিকোর গান শোনাবো।"

"বসন্তকাল কবে আসবে ঠাম্‌মা?" রুম্‌নির প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে থাকে পিকোর গান শোনার জন্যে।

ঠাম্‌মা পানের বাটাটা অকারণ একটু নাড়াচাড়া করতে করতে জানলা দিয়ে পাতাবিহীন কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "যখন শীত শেষ হবে, গাছে গাছে যখন কচি কচি পাতা দেখা দেবে—শিমূল আর পলাশ গাছে যখন ফুল ধরবে লাল লাল—সেই তখন বসন্তকাল আসবে। আর সেই তখন আসবে কোকিল পাখি। তোমায় গান শোনাবে।"

একথা শুনে রুম্‌নির হঠাৎ ভারী মন খারাপ হয়ে

গেছিল। বসন্তকালের যে তখনো ঢের দেরী। এখনো তো শীতই পড়েনি ভালো করে। একটা খোলা হাওয়ায় উড়ে আসা ওড়নার মত খুব আস্তে আস্তে একটা হিমেল সন্ধে নামে। সকালবেলা হিম পড়ে ঘাসে ঘাসে। মুঠো মুঠো শুকনো পাতা ঝরে পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে। সকাল বেলা লক্ষ্মীদিদি সেই সব ঝাঁট দিয়ে জড়ো করে রাস্তার মোড়ে। আগুন জ্বেলে দেয় খানিক পরে। তারপর পাতার আগুন নিভে গেলে একটা হাল্কা নীল ধোঁয়া পাক খেতে খেতে উড়ে যায় বাতাসে ভর করে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে তা আর রুম্‌নি গুণে রাখেনি। শীত যে এসে আবার কবে পায়ে পায়ে বিদায় নিয়েছে রুম্‌নি তা তেমন করে খেয়ালই করেনি। স্কুলে পরীক্ষা থাকে যে। তাই বন্ধ ঘরে, জানলা দরজা বন্ধ করে রুম্‌নি বসে বসে পড়ে নয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রুম্‌নির অজান্তে বয়ে যায় শীতের সকাল। কমলালেবু রঙের মিঠে রোদ নিয়ে ধীরে ধীরে শীতের দুপুর কাটে মেঘহীন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে। পাতাবিহীন গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে চুপ্‌টি করে।

পরীক্ষার বাইরে রুম্‌নি আর কোনো কিছুর দিকেই তাকাবার সময় ছিল না ক'দিন। পরীক্ষার সিলেবাসটা যে কী বিরাট কী বলব। সিলেবাসগুলো এত বড় যে সব বিষয়ের সব সিলেবাস রিডিং পড়তে গেলে পুরো একটা ঘণ্টাই লেগে যাবে। পড়াশুনো করতে রুম্‌নির ভারী ভালো লাগে। তা বলে পরীক্ষার সময় একসঙ্গে এই এত, এত পড়া?

তাই পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন তো রুম্‌নি বারান্দায় বেরিয়েই অবাক হয়ে গেছিল। ওমা! কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর ডালপালাগুলো যে কচি কচি পাতায় একেবারে ভরে গেছে। রাস্তার এপারের দেবদারু গাছগুলো কচি সবুজে ঢেকে গেছে যেন। রাস্তার দু'ধারে দেবদারু গাছগুলোয়, শিমূল গাছগুলোয় আকাশমুখী ফুল ধরেছে আগুন রঙা।

রুম্‌নি শুধু দেখছে আর দেখ্‌ছে। দু'চোখ ভ'রে চেয়ে চেয়ে দেখছে রুমনি। আর ঠিক তখন আকাশ-বাতাস শিউরে দিয়ে, আসন্ন সন্ধ্যার স্তব্ধতাকে ভেঙে খান্‌ খান্‌ করে, ঘন পাতার সবুজ মলমলের পর্দার আড়াল থেকে হঠাৎ 'কুহু কুহু' করে গান গেয়ে উঠল একটা কোকিল পাখি। আর অমনি রুম্‌নি চেঁচিয়ে উঠল, "ঠাম্মা! ঠাম্মা! ওই তো—ওই তো পিকু গান শোনাচ্ছে আমাকে।"

সারা বসন্তকালটাই গান শুনিয়েছিল পিকু। উমেশ

দাদুদের দোতলা বাগানওলা বাড়ীটার সামনে রাস্তার ওপর যে বকুল-গাছটা আছে, তার ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে গান শোনাতে সে। রুম্‌নি রোজ বিকেলে চুপ করে ছাদে উঠে গান শুনত পিকুর।

তারপর একদিন যখন কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহর ফুটল আর গন্‌গনে আগুনের মত রোদ উঠল আকাশ জুড়ে তখন পিকুর গান থেমে গেল। পিকু আর গাইল না। ঠাম্মা বললেন, "আবার সামনের বসন্তে পিকু আসবে তোমায় গান শোনাতে।"

একটা বছর কোথা দিয়ে যেন হুস্ করে কেটে গেল। আবার গাছে গাছে নতুন পাতা জাগল। কুঁড়ি ধরল গাছে গাছে। ফুল ফুটল থোকায় থোকায়, মৌমাছিরা ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে। ছুটে এল মন-কেমন করানো সেই দক্ষিণ হাওয়া। এল না কেবল পিকু।

পিকু আসবে কেমন করে? যেখানে পিকু বসে গান শোনাত, সেই ঘন-পাতায় ঢাকা, ফুলের গন্ধ ঢালা বকুল গাছটার ঠিক সামনে যে উমেশ দাদুর মস্ত উঁচু একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি তৈরি হয়েছে। কবেই ধুলোয় মিশে গেছে উমেশ দাদুদের সেই বড় বড় থাম আর জুঁই-লতায় ছাওয়া মস্ত বড় বারান্দাওলা পুরোনো বাড়ীটা।

রুম্‌নি জানলার কোলে বসে রাস্তা দেখছিল। পথের ধারের গাছগুলোতে দেখা দিয়েছে কচি সবুজ, নতুন পাতা। পাশের বাড়ীর নলিনী দাদুদের বাগানের আমগাছগুলোকে সোনালী আমের মুকুল যেন সোনায় সোনায় মুড়ে দিয়েছে। গাছে গাছে বাসা বাঁধছে কাকেরা।

রাস্তার এপারে আকাশের গায়ে একমুঠো লাল আবীর ছড়িয়ে একটা বকুল গাছের ওপারে অস্ত যাচ্ছে সুয্যিমামা। সূর্যটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বুঝি বা ধরা পড়েছে বকুলগাছের ডাল-পালায়।

চারিদিকটা, সারা আকাশটা ভরে আছে একটা লালচে আভায়। বকুলগাছের ওপারে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে লাল টোমাটোর মত রাঙা সূর্যটা। টি.ভি.র এ্যান্টিনায় লাফালাফি করচে চারটে চড়ুই। আকাশ সাঁৎরে উড়ে গেল ক'টা চাতক পাখি। দলছুট কাক ছেঁড়া পাখায় ভর করে পাড়ি দিচ্ছে কোন দূর পাল্লায়। কলকে গাছে দোল খাচ্ছে একটা দুর্গা-টুনটুনি। নলিনী দাদুদের বাড়ীর রঙন গাছের ঝোপে বাসা বেঁধেছে ওরা। মৌন মুনির মত স্তব্ধ হয়ে বটল পামের পাতায় বসে আছে একটা শিপাহী বুলবুল।

আকাশের লালটুকু উবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখানে ওখানে এখনো লেগে আছে আকাশে সূর্যাস্তের শেষ মুছে-আসা লালটুকু। ছেঁড়া মেঘ আকাশ সাঁৎরে ভেসে চলেছে কোন নিরুদ্দেশে। ঠিক আলতার মত আলতো ভাবে তার গায়ে লেগে আছে এতটুকু লাল আভা।

হঠাৎ কোথাও কোনো পাখি ডেকে উঠল বুঝি। রুম্‌নির কানে গেল সেই সুর। এতো দোয়েলের শিস্ নয়। মধু টুনটুনির মধুমাখা গানও তো নয়। তবে এ কার সুরেলা খঞ্জনী?

কার আবার? এ তো এতো সেই পিকুর গান, যে গান শুনে শিউরে ওঠে আকাশখানা, চমকে ওঠে স্তব্ধ বাতাস। এ গানের তানে গাছে গাছে জেগে ওঠে কচি পাতা, পাপড়ি মেলে ধরে ঘুম-ভেঙে জেগে ওঠে ফুলের কুঁড়ি।

সত্যিই কি তবে পিকু আবার ফিরে এসেছে? নাকি এ রুম্‌নির মনের ভুল!

রুম্‌নি কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল পিকুর গান। কই না তো, পিকু তো গাইছে না। সত্যি কি রুম্‌নি ভুল ভেবেছিল তবে? তাই বুঝি বা হবে তাহলে।

রুম্‌নির আর ভালো লাগছিল না জানলার কোলে বসে থাকতে। রুম্‌নি জানলা থেকে নেমে পড়ল মাটিতে। আর যেই রুম্‌নি নামল, অমনি রুম্‌নির কানে গেল আকাশ-বাতাস শিউরে তোলা "কুহু-কুহু" গান।

রুম্‌নি ভাল করে কান পেতে শুনল নলিনী দাদুদের বাগানে যে মস্তবড় নাগকেশর গাছটা আছে তার বিশাল বিশাল শাখা-প্রশাখা মেলে, তারই ঘন পাতার সবুজ আড়াল থেকে ভেসে আসছে পিকুর গান।

তাহলে পিকু সত্যিই ফিরে এসেছে এ বসন্তে? রুম্‌নি প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যেন। রুম্‌নি জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে, বাতাসে কান পেতে, প্রাণ ভরে শুনতে লাগল পিকুর গান। আর সেই কুহু-কুহু গানের মিঠে তানে রুম্‌নিও শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল শেষ বিকেলের বিষাদ-মাখা ওই আকাশখানার মত।

ছবি ঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বাজী

দিগম্বর দাশগুপ্ত

ধাঁধা বিশারদ পন্ডিত ভীম শাস্ত্রী সেদিন বাসে
ধাঁধা নিয়ে খুব আগ্রহ এক ছাত্রকে পেয়ে পাশে
খুশি হয়ে তাকে বললেন ''বাসে যতটা সময় মেলে
কাটাই যাত্রা পথের ক্লান্তি দুজনেতে ধাঁধা খেলে।''
ছেলেটি বলল ''ঠিক আছে তবে এক শর্তেতে রাজি।''
মনে যদি কিছু না করেন তবে খেলা হবে ধরে বাজী।
আপনি যখন পণ্ডিতজন মানে জ্ঞানী গুণী লোক
না পারলে পর দেবেন আমাকে একশত টাকা থোক।
আমি দেব যদি না পারি বলতে আপনাকে দশ টাকা।''
সানন্দে ভীম শাস্ত্রী জানান ''ঠিক আছে, কথা পাকা
শুরু কর তুমি'' ছেলেটি তখন বললে ''বলুন দেখি''
বলেই এমন করল প্রশ্ন কঠিন ধাঁধাটা সেকী!
ভুরু কুঁচকিয়ে অনেক ভাবার পরে ''সরি'' বলে উনি
দিয়ে শতটাকা বলেন ''জবাব তুমিই বল তা শুনি।''
ছেলেটি বলল ''আমিও জানি না, এই নিন দশটাকা।''
এমন সময় পাংচার হল বাসের পিছন চাকা!

কে বলে দেয়

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

কে বলে দেয় শীতকে, বল তো,
হেমন্ত-শেষে আসতে?
সঙ্গী কুয়াশা, তাই বা কে বলে
মসলিন হয়ে ভাসতে ?
হলুদ- গাঁদার কুঁড়ি - শিশুদের
কে দেয় গো ঘুম ভাঙিয়ে
সকালে রোদকে মিঠে আলো দিয়ে
কনকনে শীতে কে বলে জলকে
কে দেয় অমন রাঙিয়ে
বরফ শরীরে জমতে?
দুপুর গড়ালে শীতের বেলাকে
কে বলে অমন কমতে?
ভিনদেশী যত পাখিদের কে বা
চেনায় দূরের ঝিলকে?
শীত নিয়ে ছড়া লিখতে কবিকে
কে দেয় কথার মিলকে?
উত্তর থেকে হিমেল হাওয়াকে
কে বলে অমন বইতে?
কে দেয় শিখিয়ে পাকা ধান-শিষে
ঠুনঠুন্ কথা কইতে?
শীত ঋতুটার এই সব নিয়ে
ভাবনায় ঝুলি ভরলে -
বসে বসে ভাবি, কে দেবে জবাব
এ- সব প্রশ্ন করলে!

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

নির্বাচিত যোদ্ধা

প্রতিম দাশ

আজ ভোরে ধ্যানরত অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে হলুদ পাথরটা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখ খোলার পর নিজের দৃষ্টিশক্তিকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। শরীর জুড়ে স্নিগ্ধ হাওয়ার প্রলেপ অনুভব করলাম। দৌড়ে গেলাম আয়নার সামনে। জামাটা খুলে ফেললাম। হ্যাঁ একটা তারা হলুদ।

সাফল্য আসছে। তাহলে সব সত্যি! বাস্তব! অক্সিডন। অ্যাস্ট্রোভা। সব—সব সত্যি!

যে ঘটনার বিবরণ এখানে লিখছি তা যথাযথভাবে ভাষায় কতটা প্রকাশ করতে পারবো জানি না। কি ঘটেছিল সেদিন—আজও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু পাথরগুলো তো সত্যি। কোথা থেকে এলো ওগুলো? এ প্রশ্নের উত্তর নেই আমার কাছে। কেবলমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া অক্সিডনের। এ কাহিনির রহস্যময় নায়ক। যার সাথে আমার দুবার দেখা হয়েছে। যার কথায় আমি নাকি নির্বাচিত যোদ্ধা।

সুদীপ, বিশ্বজিৎদের পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওরা পুরো ঘটনাটা আমার উর্বর মস্তিষ্কের স্বপ্ন কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। ওদের কথামতো ওই সন্ধ্যায় গাড়ি নাকি একবারও থামেনি। আমি কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নটাও সেসময় দেখেছি। অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায়? সত্যিই স্বপ্ন দেখেছিলাম নাকি অক্সিডনের কথানুযায়ী ওরা আমার মনের অন্ধকার কোণের সৃষ্টি। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে চলেছি নিরন্তর। পাচ্ছি না শেষ ভরসা আপনারা যারা এই লেখা পড়বেন— সেই সমস্ত সুধী পাঠক পাঠিকা।

গত বছরের শেষ সপ্তাহের পঞ্চমদিন। বড়দিনের ছুটিতে জলদাপাড়া আর তার আশেপাশের জঙ্গল দেখে ফিরছিলাম। আমরা তিনজন। আমি শুভময় রায়। বয়স উনত্রিশ প্লাস। প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ড্রয়িংটিচার। সুদীপ চ্যাটার্জী। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিশেষজ্ঞ। বয়স একত্রিশ ছাড়িয়েছে। বিশ্বজিৎ প্রধান। বত্রিশ ছুঁতে চলেছে। বেসরকারী কনট্রাকটর। বয়স ও পেশার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও আমরা বন্ধু। তার একটাই কারণ আমরা বেড়াতে ভালোবাসি। দিনচারেক বা তার বেশী সময় ফাঁকা পেলেই বেরিয়ে পড়ি এদিক ওদিকে। বিশ্বজিৎ এর নিজস্ব গাড়িতে। মারুতি। বট্‌ল গ্রীন রঙের। বিশ্বজিৎই সব খরচ খরচা করে প্রথমে, পরে সেটা ভাগ হয়ে যায় তিনজনের মধ্যে।

ওইদিন গাড়ি চালাচ্ছিল সুদীপ। বিশ্বজিৎ ওর পাশে। আমি পিছনের সিটে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাঁচটা সাঁইত্রিশ। সুদীপকে বললাম, স্পিড বাড়াতে, ফাঁকা রাস্তা। বলা যায় না ডাকাতের খপ্পরে পড়তে পারি। বিশ্বজিৎ বললো, 'তোর যতো আজেবাজে চিন্তা। সেবক ব্রীজে ওঠার কিছু আগে গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। বার কয়েক চেষ্টা করেও যখন স্টার্ট নিলো না, তখন বিশ্বজিৎ নামলো গাড়ি থেকে। আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো। বুঝলাম মেজাজ খাপ্পা, গাল দিচ্ছে। সুদীপ নামলো না—আমিও না। অবশ্য আমি নেমেও কিছু করতে পারতাম না। গাড়ির ব্যাপারে আমি একেবারে ক অক্ষর....। বিশ্বজিৎ বনেট খুলে নিচু হতেই পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো শূন্য থেকেই যেন আবির্ভাব হলো দুই মুখোসধারী। হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেলাম ওদের গায়ে গাঢ় নীলরঙের মাছের আঁশের মতো পোষাক, সাঁটানো আছে যেন। মুখের জায়গাটা উজ্জ্বল সাদা। কেবলমাত্র চোখের স্থানে দুটো কালো গর্ত। অদ্ভুত দর্শন একটা করে যন্ত্র হাতে। দুটো সাপ একসাথে প্যাঁচানোর মতো। একজন সেটা তাক্ করলো বিশ্বজিতের দিকে। ও পড়ে গেল একতাল কাদার

মতো। সুদীপের মুখের দিকে তাকালাম। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। কি করবো ঠিক করতে পারছিলাম না। চোখের নিমেষে একজন মুখোসধারী চলে এলো ড্রাইভারের সিটের দিকের দরজায়। দরজা খুলে টেনে বার করলো সুদীপকে। আর্ত চিৎকার উঠলো ও, 'শুভ আমাকে বাঁচা।'

আমার গোটা শরীরটা কেমন যেন চিড়বিড় করে উঠলো। হাতে তুলে নিলাম পাশে রাখা বেসবলের ব্যাট। এরকম কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ওটা থাকেই আমাদের গাড়িতে। এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাথার ভেতরটা দপ্ দপ্ করছিল। গোটা শরীর উত্তেজনায় টানটান। সতর্কভাবে একপা এগিয়ে সামনের মুখোসধারীকে মারতে যাবো কে যেন পেছন থেকে আমার হাঁটুর ভাঁজে আঘাত করলো। আমি হাঁটু গেড়ে পড়লাম রাস্তার ওপর। যন্ত্রনায় বন্ধ হলো চোখ।

চোখ খুলতেই দেখলাম পাল্টে গেছে প্রেক্ষাপট। নাম না জানা রঙের এক কাল্পনিক আলোকিত বৃত্তের মধ্যে আমি আর 'ও'। বৃত্তটা কাল্পনিক বলছি কারণ কোনো বৃত্ত আঁকা নেই। আমি অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি না আমাদের ঘিরে বৃত্ত রচনা করেছে দুটি পাথর। তিনটে বড় ফুটবলার মাপের। লাল, নীল ও হলুদ। একটি থেকে আর একটির মধ্যে শালগ্রাম শিলার মাপের আরো তিনটি। ওগুলোও রঙিন। একই নিয়মে সাজানো লাল-নীল-হলুদ। প্রাথমিক রঙ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে 'ও'। উচ্চতা সাড়ে ছ-ফুট বা তাঁর বেশীও হতে পারে কারণ আমি নিজে পাঁচ ফুট এগারো। তা সত্ত্বেও মুখতুলে দেখতে হচ্ছে 'ও'র মুখ। দারুন স্বাস্থ্য। মাথায় চুল নেই। কান আছে বলে মনে হচ্ছে না। গায়ের রঙ অদ্ভুত রকমের সোনালী আভা যুক্ত ফর্সা। চোখ দুটো আমাদের মতো পাশাপাশি সোজা নয়। নাকের পাশ থেকে কোনাকুনি ভাবে কপাল ছুঁয়েছে। এরকম মুখ আমি আগে কোথায় একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি? কোনো সায়েন্স ফিকশন্ সিনেমায়? কবে? একগাদা প্রশ্ন ধাক্কা মারছিল মনের ভিতরে। 'ও'র হাতে রুপালী রঙের একটা অদ্ভুত দন্ড যার মাথায় ছোট্ট

একটা গোলক। দন্ডটা উচ্চতায় ওর থেকেও বড়। গোলকটা থেকেও একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেটার রঙের জ্ঞানও আমার জানার সীমায় নয়। আলোটা একটা ছন্দ মেলে একবার জোরে দুবার হাল্কা ভাবে ঝিলিক মেরে চলেছে। আলোকবৃত্তের বাইরে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। মাথার ওপরের আকাশও অন্ধকার। বৃত্তের আলোক উৎস কি? হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসছে এমন সব পৈশাচিক আওয়াজ যা শরীর কাঁপিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে বইয়ে দিচ্ছে হিমেল স্রোত।

কাল্পনিক বৃত্ত। পারলাম না আর দাঁড়িয়ে থাকতে। বসে পড়লাম। আমার হাতে বেসবলের ব্যাটটা এখনো আছে। বিশ্বজিৎ, সুদীপ ওরা কোথায়? সেই মুখোসধারীরাই বা কই? এ কোথায় আমি?

বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করলাম পরপর। আমি কোথায়? আপনি কে? আমার বন্ধুরা কোথায়? আপনাকে চেনা চেনা লাগছে—কোথায় দেখেছি আপনাকে? আমার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো আমারই কাছে। কোনো উত্তর না দিয়ে ভাবলেশবিহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো 'ও'। জবাব না পেয়ে রাগে গোটা শরীর আবার চিড়বিড় করে উঠলো। এরকম আমার হয় আগেও অনেকবার লক্ষ্য করেছি। কোনো কারণে রেগে গেলে বা অসন্তুষ্ট হলেই কেমন যেন একটা ছটফটানির অনুভব হয় গোটা শরীরে। কাউকে পিটাতে পারলে যেন ভালো হয় মনে হতে থাকে। মারার জন্য হাতটা ওঠাতে গেলাম 'ও'কে লক্ষ্য করে। হাতটা উঠলো কিন্তু ওটা যেন আমার হাত নয়। ব্যাটটা পড়ে গেল মুঠো থেকে।

'শুভ নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করো।' বহুদূর থেকে ভেসে এলো যেন আওয়াজটা। মাথার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্ট হলো। এ আওয়াজ আমার চেনা। ভালো করে তাকালাম 'ও'র মুখের দিকে। হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম—হঠাৎ কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কতায় চলে গিয়েছিলাম রাস্তার মাঝখানে। পথচলতি লরি এসে গিয়েছিল আমার সামনে। আশেপাশের লোক চিৎকার করে উঠেছিল। কি হলো বোঝার আগেই কে যেন আমাকে টেনে নিলো রাস্তার একপাশে। সময় কি থেমে গিয়েছিল? তাকিয়ে দেখলাম অদ্ভুত ফর্সারঙের চুল বিহীন এক মানুষ। অদ্ভুত তার চোখদুটো। আমি কিছু বলার আগেই 'আসি। আবার দেখা হবে। সাবধানে থাকবে।'—এই তিনটি কথা বলে মানুষের ভিড়ে যেন মিলিয়ে গেল অদ্ভুত লোকটি। এ সেই লোক।

আপনি কে? আবার প্রশ্নটা করলাম।

'আমি অক্সিডন। অ্যাস্ট্রোভা গ্রহের শেষ জীবিত বুদ্ধিমান প্রাণী। এক নরকের শেষ অধিবাসী যা একসময় স্বর্গ ছিল। আওয়াজে বিষন্নতার ছোঁয়া।

শরীরটা আবার চিড়বিড় করে উঠলো ভর সন্ধ্যেবেলায় আজগুবি গল্প শুনে। সম্ভবতঃ এরকম মুহূর্তে আমার মুখাবয়বে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। সেটা লক্ষ্য করেই 'ও' আবার বললো, 'শুভ, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করো।'

একই কথা বারবার কেন বলছেন আপনি?'

'আবার সেই রাগ। শান্ত হও। সব উত্তর পাবে তুমি।'

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'মাথা ঠান্ডা করে আমার কথাগুলো শোন।'

বেশ। বলুন।

'পৃথিবীর সময়ানুযায়ী দশ হাজার বেশী বছর আগে এর সূত্রপাত। বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক নিয়মেই ছড়িয়ে ছিল অনেক অনেক প্রাণ সমৃদ্ধ গ্রহ। নিজ নিজ প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতি ঘটিয়ে বেশ কিছু গ্রহের অধিবাসীরা শুরু করেছিল একে অপরের গ্রহে আসা-যাওয়া। এদের মধ্যেই একটি গ্রহ। যাদের বাসিন্দারা নিজেদের পরিচয় দিত ডেমোলিসার বলে। ওদের আচরণের উপযুক্ত। প্রযুক্তির উন্নতি একটু বেশী মাত্রায় ঘটেছিল ওদের গ্রহে। আর তাতেই ওদের লিপ্সা জাগে আন্তর্জাগতিক অধিপতি হওয়ার। শুরু করে গ্রহদখল। যে গ্রহ ওরা দখল করবে বলে ঠিক করতো সেই গ্রহে ওরা এমন কিছু ঘটনা ঘটাতো যা ওই গ্রহের অধিবাসীদের রাগের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিত। অতিরিক্ত রাগের ফলে ঘটতো মানসিক শক্তিক্ষয়। যার ফলে ঘটতো শারীরিক অবনতি। আর সে সুযোগটা নিত ডেমোলিসাররা। গ্রহ দখল হত অনায়াসে। এত কথা আমিও জানতাম না আমাদের গ্রহ আক্রান্ত হওয়ার আগে। তোমাদের এই গ্রহ দখলের চেষ্টা ওরা আগেও করেছে। পারেনি। গোটা কতক উন্নত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে কেবলমাত্র। তোমার দেশের মুনি ঋষি ফকির সন্তদের মানসিক দৃঢ়তা বাঁচিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে। এভাবে মহাবিশ্বের কিছু গ্রহও পেরেছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা কররতে। পারেনি অ্যাস্ট্রোভা।'

বিশ্বাস অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে আমার মন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। কি হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। বিশ্বাস হচ্ছিল না অক্সিডনের কথা। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছিলাম না, পারিপার্শ্বিকতার

প্রভাবে। বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এসব আমাকে শুনিয়ে কি লাভ?

'লাভ নিশ্চয়ই আছে।' ধরা ধরা অদ্ভুত দর্শন দন্ডর গোলকটিতে আলতো করে হাত বোলালো ও। নিমেষে পাল্টে গেল চারিধার। একি ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে অক্সিডন। অন্ধকার উধাও। খোলা আকাশের নিচে গাছপালাবিহীন শুকনো ঘাস, রুক্ষ জমি ও পাহাড় ঘেরা কোনো এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম। যতদূর চোখ যাচ্ছে কোনো কিছু নেই। কেবল বাতাসের শব্দ। অন্তহীন মৃত্যুর স্তব্ধতায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল। মুখ দিয়ে আপনিই উচ্চারিত হলো, এ কোথায় এলাম আমরা?

'যেখানে একদিন ছিল স্বর্গ। আনন্দে উচ্ছল প্রাণ ভরপুর। ছিল স্বপ্ন, ভালবাসা, মুক্তি।'

বুঝলাম অ্যাস্ট্রোভায় পৌঁছে গেছি আমরা। জোরে একটা চিমটি কাটলাম নিজেকে লাগছে। অর্থাৎ স্বপ্ন নয়। জেগেই আছি। শুধু তাই নয়, বেঁচেও আছি।

এখানে কেন আনলেন আমাকে?

'ভবিষ্যৎ দেখতে। রাগের পরিণাম দেখতে। শুভ, চাইলেই একে পাল্টাতে পারো তুমি— তোমরা।'

মানে?

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমার হাতে। তুমি একজন নির্বাচিত যোদ্ধা।'

'নির্বাচিত যোদ্ধা!'

'হ্যাঁ।'

আবার গোলকে হাত বোলালো অক্সিডন। ফিরে এলাম আবার সেই আলোকবৃত্তে। ম্যাজিক আমি অনেক দেখেছি। এরকম দেখেনি।

'শুভ এটা ম্যাজিক নয়—বাস্তব। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাস্তবের অভিজ্ঞতা ম্যাজিকের চেয়েও অবিশ্বাস্য।'

আশ্চর্যের মাত্রা চরমে পৌছালো। মনের কথাও পড়তে পারে অক্সিডন। গোটা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এ আমি কোথায়? চারদিক থেকে ভেসে এলো জান্তব আওয়াজ। ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। তবুও যেন মনে হচ্ছিল অতি বীভৎস্য ভয়ানক কদাকার মুখাবয়ব আমায় গিলতে আসছে।

'চোখ খোলো শুভ। তোমার মনের অন্ধকার জগৎ এটা। চারদিকে কালো যা দেখছে—তা তোমার দুর্বলতার চিহ্ন। একেই ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে। আর তার জন্য দরকার রাগ নিয়ন্ত্রণের। ভুলে যেও না তোমার ওপর দায়িত্ব অনেক। তুমি নির্বাচিত যোদ্ধা।'

বেপরোয়াভাবে প্রশ্ন করলাম—'অনেকবার শুনলাম কথাটা, ওর মানে কি?'

বাঁহাত এগিয়ে দিল অক্সিডন আমার দিকে। ছয় আঙুল বিশিষ্ট হাতের তেলোয় তিনটে রঙিন তারা— যেন খোদাই করা আছে। লাল, হলুদ ও নীল। এ জিনিষও কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি? চকিতে প্রশ্নটা ভেসে এলো মনে।

'তোমার বুকের ডানদিকে।'

হ্যাঁ তাইতো। আয়নার সামনে খলিগায়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। যদিও সেগুলো রঙহীন কালো। মাকে এ নিয়ে জানতে চাওয়ায় মা বলেছিল, 'ওটা জড়ুল চিহ্ন।'

এর মানে কি?

'নির্বাচিত হওয়ার স্বীকৃতি।'

কিসের জন্য নির্বাচন?

'ডেমোলিসারদের হাত থেকে নিজের গ্রহ বাঁচানোর যোদ্ধা হওয়ার নির্বাচন।'

পৃথিবী আক্রমণ করবে ডোমোলিসাররা?

'হ্যাঁ। আর সেটা আটকাতেই দরকার তোমার মত নির্বাচিত মোট এগারো জনের শক্তি। বর্তমান এ পৃথিবীতে উনিশ জন এরকম মানুষ আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।'

'কে করবে সে কাজ—আপনি?'

'হ্যাঁ। অ্যাস্ট্রোভার পুনরাবৃত্তি চাই না আমি।'

'তার মানে তো আর একটা যুদ্ধ।'

'হ্যাঁ যুদ্ধ—কিন্তু যুদ্ধের হাতিয়ার অস্ত্রশস্ত্র নয়। মন। কিন্তু একজন যোদ্ধা অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ জিতবে কিভাবে?

'অ্যাস্ট্রোভা সহ অনেক ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রহের অধিবাসীরাও একই কথা ভেবেছিল। সফল হয়নি। এর জন্যই দরকার রাগ নিয়ন্ত্রণ।'

রাগ ছাড়া কিলিং ইন্‌স্টিঙ্কট্ তৈরী হয় না। যেটা না থাকলে শত্রু নিধন অসম্ভব।

'শুধুমাত্র রাগ দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। তাহলে তো প্রাণভয়ে পালাতে থাকা ইঁদুরও ঈগলকে মেরে ফেলতে পারতো—কিন্তু পারে না। কারণ ঈগলের ওপর রাগ করার ক্ষমতা থাকলেও ঈগলের মোকাবিলা করার মতো শক্তি নেই। নেই ঘুরে দাঁড়ানোর মতো মনের জোর।'

'বুঝলাম। কিন্তু...'

'দ্যাখো শুভ, অস্ত্রর ব্যবহার কোনো সময়েই চিরস্থায়ী শান্তি আনতে পারে না। তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালীকে হারানোর ক্ষমতা না থাকলে পথ পাল্টাও। শত্রু নিধন না করে চেষ্টা করো তার মন বদলানোর। মানসিকভাবে বশ করো। আর তার জন্য নিজের মনের শক্তি বাড়াও হাজার হাজার গুণ।'

কোনো প্রত্যুত্তর যোগালো না মনে। শুধু জানতে চাইলাম, পৃথিবীর ওপর এতো নজর কেন ডেমোলিসার দের?'

'অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সম্পদ।' একটু থেমে কি যেন ভালোবা অক্সিডন, তারপর বললো, 'হয়তো কোনো দিনই এ গ্রহের দখল নিতে পারতো না ডেমোলিসাররা কিন্তু তোমাদের কৃতকর্ম তাদের পথ করে দিয়েছে।'

কৃতকর্ম?

'হ্যাঁ। গত একশো বছর অত্যধিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার, রাসায়নিক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, নিজেদের মধ্যে খুনজখম, পারস্পরিক অবিশ্বাস পৃথিবীর আবহাওয়াকে করেছে বিষাক্ত। যা কমিয়ে দিয়েছে মানসিক দৃঢ়তাকে। আর সে সুযোগে ডেমোলিসাররাও তাদের প্রযুক্তির সহায়তায় পৃথিবীকে ঠেলে দিয়েছে চরম বিপর্যয়ের পথে।'

গোলকে হাত ছোঁয়ালো অক্সিডন। আবার সেই রুক্ষপাহাড় ঘেরা প্রান্তর; দূরে কিছুটা চকচকে করে উঠলো আলোয়। উঠে এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে। পণ্যদ্রব্যের ফয়েল প্যাক। আশ্চর্য! তুলে দেখলাম Mfd : 18 Feb 201... Made in In....." কেঁপে উঠলো হাত সহ গোটা শরীর। তাকালাম অক্সিডনের দিকে। ভাবলেশহীন মুখাবয়ব।

'এটা তো অ্যাস্ট্রোভা নয়। পৃথিবী। মিথ্যে বলেছিলে কেন?' প্রচন্ড উত্তেজনায় আপনি থেকে তুমি বলে ফেললাম।

'আমি তো একবারও বলিনি এটা অ্যাস্ট্রোভা। শুধু বলেছিলাম এটাই ভবিষ্যৎ—একে পাল্টাতে পারবে তুমি—তোমরা!'

কথা হারিয়ে গিয়েছিল আমার। একরাশ প্রশ্নের ঝাঁক তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাকালাম 'ও'র দিকে। 'ও' হাত বাড়ালো গোলকের দিকে। ফিরে এলাম মনের জগতে।

'এটা খাও। তারার মতো ক্ষুদ্র আকৃতির একটি পাত্র এগিয়ে দিল আমার দিকে।

কি এটা? মনের প্রশ্ন মনেই থেকে গেল উত্তর এলো তার আগেই।

'সোমরস। যা খেতেন তোমাদের মুনি ঋষিরা। মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা আনতে সাহায্য করবে।

নিলাম পাত্রটা—চুমুক দিলাম। স্বাদটা অনেকটা চিরতার মতো। কষা। শরীরে যেন তরতাজা ভাব বেড়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। গোটা পাঁচেক চুমুকে পাত্র খালি করে ওটা ফিরিয়ে দিতে গেলাম। অক্সিডন বললো, 'রেখে দাও। প্রতিদিন ওতে প্রকৃতি থেকে জমা হবে সোমরস। মনের একাগ্রতা জানতে ধ্যান করা অভ্যাস করো। তার আগে এক চুমুক করে ওঠা পান করবে রোজ।'

'শুভ, তোমাদের গ্রহে আক্রমণ হতে এখনো বছর তিনেক বাকি। এখন থেকেই শুরু করো রাগ নিয়ন্ত্রণের সাধনা।'

'কিভাবে?' অস্ফুট উচ্চারণে প্রশ্ন করলাম আমি।

'যখনই বুঝবে রাগ হচ্ছে। চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করবে পারিপার্শ্বিকতা সবকিছু ভুলে যেতে।'

'ভুলে যেতে? আর সে সুযোগে আমার প্রতিপক্ষ আমায়—'

'সে পরিস্থিতি যাতে না আসে কখনো সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে তোমাকেই। পারিপার্শ্বিকতা না ভুললে একাগ্র হতে পারবে না। একাগ্রতা না আনলে তীক্ষ্ণ মানসিক শক্তির অধিকারী হবে কি করে? চোখ বন্ধ করলেই ঠিক এখনকার মতো অন্ধকার দেখতে পাবে চারদিকে। সবকিছু থেকে মনকে একশোভাগ মুক্ত করতে পারবে। অন্ধকার ভেদ করে আলো প্রবেশ করবে তোমার মনে।'

কথা থামিয়ে, দুটো বড় পাথরের মধ্যে থাকা ছোট পাথরগুলো তুলে আনলো অক্সিডন। দিল আমার হাতে।

'রোজ ভোরে এগুলো একসাথে দুহাতে চেপে ধরে ধ্যানে বসবে। রাগ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য এর মাধ্যমেই বুঝতে পারবে তুমি। শক্তি বাড়বে যেমন তেমনই এক এক করে অদৃশ্য হয়ে যাবে পাথরগুলো। রঙিন হয়ে উঠবে তোমার বুকের তিনটে তারা। যদি সাধনায় সফলতা লাভ করো তবেই আমি ফিরবো। নচেৎ নয়।'

চোখের পলক ফেলার আগেই মিলিয়ে গেল বৃত্ত-অদৃশ্য হলো অক্সিডন।

দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। আমি গাড়ির ভেতর। সামনে রাস্তায় পড়ে আছে বিশ্বজিৎ। একজন মুখোসধারী তার কাছে। সুদীপের আর্ত চিৎকারে শুনতে পেলাম—'শুভ, আমাকে বাঁচা।' শরীরে আবার চিড়বিড়ানি। হাত বাড়ালাম বেসবলের ব্যাটটার দিকে। 'না, শুভ না। রাগ নয়।' কানে ভেসে এলো অক্সিডনের কণ্ঠস্বর। চেপে ধরলাম পাথর তিনটেকে। চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলাম—'দূর হ শয়তানের দল— ছেড়ে দে ওকে। আমার জগতে তোদের স্থান নেই।' ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে গেল শরীর। একটা আলোর ঝলকানি। শরীর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ যেন হারাতে থাকলাম। সব আবছা হয়ে যেতে থাকলো—

'শুভ, এ্যাই শুভ কি হলো তোর? ওঠ, ওঠ। কি সব বলছিস বিড় বিড় করে? এ্যাতো ঘামছিসই বা কেন?

চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম সুদীপের মুখ।

'আমি কোথায়?'

'কোথায় আবার আমার গাড়িতে', বললো বিশ্বজিৎ। 'আধঘটা ধরে অজ্ঞান। যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলি না। মাঝে মাঝে কি সব, অক্সিডন, অ্যাস্ট্রোভা বলছিলি। ওগুলো কি? সুদীপতো ভয় পেয়েই গিয়েছিল। যে স্পীডে ততক্ষণ গাড়ি চালালো তা কোনোদিন চালায়নি।'

অক্সিডন নামটা শোনা মাত্র আশেপাশে তাকালাম। পকেট হাতড়ালাম। হ্যাঁ আছে। বার করে আনলাম। তিনটে পাথর লাল-নীল-হলুদ এবং একটা ছোটো তারা আকৃতি পাত্র।

'কি রে ওগুলো?' প্রশ্ন সুদীপের।

হাসলাম। বললাম, 'কিছু না। জল আছে আর? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

'অবশ্যই, থাকবে না কেন।' বলে বিশ্বজিৎ ঝুঁকলো ব্যাগ খোলার জন্য। সুদীপ মন দিলো গাড়ি চালানোয়। আমি পাথর তিনটেকে একসাথে দুহাতে ধরে চাপ দিলাম চোখ বন্ধ করে। হাল্কা একটা আলোর বিচ্ছুরণ দেখা গেল মনের আয়নায়।

'এইনে জল।' হাত বাড়ালাম বোতলের দিকে।

ছবি ঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

চাঁদের দেশে জমি কেনা

বরুণ মজুমদার

পৃথিবীর মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন চাঁদে পাড়ি দেওয়া। আকাশের চাঁদকে দেখে মানুষের কত কল্পনা! চাঁদের ভেতরে বুড়ি চরকার সুতো কেটে চলেছে। আবার ঠাকুমারা বলে এসেছে নাতি নাতনিদের নিয়ে আয় আয় চাঁদ মামা, সোনার কপালে তুই টি দিয়ে যা!

ইতিমধ্যে মহাকাশযানে করে দুই মার্কিন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে। চাঁদের মাটির নমুনাও তারা সংগ্রহ করেছে। ভারতের পাঠানো চন্দ্রযান-১ চাঁদের চারপাশে ঘুরে সম্প্রতি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। মানুষের চাঁদে যাবার স্বপ্ন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হতে চলেছে। হ্যাঁ, চাঁদে বাড়ি তৈরী করে বসবাসের জন্য জমি বিক্রির কাজও শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অনেকের কাছেই খুব মজার বলে মনে হচ্ছে তাই না?

চাঁদ মামার দেশে জমি পাবার ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, পেয়েছেনও অনেকে। আমাদের এই কলকাতার দুজন বাঙালিও এই স্বপ্নের দেশের জমির মালিক হয়েছেন। সংখ্যাটা কিছুদিনের মধ্যে আরো বাড়তে পারে। তবে নতুন যেটা তা হল—এবার জমির মালিকদের চাঁদের দেশের নাগরিকত্বও দেওয়া হচ্ছে। কলকাতার অনিশ দাসগুপ্ত নামে এক বাঙালি এই নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। চাঁদে ৩ একর জমির মালিকানায় পাশাপাশি তিনি সেখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে বেজায় খুশি। তাঁর কথায়, চাঁদে বসবাস করা মানে স্বপ্নের রাজত্বে থাকা। এই জীবনে সে সাধ পূরণ হবে কিনা কে জানে। তবে পরবর্তী প্রজন্ম যদি চাঁদে গিয়ে বসবাসের সুযোগ পায় তবে মন্দ কি। তবে লুনার রিপাবলিক সোসাইটি এ জীবনেই তাঁর চাঁদে বসবাসের ব্যাপারে আশার কথা শুনিয়েছেন। ২০০৯ সালে যাঁরা চাঁদের জমি কিনেছেন ও নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে এই সংস্থা নিউইয়র্কে এক সম্মেলনের আয়োজন করেছে, এখানেই শেষ নয়, এঁদের দিয়ে চাঁদে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানকার নাগরিকত্ব পাওয়া সকলেরই ভোট দেবার অধিকার থাকবে।

লুনার রিপাবলিক সোসাইটির কাছে ইন্টারনেটে মারফত আবেদন জানিয়ে ওই বাঙালি ভদ্রলোক জমি পেয়েছেন চাঁদে। জমির দলিল ও নাগরিকত্বের বৈধ কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চাঁদের ওয়েসাম আসরাম এলাকায় তিনি তিন একর জমির মালিক হয়েছেন। জমি কেনা এবং রেজিস্ট্রি বাবদ তাঁর মোট খরচ হয়েছে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার টাকা। এখন তিনি চাঁদমামার দেশে যাবার জন্য স্বপ্নে বিভোর। কবে আসবে সেই দিন?

বই চেনো

প্রণব মুখোপাধ্যায়

পদ্মপুকুরে—শৈলেন্দ্র হালদার
শিউলিঝরার দিন— দেবাশিস্ বসু
সহযাত্রী
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা

ছড়ার ডালি উপুড় করা দুটি বই।

প্রথমটি রূপকথা থেকে রূঢ় বাস্তবতাকে ছড়ার ছন্দে ছুঁয়ে গেছে। স্বপ্ন যেমন আছে, কঠোর জীবনের কথাও আছে। আর আছে আকারে ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্ট বাক্যে, মন্দের প্রতি শানিত আক্রমণ।

ধ্বংসের নামে মেতে ওঠে কারা
কারা হানা দেয় দরজায়
প্রতিবাদে আমি রুখে দাঁড়াবোই,
ভেতরে আগুন গর্জায়। (প্রতিবাদের আগুন)

আগুনের ভূমিকা সভ্যতার আদিযুগ থেকেই। সে আগুন সৃষ্টির এবং ধ্বংসেরও। 'প্রিয় রামধনু' খুঁজতে গেলে অনেক সময় সে আগুনকে বুকে পুষে রাখতে হয়। ধ্বংস ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বটি একটি অদ্ভুত চেতনায় তোমাদের জাগিয়ে তুলবে।

দেবাশিস্ বসুর 'শিউলি ঝরার দিন'-এর প্রতিটি পাতায় যেন কিসের সুরভি ছড়িয়ে আছে, সত্যিকার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন মিল ও সুরের মূর্চ্ছনায়।

কাঁচের চুড়ি
আকাশ নাকি?
স্মৃতির গীতির
প্রীতির রাখি
শালিখ পাখি
সবুজ গাঁ-কি
দাঁড়াও আমি
এবার আঁকি!

কোন অন্ত্যমিলে কোন কষ্ট কল্পনা নেই, চমক দেবার প্রবৃত্তি নেই। মিল এসেছে আপনপথে ভাবনার হাত ধরে। মিল আর ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবসাব। আর আমরা ভেসে যাই যেখানে মেঘ রোদ্দুর আলো, মাঠের গালিচা, রেলগাড়ি, একঠেঙে বক, খুশির খাতায় এক সমান্তরাল দুনিয়ায়, এই সত্যিকার দুনিয়াটা থেকে কয়েক মুহূর্তের ছুটি নিয়ে। তবে 'শিউলি ঝরার দিন'এর দুনিয়াটা মোটেই মিথ্যে নয়, কবির এবং আমাদের বুকে তার বাস। বরং আমাদের কেজো দুনিয়াটার থেকে সত্যি। আর তা সত্যি হয় সৃষ্টির গুণে। দেবাশিস্ বসুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেল।

পরিশেষে বলি, দুটি বইতেই ছোট্ট চিত্রকর শ্রমণা হালদারের মনকাড়া সব আঁকিবুকির কথা। তার কল্পনার পরিচয় সে ফুটিয়ে তুলেছে রেখায়, অনায়াস আর সাহসী টানে ধরে রেখেছে মানুষ আর প্রকৃতিকে। কাঁচা বয়সের অদক্ষ হাত, কিন্তু রেখার অবস্থান ধারণা ছবিগুলির প্রাণ। সেই ধারণার সঙ্গে একদিন দক্ষতা এসে মিশবে। শ্রমণা হয়ে উঠবে পাকা শিল্পী।

উনো কথা

জীবন সর্দার

উনো মানে কম। তাহলে উনো কথা মানে কম কথা। কম হলেও উনো কথার দুনো দাম। কম কথায় দুই গুণ অর্থ বোঝাতে চাইছি। কথায় আছে উনো বৃষ্টি দুনো শীত। কম বৃষ্টি বেশী শীত। ওই লোককথার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মের এক ইশারা বুঝতে বলা হয়েছে।

প্রকৃতির নিয়ম নিয়ে যখন কথা, তখন আমরা, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, অবশ্যই এক নতুন আলোচনায় ঝাঁপাতে পারি।

তার আগে নিজেকেই প্রশ্ন করতে চাই, আমরা মানুষেরা, সত্যিই কী প্রকৃতির সব নিয়ম কানুন বুঝি? না বুঝি না। বুঝলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার এমন হীন চেহারা করে তুলতে পারতাম না। আমরা যে বুঝতেই চাই না, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলি লুঠ করে ভোগ করতে চাইলে, পৃথিবীটাই সকল প্রাণের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

সকল প্রাণ বলতে আমি বুঝি গাছেরা, পশু-পাখি মাছ পোকা সকলকে নিয়েই পৃথিবীর প্রাণের সম্পদ। জড় প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতির শক্তি-রূপের সঙ্গে, প্রাণ সম্পদের কী এক অভিনব আত্মীয়তা, খুঁজে দেখতে পারলে আনন্দের সীমা থাকে না।

এই কথাটা ভেবেই, প্রকৃতির রহস্য খুঁজে আনন্দ পেতে, ঊনপঞ্চাশ বছর আগে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক এক নতুন 'দপ্তরের' পাতা খুলতে বসলেন। সে পাতায় মাসের পর মাস, প্রাণীদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক-রহস্য খুঁজে দেখার বিবরণ শুরু হলো। তার আগে প্রকৃতি-পড়ুয়ারা খুঁজতে শুরু করলে মাঠে-বনে, নদী-সাগর তীরে, পাহাড়ে-মরুতে গোয়েন্দার মন নিয়ে। প্রকৃতির রহস্য দেখে বুঝতে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেল তারা।

আমরা সবাই জানি এ হলো ইকো-বিদ্যার প্রথম-পাঠ। ইকো-বিদ্যা, চলতি কথায় 'ইকোলজি'—এই শব্দটার সরল অর্থ 'ঘরের বিষয়ে পড়াশুনো'। ঘর বলতে বুঝতে হবে আমাদের পৃথিবীটাকে—বড়ো আপন এই আকাশে ভাসা গোল গ্রহটা।

প্রকৃতি-পড়ুয়ারা প্রথম খুঁজতে শুরু করলে কোন কোন পরিবেশে গাছপালা আর প্রাণীরা থাকতে পারে। তারপর দেখলে সেগুলো ওই ওই জায়গায় কেমন করে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। তিন নম্বর খোঁজার বিষয়

প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতি-পড়ুয়ারা

হলো আর একটু কঠিন। দেখতে হলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে গাছেদের, প্রাণীদের গড়ন-ধরণ কেমন। দেখে বুঝে শিখে নিতে হলো তাদের এক একটির স্বভাব বা আচরণ। বুঝতে কিন্তু অনেক অনেক সময় চলে যায়। শেষমেশ দেখা শুরু হলো মানুষ নিজ নিজ পরিবেশে কেমন করে মানিয়ে নেয়। সেই খোঁজ চলছেই। জানার কী আর শেষ আছে।

শুরুতেই আমার জানার ইচ্ছে হয়েছিল ইকো-বিদ্যার শুরু কবে থেকে কে এই বিদ্যা প্রথম শিখিয়েছিলেন? মনে হয়েছিল এই খবরটা ইকো-বিদ্যার কোনো ভারী বইতে পেয়ে যাবই। পেয়ে গেলাম সে খবর। যে খবর তোমাদের চোখে ধরতে কোনো বাধা নেই।

জার্মান দেশের প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল ১৮৬৬ সালে বলেন যে, প্রাণীদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে একটি আলাদা পড়ার বিষয় হতে পারে। তিনিই জার্মান ভাষায় এই বিষয়ে একটি বিশেষ শব্দ বানালেন -a -e -k -o -L -o -G -i -e, যার বাংলা উচ্চারণ হতে পারে 'ওইকোলজি'। ডঃ হেকেল্স আসলে দুটি গ্রীক শব্দ, aiKos আর Logos জুড়ে তার পছন্দের শব্দটি বানান। 'ওইকোস' মানে বাসস্থল, 'লোগোস' মানে অধ্যয়ন।

আমরা ইংরেজী 'ইকোলজি' শব্দটি বেছে নিয়েছি। অর্থ করেছি বাসভূমি নিয়ে পড়ার বিষয়। কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানটাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এবং সে আলোচনার মধ্যে কতগুলি বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে সেই লিপিটি আমি ভয়ে ভয়ে তোমাদের সামনে হাজির করছি ঃ

(এক) প্রাণীদের অবস্থান বিশেষে তাদের স্বভাব বা আচরণ লক্ষ্য করা।

(দুই) আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্ক কী ও কেমন তা দেখা।

(তিন) নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে তাদের আকৃতির, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (গাছ আর পাখি পশুদের) খাপ-খাওয়ানোর রহস্যটি জানা।

এবং (চার) প্রকৃতির যা স্বাভাবিক জিনিসগুলি তা মানুষের কোন কাজে কতটা লাগতে পারে তা বুঝতে চেষ্টা করা।

আমার ঊন কথা হলো এমন করে এই বিষয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আনন্দ হবে বটে, কিন্তু একটু কষ্টও হবে সময়তো লাগবেই। তাই বলি কী আর দেরী নয়, প্রকৃতি-পড়ুয়া হওয়ার জন্য সন্দেশের গ্রাহক হয়ে যাও। তাহলেই তোমাকে প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরের সব নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিতে আর বাধা থাকবে না। আনন্দে মেতে উঠতে পারবে প্রকৃতির রহস্য খুঁজতে।

জিভি গ্রামে দু-দিন

অনুভব সাহা, গ্রাহক সংখ্যা ৫১৬২/৯ বছর

মার্চ মাসের শেষে আমরা হিমাচল প্রদেশ বেড়াতে গেছিলাম। হিমাচলের এক নির্জন সুন্দর গ্রাম জিভি। কালকা থেকে টাটা সুমো করে সকালবেলা রওনা দিলাম। জিভি গ্রাম পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্যে একটি উপত্যকায় এই জিভি গ্রাম। মাঝখান দিয়ে একটি পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। তার নাম জিভি নালা। আমরা সেই পাহাড়ি নদীর ধারে একটি হোটেলে উঠলাম। সেখানে দুটো তাঁবুও ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য বড়রা আমাদের তাঁবুতে থাকতে বারণ করল। হোটেলটা অবশ্য খুব সুন্দর।

পরের দিন আমরা নদী পার হওয়া শিখতে গেলাম। যে আমাদের শেখাচ্ছিল সে নিজেই জলে পড়ে গেছিল। তাকে টেনে তোলা হল। তারপর আমাদের হোটেলের মালিক, ললিত দাদা, নদী পার হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। ললিতদাদার পাহাড়ে চড়ার বিশেষ ট্রেনিং নেওয়া আছে। ওর থেকে আমরা শিখে নিয়ে পাথরে পাথরে পা ফেলে জিভি নালা সহজেই পার হয়ে গেলাম।

জিভি গ্রামের থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার উঠলে বহুগ্রাম। আমরা সুমো নিয়ে সেখানেও গেলাম। এখান থেকে চারপাশের বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়ো দেখা যায়। এখানে একটা মন্দিরে দেখি একটা ক্রিস্টাল পাথরের পুজো হচ্ছে। আগে নাকি অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি ছিল। একজন লোক টাকার লোভে সেটা চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরে সে পাগল হয়ে যায় ও আত্মহত্যা করে। গ্রামের লোকের বিশ্বাস দেবীর অভিশাপেই এমন হয়েছে।

দুপুরে একটি ঝর্ণায় চান করতে যাওয়া হল। যাওয়ার পথে অনেক বাঁশের সাঁকো। ঝর্ণায় যাবার রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, যেখানে আলো প্রবেশ করে না। আমার দাদা আর মা ঝর্ণায় চান করল। জল খুব ঠাণ্ডা। তাই আমি নামতে সাহস পেলাম না। বিকেলে আমরা চড়াই পেরিয়ে একটি মন্দিরে উঠলাম। সেখানে একটি ছোট স্কুল ছিল। নীচে বাস্কেটবল কোর্টে খেলা হচ্ছিল। সেখানে দুটো বড় পাথরে আমরা রক ক্লাইম্বিং করতে শিখলাম।

হোটেলের খাবার জায়গাটা খুব সুন্দর। মাথার ওপর ছাদ, চারপাশটা খোলা, কনকনে ঠাণ্ডায় জমে যেতে যেতে খাওয়া হত রোজ। তবে হোটেলের মালকিন লীনা দিদির চমৎকার রান্নার হাত।

রাতে চারপাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমরা নাইট ট্রেকিং এ বেরোলাম। অনেক তারা দেখতে পেলাম আকাশে যেগুলি কলকাতার আকাশে দেখা যায় না। সবাই চুপচাপ হাঁটছি। কিছু দূর হাঁটার পর হঠাৎ দেখি, পথের ধারে একটি প্রকাণ্ড লোক যেন চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে দৈত্য ভেবে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেলাম। বড়রা তখন কাছে গিয়ে দেখল যে ওটা প্লাস্টিক মোড়া একটি জেনারেটর।

মন চায়

উষসী বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ৫১৬৩/১১ বছর

পেঁজা পেঁজা তুলো তুলো
মেঘের মাঝে,
মাঝে মাঝে মন চায়
যেতে বহু দূরে
কোনো এক রাত্রের
আকাশের খাঁজে,

তারাদের ঝিকিমিকি
রূপের খাঁজে
উড়ে চলি আমি আর
সাথে এক ভেলা,
সোনা দিয়ে তৈরী সে
গায়ে রুপো ঢালা।

কুচি কুচি ঝকমকে
শিশিরের মাঝে,
মাঝে মাঝে মন চায়
যেতে বহু দূরে
কোনো এক নীল রঙা
আকাশের নীচে

স্বপ্নিল চোখ আর
বাজনার সুরে
হারিয়ে যে যাই আমি
বনের পথে,
ছোটো ছোটো পা দিয়ে
ঝোপঝাড় ঠেলে।

ছোটো ছোটো চকচকে
ঝিনুকের মাঝে,
মাঝে মাঝে মন চায়
যেতে সব ফেলে।

কোনো এক নীলচে
সাগরের স্তরে
ছোটো ছোটো মাছ আর
প্রবালের ঘরে
চলে যেতে চাই আমি
ছেড়ে দেশ কাল
স্বপ্নের আঙিনায়
হবই প্রবাল।

বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের কান্ড

বরুণ মজুমদার

'দেড়শো খোকার কান্ড' নামে একটা চলচ্চিত্রে ছোট ছেলেদের নানান দুষ্টুমির দৃশ্য দেখে অনেকে মজা উপভোগ করেছে। এবার বাস্তবে কিছু দেড়শো খোকাখুকুর কান্ডের কথা জানাচ্ছি। স্কুলে যাবার সময় প্রতিদিন তারা এত অত্যাচার করছিল যে বাসের ড্রাইভার তা আর সহ্য করতে পারছিল না। বহুবার বলা সত্ত্বেও তারা কেউই বাসের সিটবেল্ট বাঁধে না। প্রথমে নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল আর হৈ হট্টগোল তো নিত্যকার ব্যাপার। এছাড়াও ছিল চলন্ত বাসের মধ্যে ছোটাছুটি করা, ড্রাইভারের মাথায় ললিপপ্ ছুঁড়ে মারা এবং তার সঙ্গে উৎকট চিৎকার তো আছেই। অনেকদিন ধরে এই বিচ্ছু ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা এই কান্ড করছিল।

একদিন সেই বাসের ড্রাইভার সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় বাসশুদ্ধ থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের পুলিশের হাতে সঁপে দিয়েছে। এটা কুইন্সল্যান্ডের ঘটনা।

থানা, স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবকরা সবাই এবার ড্রাইভারের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কেননা ওই বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের কেউই শায়েস্তা করতে পারছিলেন না। থানায় গিয়ে ওই বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের তারপর কান্নাকাটি। আর এসব কান্ড কখনো হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ছাড়া পায়। এবার তারা সত্যিই জব্দ হয়েছে।

আনন্দ - সন্দেশ

মঞ্চে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রণব মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ ও শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪১৭ -এর বৈশাখে নবপর্যায়ের সন্দেশ প্রবেশ করেছে পঞ্চাশ বছরে। আর এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সন্দেশ পেল এক দারুন উপহার। শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত তৃতীয় রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল আমাদের সন্দেশকে। অনিবার্য কারণে সেদিনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি সন্দেশ সম্পাদক সন্দীপ রায়। ২২ শে ডিসেম্বর ২০১০ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে শিশু ভোলানাথ মুক্তমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মারক সম্মান তুলে দেন সন্দেশের সহ সম্পাদক প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে শিশু কিশোর আকাদেমির পক্ষে সন্দেশ সম্বন্ধে বলা হয় ঃ

''ছোটদের পত্রিকার ঐতিহ্যের প্রবাহমানতায় 'সন্দেশ' যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯১৩ সালে প্রবাদপ্রতিম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সন্দেশ' - এর আবির্ভাব বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছিল। সেই সময়ের খ্যাতনামা লেখক -কবিদের পাশাপাশি বহু তরুণ লেখক -কবির 'সন্দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি ঋদ্ধ করেছে বাংলা শিশু- কিশোর সাহিত্যকে। উপেন্দ্রকিশোরের পরে 'সন্দেশ' - এর সম্পাদনা করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আর এক দিকপাল কবি ও সাহিত্যিক সুকুমার রায়। স্বল্পায়ু সুকুমার রায়ের অকাল প্রয়াণে 'সন্দেশ' - এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যম পুত্র সুবিনয় রায় (চৌধুরী)। উনিশ শতকের বাংলা শিশু- কিশোর পত্রিকা ও শিশু-কিশোর পাঠ্য বইগুলিতে অলংকরণ থাকত না বললেই চলে। বিংশ শতকে 'সন্দেশ' মারফত শিশুসাহিত্যে অলংকরণের সূচনা।

দুই সন্দেশী অমিতানন্দ দাশ ও প্রণব মুখোপাধ্যায়

পরবর্তীকালে সুকুমার পুত্র স্বনামধন্য সত্যজিৎ রায়ের লেখা ও আঁকায় এবং সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশের সম্পাদনায় বহুকাল ধরে শিশু-কিশোর সাহিত্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থেকেছে 'সন্দেশ'। সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায়ের সুসম্পাদনায় আজও এগিয়ে চলেছে 'সন্দেশ'। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন। শিশু কিশোর আকাদেমি 'সন্দেশ' পত্রিকাকে সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত।''

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও বাদল বসু

সেদিনের ওই অনুষ্ঠানে সন্দেশের ঘনিষ্ঠ আরো দুই সাহিত্যিক, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং শ্রী শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুরস্কৃত হয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পেয়েছেন বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার ২০০৯ এবং শ্রী শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন ২০০৯ সালের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কার । দুজনেই কিশোর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে 'সন্দেশ' তথা সত্যজিৎ রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। আমরাও এই দুই সন্দেশীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন...

প্রবাল সেন

চলে গেলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শেষ কিংবদন্তী শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। গত ৩রা জানুয়ারী ৮৬ বছর বয়সে থেমে গেল তাঁর জীবনের গান। ১৯২৪-এর ১৯-শে সেপ্টেম্বর বিহারের এক ছোট্ট রেল স্টেশন গজুণ্ডিতে জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। মা সুবর্ণলতা দেবীও সংগীতচর্চা করতেন। সাহিত্য সঙ্গীতের পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন সুচিত্রা মিত্র। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শান্তিদেব ঘোষের কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রেকর্ড, ''মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান'' এবং ''হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায়'' সম্বলিত রেকর্ডটি প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপরে ডিস্‌কে প্রায় ৪০০ রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র গীতিনাট্যের গান, অতুল প্রসাদের গান, ব্রাহ্মসঙ্গীত, আধুনিক গান এবং ভজন। সুচিত্রা মিত্র বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্পষ্ট উচ্চারণ এবং দরদী গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ঘরানা তৈরী করেছিলেন তিনি, যে ঘরানা তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্রেই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ১৯৪৬-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ''রবিতীর্থ''। গান ছাড়াও অভিনয়, চিত্রাঙ্কন এবং লেখালেখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। 'সন্দেশেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত একটি ছড়া। সুচিত্রা মিত্র ছিলেন কলকাতার প্রথম মহিলা শেরিফ। তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছিলেন রাজা সেন।

সুচিত্রা মিত্র চলে গেছেন অমৃতলোকে। কিন্তু তাঁর হাতে গড়া উত্তরসূরীরা নিশ্চয়ই তাঁর তৈরী রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব ঘরানাটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন, ছড়িয়ে দেবেন দেশে বিদেশে।

চোখ মেললেই কত রকমের গাছপালা, কীট পতঙ্গ, কত জাতের ফল শস্য। বিজ্ঞানীরা বলেন- এসবই মানুষের সব থেকে দামী সম্পদ। আসুন, তাই এদের চোখ মেলে দেখি, চিনি, জেনে নিই তাদের হাল- হকিকৎ, আর এদের সংরক্ষণের জোরদার ব্যবস্থা গড়ে তুলি।

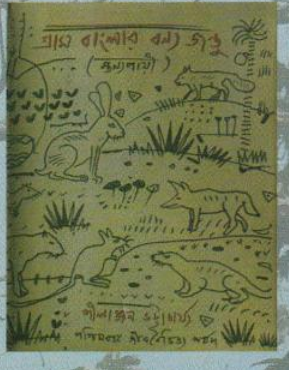

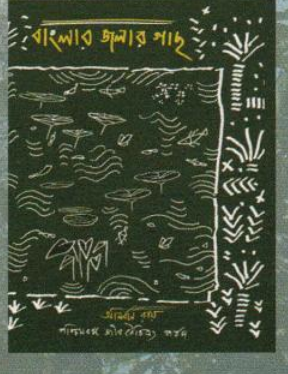

WBBB

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ

(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এল এ, সেক্টর- ৩, সল্টলেক, কোলকাতা- ৭০০০৯৮

দূরভাষ- ২৩৩৫ ২৭০৭/২৩৩৫-২৭৩১

ওয়েবসাইট- www.wbbb.gov.in ই-মেল- biodiversity.wbbb@nic.in

R.N.I. No. 12007/64 **Sandesh** BookFair **February -2011** **Rs. 20/-**

আরামবাগস্

ব্রয়লার মুরগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ

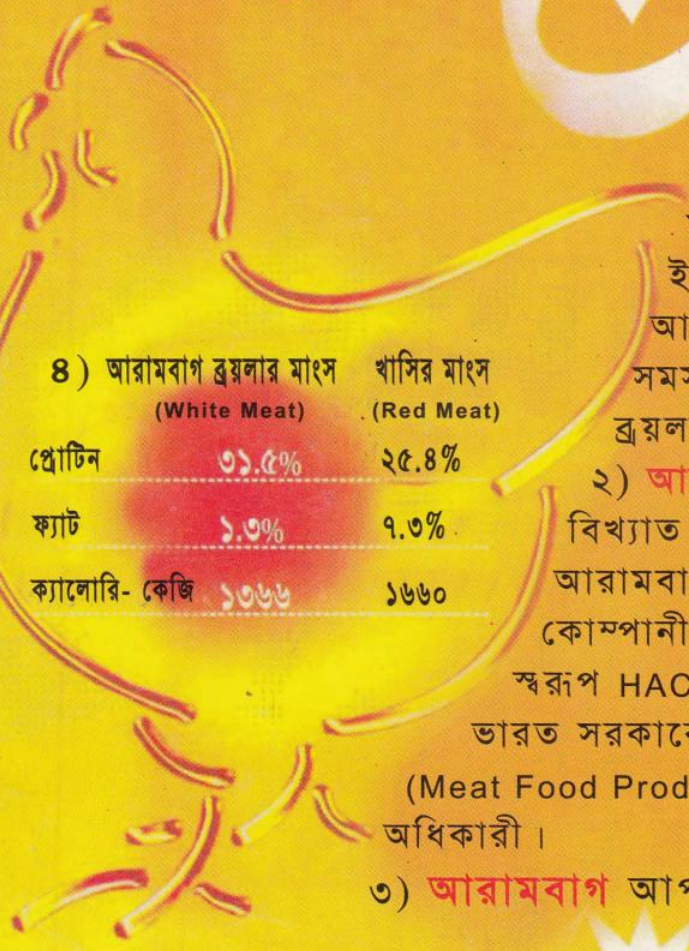

১) **আরামবাগ** ব্রয়লার মুরগীর মাংসের মাধ্যমে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায়। আজকে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা পুষ্টি, যার সমস্যা সমাধানের আরামবাগ ব্রয়লার মুরগী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২) **আরামবাগ** চিকেন বিশ্বমানের তুল্য। পৃথিবী বিখ্যাত সুইস কোম্পানী S.G.S. এর তত্ত্বাবধানে আরামবাগ চিকেন উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় কোম্পানী হিসাবে শুধুমাত্র **আরামবাগ** এই স্বীকৃতি স্বরূপ HACCP ও SQF Certificate পেয়েছে এবং ভারত সরকারের গুণগত মান নির্ধারক সংস্থা MFPO (Meat Food Products Control Order) এর Licence এর অধিকারী।

৩) **আরামবাগ** আপনাদের সেবায়--

সঠিক মান

সুস্বাদু

তাজা

৪)	আরামবাগ ব্রয়লার মাংস (White Meat)	খাসির মাংস (Red Meat)
প্রোটিন	৩১.৫%	২৫.৪%
ফ্যাট	১.৩%	৭.৩%
ক্যালোরি- কেজি	১৩৬৬	১৬৬০

Arambagh's chicken

Adda Bites

Arambagh's FOOD MART

SGS

SQF stands for - Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

Arambagh Hatcheries Ltd.
59B Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone : 2283 2588/2527/2536/2522/2601/2603
Fax : 91-33-22832552
E-Mail No. : arambagh@cal.vsnl.net.in